বাংলাদেশে এই প্রথম নারীদের উপর
ব্যতিক্রম আল-কুরআনের বিশেষ সংকলন

আল-কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা

মোয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম

প্রকাশক

নারী প্রকাশনী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭১৫-৭৬৮২০৯, ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুন ২০১৪ ইং

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ৬৫০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

peacerafiq@gmail.com

ISB NO. 978-984-8885-61-1

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

মহান রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের হেদায়াতের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথ নির্দেশিকা হিসেবে আল-কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সকল দিক ও বিভাগে রয়েছে আল-কুরআনের দিক নির্দেশনা। মানুষের কিসে কল্যাণ ও মুক্তি তা একমাত্র তিনিই জানেন, যিনি তার স্রষ্টা। তাই দুনিয়ার জীবন সুচারুরূপে ও সুবিন্যস্তভাবে মহান রবের নির্দেশিত পথে অতিবাহিত করে আখেরাতের জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও পূর্ণ সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের প্রধান আলোকবর্তিকা আল কুরআন।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল-কুরআন সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে। নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহ তায়ালার প্রিয় সৃষ্টি। তাঁর রহমত ও দানের ব্যাপারে তিনি যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি, তেমনি তাঁর বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোনো তারতম্য রাখেননি।

জাহেলিয়াতের সেই নিষ্ঠুর বর্বরতা, অভিশাপ, লাঞ্ছনাকর জীবন থেকে নারী জাতিকে আল-কুরআন মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম নারীকে যে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে, পৃথিবার ইতিহাসে আর কোনো ধর্ম, রাষ্ট্র, সভ্যতা নারীকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, অধিকার দিতে পারে নি, কোনো দিন পারবেও না।

আজ বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলন, নারী অধিকার ও তথাকথিত প্রগতিশীল নারী মুক্তি বিভিন্ন শ্লোগান নারীদেরকে ইসলাম প্রদত্ত অধিকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তথা-কথিত প্রগতিশীলদের বিভ্রান্তিকর তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে নারী সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার পথে, পশুত্বের এক মারাত্মক ও ঘৃণ্য পর্যায়ে নারীকে পরিণত করা হচ্ছে ভোগ্য পণ্যে।

আর এটা সম্ভব হচ্ছে মুসলিম নারীদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুরআন-হাদিস থেকে দূরে থাকা, কুরআন তাদেরকে যে মর্যাদা, অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে না জানার ফলে। কুরআন নারী জাতিকে এত মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে যে, তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি।

আল-কুরআনে মহিলা বিষয়ক পঁচিশ সূরা শিরোনামে এই গ্রন্থটি মহিলাদের অধিকার, মর্যাদা, সম্মান বিষয়ে যে বর্ণনা এসেছে তারই একটি নমুনামাত্র।

পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আল কুরআনে কী শুধু ২৫টি সূরাতেই মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে? বিষয়টি আসলে তা নয়। আল-কুরআনে অনেক সূরাতেই মহিলা সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে। আমরা এ গ্রন্থে শুধু যে সূরাগুলোতে তুলনামূলক অধিক হারে মহিলা বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে সেগুলোকেই নির্বাচিত করেছি। সেই সাথে সূরার নামকরণ, শানে নুযুল, ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি যাতে বিষয়টি বুঝতে সহজ হয়। এ গ্রন্থে আমরা বিষয়গুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে সূরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি।

"আল-কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা" গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে ভুলত্রুটি রয়েছে তা সচেতন পাঠকগণ আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে শুধরানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকব। এই গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে যে সকল তাফসীর গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে তার তালিকা দেয়া হলো।

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর- আল্লামা ইবনে কাসীর রহ
২. মা'আরেফুল কুরআন- মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.
৩. তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ.
৪. কুরআনুল করীম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৫. বায়নুল কুরআন- শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.
৬. তাফসীরে মাযহারী- কাযী ছানা উল্লাহ পানী পথি রহ.
৭. তাদাব্বুরে কুরআন- আমীন আহসান ইসলাহী
৮. সিহাহ্ ছিত্তাহ হাদিস সংকলন–
৯. চল্লিশ হাদীসে কুদসী- ড. ইযযুদ্দীন ইবরাহীম রহ.
১০. মিশকাত
১১. হাদীসসমূহের ক্রমিক নাম্বার 'মাকতাবাতুশ শামেলাহ (الْمَكْتَبَةُ الشَّامِلَةُ) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে "আল-কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা" গ্রন্থ পাঠ করে পথ হারা, অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজ ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

সূচিপত্র

১. সূরা আল বাকারাহ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)

২. সূরা আলে ইমরান (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ)

৩. সূরা আন নিসা (سُوْرَةُ النِّسَاءِ)

৪. সূরা আল মায়েদাহ (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ)

৫. সূরা আল আরাফ (سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ)

৬. সূরা আত তওবা (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ اَوِ الْبَرَاءَةِ)

৭. সূরা ইউসুফ (سُوْرَةُ يُوْسُفَ)

৮. সূরা আন নাহল (سُوْرَةُ النَّحْلِ)

৯. সূরা বনী ইসরাঈল বা ইসরা (سُوْرَةُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ اِسْرَاءِ)

১০. সূরা মারইয়াম (سُوْرَةُ مَرْيَمَ)

১১.সূরা আন নূর (سُوْرَةُ النُّوْرِ)

১২. সূরা আল-ফুরকান (سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ)

১৩. সূরা আন নামল (سُوْرَةُ النَّمْلِ)

১৪. সূরা আল কাসাস (سُوْرَةُ الْقَصَصِ)

১৫. সূরা আল আহযাব (سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ)

১৬. সূরা আশ শূরা (سُوْرَةُ الشُّوْرٰى)

১৭. সূরা হুজরাত (سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ)

১৮. সূরা আল হাদীদ (سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ)

১৯. সূরা আল মুজাদালাহ (سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ)

২০. সূরা আল মুমতাহিনা (سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ)

২১. সূরা আত তাগাবুন (سُوْرَةُ التَّغَابُنِ)

২২. সূরা তালাক (سُوْرَةُ الطَّلَاقِ)

২৩. সূরা আত তাহরীম (سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ)

২৪. সূরা আবাসা (سُوْرَةُ عَبَسَ)

২৫. সূরা আল লাহাব (سُوْرَةُ لَهَبٍ)

১. সূরা আল বাকারাহ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)

আয়াত : ২৮৬ রুকূ : ৪০ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রত্যেকটি সূরার এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোনো পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশি সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী ﷺ মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরার বেশির ভাগ মদীনায় হিজরতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়স্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম ﷺ-এর জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজন করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায় এ সময় পর্যন্ত সম্বোধন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরতের পরে ইহুদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত, অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা মুহাম্মদ ﷺ দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা

আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোনো ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবস্তু তাদের মধ্য থেকে অন্তরহিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিস্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল যার ফলে কোনো প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোনো আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি তারা নিজেদের আসল 'মুসলিম' নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক 'ইহুদি' নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদিদেরকে আসল দীনের দিকে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রুকূ' এ দাওয়াত সম্বলিত। এ দু'রুকূ'তে যেভাবে ইহুদিদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ-

১. এ সময়ের প্রায় উনিশ শত বছর আগে মূসা عليه السلام-এর যুগ অতীত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব মতে মূসা عليه السلام খৃঃ পূঃ ১২৭২ অব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে নবী ﷺ ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

২. মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতর কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো, তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩টি রুকূ'তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে।

৩. হিজরতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরতের পরে এ বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট্ট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয়; বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর।

- পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা।
- বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে।
- গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুগছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ঘিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়।

- ➢ তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোনো দিক থেকে যে কোনো সশস্ত্র আক্রমণ আসবে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না।
- ➢ তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুকু ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

৪. ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী করীম ﷺ-এর মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু এ সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিস্‌সা ঝুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপ্‌টা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃংখল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাহ নাযিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

জান্নাতে নারী-পুরুষ পাবে পবিত্র সঙ্গী

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ : আর হে নবী! যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝরনাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোনো ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে, এ ধরনের ফলই ইতোপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। (আল বাকারাহ : ২৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : সূরা আল বাকারার এই আয়াতের মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'যওজ'। এর অর্থ হচ্ছে 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ'। তবে আখেরাতে 'আযওয়াজ' অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলি সহকারে। যদি দুনিয়ায় কোনো স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোনো সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোনো কোনো স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো সৎপুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোনো স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

পুরুষের জীবন যাপনে নারীর প্রয়োজনীয়তা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

অর্থ : আর আমরা আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছে মতো খেতে থাকো, তবে এই গাছটির কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা দু'জন যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা বাকারা : ৩৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে। অতঃপর তারই সংগিনী স্ত্রী হিসেবে তার দেহাংশ থেকে তৈরি করলেন বিবি হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, জান্নাতে বসবাস করতে। এখানে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি আদমকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাক। জান্নাতে হাজারো রকমের নায-নেয়ামত ভোগ করার জন্যে আদমকে বলা হলো। কিন্তু এতসব নিয়ামতের মধ্যেও তার সামগ্রিক প্রশান্তি ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্যে তাকে সস্ত্রীক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, স্ত্রী ছাড়া একজন পুরুষের জীবন যাপন অপূর্ণ থেকে যায়। তাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার পর পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন্যে সংগিনী (স্ত্রী) হিসেবে সৃষ্টি করলেন আদম আলাইহিস সালাম-কে পূর্বের আয়াতের মত এখানেও হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে আদম আলাইহিস সালাম-এর যওজ রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী দুটো লিংগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এদের দেহ গঠনের মৌল ফর্মূলা একই রকম। তবুও তারা পরস্পর হতে ভিন্ন ধরনের দৈহিক গঠন, মানসিকতা, আবেগ ও ভাবধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এতদসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। তারা সবাই পরস্পরের জন্যে পরিপূরক জুড়ি। সমস্ত পশু প্রজাতির মোকাবিলায় মানবজাতির মধ্যে সভ্যতা ও তমদ্দুন সৃষ্টির এটাই মূল কারণ যে, আল্লাহ এ নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি এমন বাসনা-কামনা ও ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, একজন আরেক জনের সাথে মিলিত ও সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউই প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। এ প্রশান্তি প্রাপ্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকা উভয়েরই সমান। সুতরাং সভ্য জীবন-যাপনের জন্যে যেমন নারী আবশ্যক, ঠিক তেমনিভাবে নারীর জন্যে আবশ্যক নরের।

এ থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ নিজের কর্মস্থলে খলীফা নিযুক্ত করে পাঠাবার আগে মানসিক প্রবণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাদের দু'জনকে পরীক্ষা করার জন্য জান্নাতে রাখা হয়। তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছ বাছাই করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। গাছটির কাছে গেলে তার পরিণাম কী হবে তাও বলে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয় এমনটি করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা যালেম হিসেবে গণ্য হবে। সে গাছটি কী ছিল এবং তার মধ্যে এমন কী বিষয় ছিল যে জন্য

তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে এ বিতর্ক এখানে অবান্তর। নিষেধ করার কারণ এ ছিল না যে, গাছটি প্রকৃতিগতভাবে এমন কোনো দোষে দুষ্ট ছিল যার ফলে তার কাছে গেলে আদম ও হাওয়ার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল আদম ও হাওয়ার পরীক্ষা। শয়তানের প্রলোভনের মোকাবিলায় তারা আল্লাহর এই হুকুমটি কতটুকু মেনে চলে তা দেখা। এই উদ্দেশ্যে কোনো একটি জিনিস নির্বাচন করাই যথেষ্ট ছিল। তাই আল্লাহ কেবল একটি গাছের নাম নিয়েছেন, তার প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি।

এই পরীক্ষার জন্য জান্নাতই ছিল সবচেয়ে উপযোগী স্থান। আসলে জান্নাতকে পরীক্ষাগৃহ করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মানবিক মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমাদের জন্য জান্নাতই উপযোগী স্থান। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যদি তোমরা আল্লাহর নাফরমানির পথে এগিয়ে যেতে থাক তাহলে যেভাবে শুরুতে তোমরা এ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে তেমনি শেষেও বঞ্চিত হবে। তোমাদের উপ যোগী এই আবাসস্থলটি এবং এই হারানো ফিরদৌসটি লাভ করতে হলে তোমাদের অবশ্যই নিজেদের সেই দুশমনের সফল মোকাবিলা করতে হবে, যে তোমাদেরকে হুকুম মেনে চলার পথ দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়
পুত্র সন্তানকে হত্যা করে মেয়ে সন্তানকে জীবিত রাখা

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

অর্থ : স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ফেরাউনী দলের দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবেহ্ করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিতো। মূলত এ অবস্থায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল। (সূরা বাকারা : আয়াত-৪৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মূসা عليه السلام-এর সময়কার মিসরের দ্বিতীয় ফিরাউন বাদশাহ্‌র আমলের ঘটনা। একদা ফেরাউন স্বপ্নে দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটা অগ্নিপিণ্ড মিসরের ফিরাউন বংশীয় কিবতী লোকদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করলো। ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সে জানতে পারলো যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের একটা লোকের হাতে তার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে কাসির এভাবে বর্ণনা করেছেন। মুফতি শফি (র)-এর মতে কেউ তাকে একথার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। যাই হোক, এ স্বপ্ন বা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ফিরাউন তার রাজ্যের নবজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো আর কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো। আল-কুরআনে ফিরাউনের এ আচরণকে বনী ইসরাঈলদের জন্য জঘন্যতম বিপদ ও পরীক্ষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চারটি দৃষ্টি কোণ থেকে ইসরাঈলীদের জন্যে এটা মহাবিপদ ও পরীক্ষা ছিলঃ-

১. ফিরাউনী বংশের হাতে তাদের বংশের ধ্বংস হওয়া এবং তাদের ভবিষ্যত বংশ বিস্তার খতম হয়ে যাওয়া। এভাবে ইতিহাসে তাদের নাম-নিশানা শেষ হয়ে যাওয়া।
২. তাদের পুত্র সন্তানদের তাদেরই সামনে প্রকাশ্যে হত্যা করার কঠিন মর্মপীড়া।
৩. নর-নারীর প্রজন্মের ভারসাম্য লোপ পেয়ে মানবীয় পরিবেশ ক্ষতবিক্ষত হওয়া।
৪. পুরুষরা পরিবারের কর্তা। জন্মগতভাবে পুরুষদের উপার্জন করার ও কঠোর জীবন পরিচালনার যোগ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুত্র সন্তানগণকে হত্যা করার পরিণামে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ধ্বংস করা হতো। এটাও ইসরাঈলদের জন্য কঠিন অগ্নি পরীক্ষা ছিল।

মূসা عليه السلام-এর যুগে তৎকালীন ফিরাউন তার রাজত্ব ও ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য মানব হত্যার এ জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করেছিল। মানবেতিহাসের এ হচ্ছে এক অমানবিক ও নির্মম অধ্যায়। নারীদের জন্য পুরুষ হচ্ছে জীবন-যাপনের অপরিহার্য স্বাভাবিক উপাদান স্বরূপ। নারী-পুরুষ পরস্পরের জন্য পরিপূরক হলেও উভয়ের গঠন-প্রকৃতি আর আজকের সামাজিক পরিবেশের নিরিখে নারীর জন্য বরং পুরুষ অধিক কাম্য।

অথচ ফিরাউন তার তখত ঠিক রাখার জন্য সমাজের প্রধান সদস্য নরকে হত্যা করে নারীকে ছেড়ে দিত। ফলে নারীর জীবন এক ভয়াবহ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে পড়তো। এ ছিল নারীদের জন্য এক অসহনীয় যন্ত্রণা ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এ যন্ত্রণা ও যুলুমকে আল্লাহ তায়ালা سُوْءَ الْعَذَابِ (মর্মান্তিক যাতনা) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদেরকে ফিরাউনের সেই কঠোর শাস্তি থেকে উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলার শেষ পর্যন্ত ফিরাউনকে নীল নদে নিমজ্জিত করে মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে বনী ইসরাঈলদের নাজাত দিয়েছিলেন।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং সকল মানুষের সাথে সদাচরণের নির্দেশ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

অর্থ : স্মরণ করো যখন ইসরাঈল সন্তানদের থেকে আমরা এই মর্মে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করবে না, মা-বাপ, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, লোকদেরকে ভালো কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই অংগীকার ভংগ করেছিলে এবং এখনো ভেঙে চলছো।

(সূরা বাকারা : আয়াত-৮৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ মেনে নেয়ার নির্দেশের পর পরই নিজের মাতা ও পিতার সেবা-যত্ন করার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে; বরং বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ সরাসরি তাওহীদের পরেই মাতা ও পিতার প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থ : তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ইহসান বা সদাচার করো। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

সূরা লোকমানে বলেছেন, اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

এভাবে সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন নারীকেও অর্থাৎ মাতাকেও পিতার সাথে মর্যাদা দিয়ে নর-নারী সবাইকে নিজ নিজ মাতা ও পিতার খিদমত ও শোকর আদায় করতে নির্দেশ

দিয়েছেন। আর এ নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকৃতির সাথে মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করার।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ তার এক বাণীতে পিতার তুলনায় মাতা অর্থাৎ নারী জাতির সেবা শুশ্রূষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একদা জনৈক সাহাবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি কার প্রতি সাদাচার প্রদর্শন করবো? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? তিনি এবারও জবাব দিলেন তোমার মায়ের প্রতি। চতুর্থ বার জিজ্ঞাসিত হলে নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, তোমার পিতার প্রতি। অন্য হাদীসে কিছু সংযোজন করা হয়েছে যে, অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়ের প্রতি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা মহাপাপ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ.

অর্থ : এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো। (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : সোলায়মান আলাইহিস সালামের যুগের একটি ঘটনা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন লোকদের নিকট অধিকতর চাহিদার বিষয় ছিল তাবিজ-তুমার বা যাদুর প্রভাবে অন্যের স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। হারূত ও মারূত নামের দু'জন ফেরেশতাকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা পরীক্ষায় টিকতে পারেনি।

সেই বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল এমন তাবীজের যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্য একজনের স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের প্রতি প্রেমাসক্ত করতে পারে। তাদের মধ্যে নৈতিক পতন দেখা দিয়েছিল এটি ছিল তার নিকৃষ্টতম পর্যায়। যে জাতির সদস্যবৃন্দ পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হওয়া ও অন্যের বিয়ে করা বউকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াকে নিজেদের সবচেয়ে বড় বিজয় মনে করে এবং এটিই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাজে পরিণত হয়, তার নৈতিক অধপতন যে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার সুস্থতা এবং অসুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার অসুস্থতা নির্ভরশীল। কাজেই যে বৃক্ষটির দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকার ওপর ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের টিকে থাকা নির্ভর করে তার মূলে যে ব্যক্তি কুঠারঘাত করে তার চাইতে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হতে পারে? হাদীসে বলা হয়েছে, ইবলিস তার কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় নিজের এজেন্ট পাঠায়। এজেন্টরা কাজ শেষে ফিরে এসে

নিজেদের কাজের রিপোর্ট শুনাতে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক ফিতনা সৃষ্টি করেছি। কেউ বলে, আমি অমুক পাপের আয়োজন করেছি। কিন্তু ইবলিস প্রত্যেককে বলে যেতে থাকে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর একজন এসে বলে, আমি এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। একথা শুনে ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে বলতে থাকে, তুমি একটা কাজের মতো কাজ করে এসেছো। এ হাদীসটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বনী ইসরাঈলদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল তাদের কেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার 'আমল 'লোকদেরকে শিখাবার হুকুম দেয়া হয়েছিল তা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়। আসলে তাদের নৈতিক অধঃপতনের যথাযথ পরিমাপের জন্য এটিই ছিল একমাত্র মানদ- ।

হত্যাকারী নারী হলেও কিসাস প্রযোজ্য

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে। তবে কোনো হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী কোনো স্বাধীন ব্যক্তি হলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোনো ক্রীতদাস বা কোনো নারীকে হত্যার বদলেও হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। স্ত্রী হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কোনো প্রভাবশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে যেমন, কোনো একজন প্রভাবশালী পুরুষ লোকের কিসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে একজন অসহায় নারী হত্যার কিসাসেও।

'কিসাস' হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী

যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবে তাকেও হত্যা করতে হবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।

জাহেলী যুগের হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কোনো জাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির রক্তকে যে পর্যায়ের মূল্যবান মনে করতো হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা জাতির কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের রক্ত আদায় করতে চাইতো। নিহত ব্যক্তির বদলায় কেবলমাত্র হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করেই তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো না; বরং নিজেদের একজন লোক হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চাইতো তারা প্রতিপক্ষের শত শত লোককে হত্যা করে। তাদের কোনো অভিজাত ও সম্মানী ব্যক্তি যদি অন্য গোত্রের একজন সাধারণ ও নীচু স্তরের লোকের হাতে মারা যেতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিছক হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না; বরং হত্যাকারীর গোত্রের ঠিক সমপরিমাণ অভিজাত ও মর্যাদাশীল কোনো ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে অথবা তাদের কয়েকজনকে হত্যা করতে চাইত। বিপরীত পক্ষে নিহত ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে যদি কোনো সামান্য ব্যক্তি হতো আর অন্যদিকে হত্যাকারী হতো বেশি মর্যাদাশীল ও অভিজাত, তাহলে এ ক্ষেত্রে তা নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলায় হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে দিতে চাইতো না। এটা কেবল, প্রাচীন জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল না। বর্তমান যুগেও যাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মনে করা হয় তাদের সরকারী ঘোষণাবলিতেও অনেক সময় নির্লজ্জের মতো দুনিয়াবসীকে শুনিয়ে দেয়া হয়- আমাদের একজন নিহত হলে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশজনকে হত্যা করবো। প্রায়ই আমরা শুনতে পাই, এ ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির আটককৃত বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশ শতকের একটি 'সুসভ্য' জাতি নিজেদের এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর। অন্যদিকে এই তথাকথিত সুসভ্য জাতিগুলোর বিধিবদ্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায়, হত্যাকারী যদি শাসক জাতির এবং নিহত ব্যক্তি পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের বিচারকরা প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে চায় না। এসব অন্যায় ও অবিচারের পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর কোনো প্রকার মর্যাদার বাছ-বিচার না করে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা হবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোষাক স্বরূপ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

অর্থ : রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য ও অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেহ ও পোশাক যেমন পরস্পরের একান্ত ঘনিষ্ট অবিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি একে অপরের জন্যে একান্ত আপনজন। পোশাক যেমন দেহকে হেফাজত করে ও তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি পরস্পরকে সংরক্ষণ ও পরস্পরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পোশাক যেমন শীত ও গরমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও মানুষকে পদস্খলন ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাচিয়ে রাখে। সমস্যাটি তৎকালীন সাহাবায়ে কিরামের সিয়াম পালন ব্যাপদেশে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল। তখন ইফতার গ্রহণের পর থেকে নিদ্রা গমন পর্যন্ত কেউ পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করতে পারতো না। আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে ইসলামের প্রথম দিকে তা ছিল নিষিদ্ধ। এ আয়াতে তা হালাল করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ মু'মিনদের মনের সংকীর্ণতা পরিহার করে বিবেকের পূর্ণ আশ্বস্তি ও পবিত্রতার অনুভূতিসহ স্ত্রীগমন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শুরুতে রমযান মাসের রাত্রিকালে স্ত্রীর সাথে রাত্রিবাস করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও লোকেরা এমনটি করা অবৈধ মনে করতো। তারপর এই অবৈধ বা অপছন্দনীয় হবার ধারণা মনে পোষণ করে অনেক সময় তারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে চলে যেতো। এটা যেন নিজের বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি অপরাধ ও পাপ মনোবৃত্তির লালনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ্ প্রথমে তাদেরকে বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন অতঃপর বলেছেন, এটা তোমাদের জন্য বৈধ। কাজেই এখন তোমরা খারাপ কাজ মনে করে একে করো না; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের সুযোগ গ্রহণ করে মন ও বিবেকের পূর্ণ পবিত্রতা সহকারে করো।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে অনেকগুলো বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া হলো-

একদিন ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিগত রাত্রে আমি আমার স্ত্রীর কাছে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম যা সাধারণত একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে করে থাকে। আমার স্ত্রী জানালো, সে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু তার সে কথাকে আমি বাহানা মনে করে তার সাথে সহবাস করেছি। এ ঘটনার পর উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ

এ ঘটনাটির আরেকটি দিক হলো কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, পরদিন প্রত্যুষেই উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর অবস্থা (উপরোক্ত ঘটনা) বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন।

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা যে নিজেদের ব্যাপারে খেয়ানত করেছিলে তা আল্লাহ জানেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করেছেন, আর তোমাদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন থেকে তোমরা (সুবহে সাদেক পর্যন্ত) স্ত্রী সহবাস করতে পার। (আল বাকারা : আয়াত-১৮৭)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

অর্থ : স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখ বলেন:

هُنَّ سَكَنٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ سَكَنٌ لَّهُنَّ.

অর্থ : স্ত্রীগণ তোমাদের মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে শান্তি ও তৃপ্তি স্বরূপ।

রাবী ইবনে আনাস এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

هُنَّ لِحَافٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِحَافٌ لَّهُنَّ

অর্থ : তারা তোমাদের জন্যে লেপ স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে লেপ স্বরূপ।

এসব ব্যাখ্যার সারকথা হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এক সাথে অহরহ মিলে-মিশে থাকতে হয় এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে জীবন কাটাতে হয়। একই শয্যায় শয়ন করতে হয়। সুতরাং রমযানের রাতের বেলায় রোযা যেন তাদের জন্যে পীড়াদায়ক না হয়, সে জন্যে রমযানের রাতে স্ত্রী সহবাস হালাল করে দেয়া হয়েছে।

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রী সহবাসকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বভাবগত ধর্মে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যে কারণে প্রথম মানুষ আদম -এক সৃষ্টি করে বিবি হাওয়া কে তার জীবন সংগীনি (স্ত্রী) হিসেবে সৃষ্টি করে বেহেশতে শান্তিতে বসবাস করতে দিলেন। মানব বংশ রক্ষার জন্যে বিবাহ্ সূত্রে আবদ্ধ থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দিয়ে সমাজ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত করতেই ইসলামে বিবাহ্ নীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে ফিতরাতের ধর্ম ইসলামের স্বাভাবিক পদ্ধতি।

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্যে পোশাক ঘোষণা দিয়ে মানব স্বভাবের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে। দু'জন পৃথক সত্ত্বা হলেও দু'জনেরই অবিচ্ছেদ্য হয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করে থাকে। স্ত্রীদের সে জন্যেই অর্ধাঙ্গীনি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের সমাজে মেকী ভালবাসার খপ্পরে পড়ে আল্লাহর ঘোষিত স্বামী-স্ত্রীর সেই অকপট মধুর সম্পর্ক আর বাকি নেই। অধিকন্তু আজকের সমাজে যৌতুকের প্রাধান্য এবং ঘোষিত ও অঘোষিত যৌতুক প্রথার দৌরাত্মে দাম্পত্য জীবনের সেই প্রাকৃতিক প্রেম-প্রীতি বিলীন প্রায়। শরীয়তী বিবাহের পরিবর্তে বাণিজ্যিক বিবাহ্ মুসলিম সমাজকেও আজ এক ভয়াবহ্ পর্যায়ে উপনীত করেছে। মুসলমানদের সমাজকেও আজ এক ভয়াবহ্ পর্যায়ে উপনীত করেছে। মুসলমানদের সচেতনতা ও খাঁটি শরয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া এ মারাত্মক পর্যায় অতিক্রম করা কি সম্ভব?

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ.

"মসজিদে ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না। রমযানের রাতে খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি হালাল করা হয়েছে, কিন্তু রমযানের শেষ ১০ দিনে যে ই'তিকাফ এর বিধান রয়েছে সেই ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় রাত্রী বেলায়ও স্ত্রী সহবাস জায়েয নেই। এখানে খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ই'তিকাফকারী ব্যক্তি রমযানের রাতের বেলায় পানাহার করতে পারবে ঠিকই তবে স্ত্রীসঙ্গম করতে পারবে না। এ হুকুম কেবল ই'তিকাফকারী রোযাদারের জন্য মাত্র, আর ই'তিকাফ ছাড়া রোযাদারের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।

আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا.

"আর তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না যখন তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় থাক। এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা

সুতরাং তোমরা এসবের ধারের কাছেও যেও না। اِعْتِكَافٌ (ই'তিকাফ) শব্দের অর্থ কোনো স্থানে অবস্থান করা। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

فِي الْمَسٰجِدِ মসজিদসমূহে (বহুবচন) বলে বুঝানো হয়েছে যে, এ ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদে হতে পারে। অবশ্য মসজিদ বলতে যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাআত হয়ে থাকে তাকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু যৌন স্বাদ আস্বাদন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা একান্ত অপরিহার্য। রোযাদার ও ই'তিকাফকারীর জন্য এসব সীমারেখা বলে দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এসব সীমারেখার ধারেও যেও না। অর্থাৎ যেখান থেকে গুনাহের সীমানা শুরু হচ্ছে ঠিক সেই শেষ প্রান্তের সীমানা লাইনে চলাফেরা করা বিপদজনক। সীমানা থেকে দূরে অবস্থান করাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ সীমানা বরাবর চলতে গেলে ভুলে সীমানার ওপারে পা চলে যেতে পারে।

বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুমাত্র যৌন সম্পর্ক নয়

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ : মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারী তোমাদের মনহরণ করলেও একটি মু'মিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহবান জানাচ্ছে আগুনের দিকে আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মুশরিকদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে উপরে যে কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে তার মূল কারণ ও যুক্তি। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়েটা নিছক একটি যৌন সম্পর্ক মাত্র নয়; বরং এটি একটি গভীর তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানসিক সম্পর্ক। মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর প্রভাবে মুশরিক স্ত্রী বা স্বামী এবং তার পরিবার ও পরবর্তী বংশধররা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন ধারায়

গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে, সেখানে অন্যদিকে মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারে কেবলমাত্র মু'মিন স্বামীর বা স্ত্রীরই নয়; বরং তার সমগ্র পরিবার ও পরবর্তী বংশধরদেরও প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতিতে ইসলাম কুফর ও শিরকের এমন একটি মিশ্রিত জীবন ধারা সেই গৃহে ও পরিবারে লালিত হবার সম্ভাবনাই বেশি, যাকে অমুসলিমরা যতই পছন্দ করুক না কেন ইসলাম তাকে পছন্দ করতে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয়। কোনো খাঁটি ও সাচ্চা মু'মিন নিছক নিজের যৌন লালসা পরিতৃপ্তির জন্য কখনো নিজ গৃহে ও পরিবারে কাফেরী ও মুশিরকী চিন্তা-আচার-আচরণ লালিত হবার এবং নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকে প্রভাবিত হয়ে যাবার বিপদ ডেকে আনতে পারে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো মু'মিন কোনো মুশরিকের প্রেমে পড়ে গেছে তাহলেও তার ঈমানের দাবী হচ্ছে এই যে, সে নিজের পরিবার, বংশধর ও নিজের দীন, নৈতিকতা ও চরিত্রের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত আবেগকে কুরবানী করে দেবে।

যৌন সম্পর্ক অনেকটা পাশবিক আকর্ষণ। মানব জীবনে যৌন আকর্ষণ আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটা বিশেষ দিক মাত্র। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ও মানব বংশ রক্ষার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের বয়সের একটা সীমা পর্যন্ত যৌন আকর্ষণ দিয়েছেন। পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করে মানব সমাজের শৃংখলা আনয়ন করে মানব বংশ বৃদ্ধি করে ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে পূর্ণ মানবতা হাসিলের জন্যে দাম্পত্য জীবনের নর-নারীর এক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে এ যৌন আকর্ষণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনায় পাশবিক প্রেম প্রাথমিক সোপানের ন্যায় গণ্য হয়ে থাকে। 'ইশকে মাজাযী' থেকে মানুষ 'ইশকে হাকীকীর' স্তরে উপনীত হতে পারে।

সুতরাং যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তই বিবাহের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এটা তো যুবক-যুবতীর মনের সাময়িক-সম্পূর্ণ অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কের একটা দিক মাত্র। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও একমাত্র দিক এটা নয়। এক জোড়া দম্পত্তির পুরো জীবনের সফলতার জন্যে তাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। কাজেই দু'জনের চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা ও আকীদা-বিশ্বাসে সামঞ্জস্য একান্ত অপরিহার্য। কোনো অমুসলিম নারী একজন মুসলিম নরের জন্যে উপযুক্ত নয়, যেমন করে একজন অমুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীর সাথী হওয়ার যোগ্য নয়। অমুসলিম নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও আর্থিক সচ্ছলতা এ ক্ষেত্রে মোটেই গণ্য হতে পারে না।

আমাদের সমাজে দেখা যায়, সহশিক্ষার কারণে অনেক স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যৌন আকর্ষণে পরস্পরকে ভালবেসে মাতা-পিতার প্রতি কলংক লেপন করে পালিয়ে বিয়ে করে। আর তাদের ঐ সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতায় রূপায়িত হতেও দেখা যায়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় লাভ মেরেজের প্রায় ৭০% শেষ পর্যন্ত বিবাহ

বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। কারণসমূহের মধ্যে প্রধানত এর সাময়িক আকর্ষণ, বাহ্যিক ভালবাসা, আবেগ প্রবণতা, অদূরদর্শিতা এবং সর্বোপরি মাতা-পিতার সদিচ্ছার অভাবই এজন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

বিবাহে মানুষের পুরো দুনিয়ার জীবনের জন্য সাথী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাই ইসলাম উভয়কে এখতিয়ার দিয়েছে পরস্পরকে দেখে শুনে নেয়ার জন্য। তা ছাড়া বর ও কনের সার্বিক সমতা (কুফু) হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ইসলামে। বিশেষতঃ দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অত্যাবশ্যক। আদর্শিক মানসিকতা ও আমলী জিন্দেগীতে বর-কনে যেন অভিন্ন হয়, তারপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় স্বামীর আচরণ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ : তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কী? বলে দাও, সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে কাছেও যেয়ো না। তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২২২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় স্বামীর আচরণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীদের তাদের সাথে খেতে দিতো না। এমনকি তাদের সাথে এক ঘরে ঘুমাতোও না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয"।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হায়েজ অবস্থায় আমি হাড় চুষে দিলে তিনিও একই স্থানে মুখ দিয়ে চুষতেন। আমি পানি পান করে রেখে দিলে তিনি পাত্রের একই স্থানে মুখ দিয়ে ঐ পানি পান করতেন।

তিনি আরও বলেন, আমার হায়েজ অবস্থায় হুজুর ﷺ গোসলের সময় আমাকে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতে বলতেন। আমার ঐ অবস্থায় তিনি আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

হাদীসে এও রয়েছে যে, একদা হুজুর ﷺ তাঁর কোনো ঋতুবতী স্ত্রীকে মসজিদ থেকে (জানালা দিয়ে) বিছানা এনে দিতে বললেন। তখন তিনি ঋতুবতী বলে ওজর পেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন إِنَّ حَيْضَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ "তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়।"

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের বর্ণনায় স্ত্রীদের হায়েজ অবস্থায় স্বামীর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মূলকথা অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলিম জাতির স্ত্রীগণ হায়েজ অবস্থায় অস্পৃশ্য হয়ে যায় না। ঐ অবস্থায়ও স্ত্রীরা স্বামীদের সাথে একই বিছানায় শয়ন করতে ও একই পাত্রে খেতে পারে। ইসলাম নারীদের এ প্রাকৃতিক অবস্থায়ও তাদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করার রীতি বহাল রেখেছে। অপবিত্রতার কারণে স্ত্রীসংগম করা জায়েয না হলেও তাদের ঐ অবস্থায় অন্যান্য স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার বৈধ। এভাবে ইসলাম নারীদের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় পাশ্চাত্যের গবেষকদের নারী সম্পর্কিত মন্তব্যের কথা। তারা ভাবতেন নারীদের আত্মা আছে কিনা? থাকলে তা কী ধরনের? কোন জাতীয় তা কি মানুষের আত্মা?

উক্ত আয়াতের মাঝের অংশে বলা হয়েছে, "যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে তাদের কাছে যাও।" অর্থাৎ সহবাস কর। এখানে স্থান বলতে সঙ্গমস্থল অর্থাৎ স্ত্রীলিংগ বুঝানো হয়েছে। স্ত্রীলিংঙ্গ ছাড়া অন্য পথে সংগম করলে তা হবে সীমাসংঘন জনিত অপরাধ।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ও অন্যান্যের মতে পায়খানার রাস্তায় রতিক্রিয়া হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজকের পাশ্চাত্যের প্রগতিশীলদের (?) দেশে আইন করে সমকামিতা বৈধ করা হয়েছে। এভাবে তারা রুচী বর্জিত হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে অবনত হয়েছে। আর অভূতপূর্ব রোগ বিস্তার লাভের পথ সুগম করছে। তথাকথিত সভ্য জাতির মাঝে এমনি ধরনের অসভ্য আচরণ চলছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।" এখানে আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে তাওবাকারী বলতে গুনাহ বর্জনকারী ও হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত ব্যক্তিকে ঝুঝানো হয়েছে; আর অপবিত্রতা অবলম্বনকারী বলতে আল্লাহর নিষিদ্ধ যাবতীয় নোংরামী ও হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসংগম থেকে বিরত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

أَذًى এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক. কষ্ট ও ক্ষতি; দুই. এমন অপবিত্রতা যা মানুষ অপছন্দ করে। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যেই কষ্টকর, ক্ষতি ও অপবিত্রতা। স্ত্রীর ক্ষতি হলো, হায়েজ জনিত ব্যাথার আঘাত লাগা, ব্যথিত শিরায় আঘাত লাগার কষ্ট, জুরায়ুর সংকোচন সম্প্রসারণ, হায়েজ অনিয়মিতা আর স্বামীর রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এসব কারণে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসংগম নিষেধ করা হয়েছে। উত্তমরূপে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্ত্রীসংগম হারাম করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা নর-নারীকে উপরিউক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

কেবল যৌন চাহিদা চরিতার্থ করাই স্ত্রীসহবাসের উদ্দেশ্য নয়

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২২৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : স্ত্রী জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ নয় যে, তারা পুরুষের "বিহার ক্ষেত্র" হিসেবে ব্যবহৃত হবে; বরং দুনিয়ার জীবন-যাপনে নর-নারী হবে পরস্পরের সহযাত্রী। সহাবস্থানের ব্যাপদেশে বৈধ উপায়ে তাদের সংগমের অনুমতি য়েছে। প্রকৃতিগতভাবে তাদের মাঝে সেই স্পৃহাও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে নারীদেরকে পুরুষের যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্যেই সৃষ্টি করা হয়নি, সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তারসহ দুনিয়ার জীবন-যাপনে, পুরুষের সহগামী হিসেবে। বরং নর-নারী পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনেও সৃষ্টির ক্রমধারা জারী রাখা তথা মানব বংশের বিস্তার সাধন করার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। উদ্দেশ্য এ নয় যে, সহবাস বা সংগমের কারণে সন্তান হবে; বরং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম ও প্রসেস হলো স্ত্রীসংগম। যে কারণে আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদেরকে পুরুষদের কৃষিক্ষেত্র বলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষেত ও কৃষকের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম নারীকে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেন নি এবং তাদের উভয়ের মধ্যে জমি ও কৃষকের মতো একটা সম্পর্ক রয়েছে। জমিতে কৃষক নিছক বিচরণ ও ভ্রমণ করতে যায় না। জমি থেকে ফসল উৎপাদন করার জন্যই সে সেখানে যায়। মানব বংশ ধারার কৃষককেও মানবতার এই জমিতে সন্তান উৎপাদন ও বংশধারাকে সুমন্নত রাখার লক্ষ্যেই যেতে হবে। মানুষ এই জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীয়াতের কোনো বক্তব্য নেই। তবে তার দাবী কেবল এতটুকুন যে,তাকে জমিতেই যেতে হবে এবং সেখান থেকে ফসল উৎপাদন করার লক্ষ্যেই যেতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে "তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো" দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝানো হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হয়। দু'টিরই গুরুত্ব সমান। এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বংশধারা রক্ষা করার চেষ্টা করো। তোমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগেই যেন তোমাদের স্থান গ্রহণকারী তৈরি হয়ে যায়। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যে পরবর্তী বংশধরকে তোমরা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছো, তাকে দীন, ঈমান, চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলিতে ভূষিত করার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, এই দু'টি দায়িত্ব পালনে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গাফলতি বা ত্রুটি করো তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম করলে

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ। যদি তারা রুজু করে (ফিরে আসে) তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেবার সংকল্প করে তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত : ২২৬-২২৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : ফিক্‌হর পরিভাষায় একে বলা হয়, 'ঈলা'। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় মধুর সম্পর্ক থাকা তো সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময় সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বহুবিধ কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াত এমন ধরনের সম্পর্ক ভাঙা পছন্দ করে না, যার ফলে উভয়ে আইনগতভাবে দাম্পত্য বাঁধনে আটকে থাকে কিন্তু কার্যত পরস্পর এমনভাবে আলাদা থাকে যেন তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। এই ধরনের সম্পর্ক বিকৃতির জন্য আল্লাহ চার মাস সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই চার মাসের মধ্যে উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে হবে। অন্যথায় এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে। তারপর উভয়ের স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবে।

আয়াতে যেহেতু 'কসম খেয়ে বসা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই হানাফী ও শাফেঈ ফকীহগণ এই আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, যেখানে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক না রাখার কসম খায় একমাত্র সেখানেই এই বিধানটি কার্যকর হবে। আর কসম না খেয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক যত দীর্ঘকালের জন্য ছিন্ন করুক না কেন এই আয়াতের নির্দেশ সেখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মালেকী ফকীহদের মত হচ্ছে, কসম খাক বা না খাক উভয় অবস্থায় এই চার মাসের অবকাশ পাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি বক্তব্যও এর সমর্থনে পাওয়া যায়।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হাসান বসরীর (র) মতে এই নির্দেশটি শুধুমাত্র বিকৃতির কারণে যে সম্পর্কচ্ছেদ হয় তার জন্য প্রযোজ্য। তবে কোনো অসুবিধার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে তবে তার ওপর এই নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ফকীহদের মতে স্বামী-স্ত্রী মধ্যকার দৈহিক সম্পর্ক ছিন্নকারী প্রত্যেকটি শপথই 'ঈলা'র অন্তর্ভুক্ত এবং সন্তুষ্টির সাথে হোক বা অসন্তুষ্টির সাথে হোক চার মাসের বেশি সময় পর্যন্ত এই ধরনের অবস্থা অব্যাহত থাকা উচিত নয়।

কোনো কোনো ফকীহ এ বাক্যের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, এই নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে যদি তারা নিজেদের কসম ভেঙে ফেলে এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে নেয়, তাহলে তাদের কসম ভাঙার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তাদেরকে এমনিতেই মাফ করে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে এই

যে, কসম ভাঙার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু বলার মানে এই নয় যে, কাফ্ফারা মাফ করে দেয়া হয়েছে; বরং এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের কাফ্ফারা কবুল করে নেবেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের সময়ে তোমরা পরস্পরের ওপর যেসব বাড়াবাড়ি করেছিলে সেগুলো মাফ করে দেবেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীগণের মতে 'রুজু' করার অর্থ শপথ ভাঙার ও পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাস সময়-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সময়টি অতিবাহিত হয়ে যাওয়া এই অর্থ বহন করে যে, স্বামী তালাক দেয়ার সংকল্প করেছে। তাই এ অবস্থায় এই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথেই আপনা আপনি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেটি হবে এক 'তালাক বায়েন'। অর্থাৎ ইদ্দত পালনকালে স্বামীর আর স্ত্রীকে গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। তবে তারা উভয়ে চাইলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এ ধরনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। হানাফী ফকীহগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মাকহূল, যুহরী প্রমুখ ফীহগণ এই মতটির এই অংশটুকুর সাথে একমত হয়েছেন যে, চার মাস সময় অতিবাহিত হবার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁদের মতে সেটা হবে এক 'তালাক রজঈ'। অর্থাৎ ইদ্দত পালন কালে স্বামী আবার স্ত্রীকে রুজু করার তথা দাম্পত্যা সম্পর্কে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। আর যদি 'রুজু' না করে তাহলে ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর দুই জন আবার চাইলে বিয়ে করতে পারবে।

স্ত্রীকে তালাক দেওয়া : ইদ্দত ও প্রত্যাহারের সময়সীমা

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا.

অর্থ : তালাক প্রাপ্তাগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে।

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২২৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রদত্ত বিধানটির ব্যাপার ফকীহগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের একটি দলের মতে, স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার পর যতক্ষণ সে গোসল করে পাক-সাফ না হয়ে যাবে ততক্ষণ তালাকে বায়েন অনুষ্ঠিত হবে

না এবং ততক্ষণ স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এই মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিপরীত পক্ষে অন্য দলটি স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হবার সাথে সাথেই স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার খতম হয়ে যাবে। এই মত পোষণ করেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাফেঈ ও মালেকী ফকীহগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই নির্দেশটি কেবলমাত্র যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় তখনকার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর আর তার রুজু করা অধিকার থাকবে না।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদার ক্ষেত্রে মূলনীতি

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ্ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত ২২৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে। তেমনি পুরুষদের উপরও রয়েছে নারীদের অধিকার। আর উভয়কেই উভয়ের অধিকার প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, পুরুষদের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি। এ আয়াতে সেই দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ নারীদের তুলনায় পুরুষদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

সূরা নিসায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

অর্থ : "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ, আল্লাহ্ তাদের একের উপর অপরকে বিশেষ মর্যাদার ভূষিত করেছেন এবং এ জন্যে যে পুরুষরা নারীদের পেছনে তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

আল কুরআনে সূরা আল বাকারার এ ছোট আয়াতাংশে নর-নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরাট বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এতে নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কিত মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব করে

দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু আয়াতাংশে স্ত্রীলোকদের অধিকারের কথা পুরুষদের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের উচিত তারা যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করে। কারণ, পুরুষ তো নিজের বাহুবলে ও আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু পুরুষদের উচিত নারীদের অধিকারের কথা চিন্তা করা। কেননা সাধারণত নারীরা শক্তি দিয়ে নিজ অধিকার আদায় করতে পারে না।

আল্লাহর বাণীর শব্দাবলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে مِثْلُ শব্দ দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকারের সমতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান। তাই বলে এর মানে এ নয় যে, উভয়কেই একই ধরনের কাজ করতে হবে এবং তাদের কর্মস্থল অভিন্ন হবে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তাদেরকে দৈহিক আকৃতি, গঠন, শক্তি ও সামর্থের পার্থক্য করা হয়েছে। যে কারণে তারা সামাজিক ও পারিবারিক কাজে পরস্পরের বিকল্প নয়; বরং পরিপূরক বা সম্পূরক।

আল কুরআনে পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ পুরুষদের জন্যে নারীদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এখানে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মদার ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসায় قَوَّامُوْنَ বলে পুরুষদেরকে কর্তৃত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব দান এজন্যে যে, পুরুষদের দৈহিক গঠন ও মানসিকতার সৃষ্টিগত পার্থক্যের দরুন তারা কর্তৃত্ব করারই উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীদের যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীরই উপর বর্তায়। আর স্ত্রীগণ হচ্ছে তাদের সহযোগী মাত্র। আল-কুরআনের ভাষায় স্ত্রীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেমন জঘন্য অন্যায়, তেমনি তাদের বল্গাহীনভাবে পুরুষদের আওতা মুক্ত করে দেয়াও নিরাপদ নয়। বৈষয়িক জীবনে স্ত্রীদের পুরুষদের সম্পূর্ণ আওতামুক্ত করা নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে করে পৃথিবীতে রক্তপাত, ফিতনা-ফাসাদ ও বিবাদ-বিষম্বাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর সমাজে বিস্তার লাভ করে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন সমাজকে করে কলুষিত।

আজকের বিশ্বে নারী প্রগতি ও নারীর অধিকারের নামে নারীকে পুরুষদের বিকল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ সৃষ্টি রহস্যে নর-নারী হলো পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরক। আল-কুরআন নারীকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারীকে তার স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষদের কর্মস্থলে টেনে এনে সমান অধিকারের কথা বলে তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ বোঝা। স্বভাব-প্রকৃতির দেয়া নারীত্বের দায়িত্ব আর তারই সাথে কথিত প্রগতিবাদীদের আরোপিত পুরুষের সমান পুরুষোচিত দায়িত্ব। এতে করে নারীদের প্রতি বাড়তি যুলুমই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। প্রকৃতিগতভাবে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব তাদের পালন করতেই হচ্ছে। আবার পুরুষদের কর্ম ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগী হয়ে উপার্জনের দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

সামাজিক শান্তি শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীদের উপর কিছুটা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তা পালন করা ফরয করেও দেয়া হয়েছে। এর অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে যথেচ্ছ আচরণ করবে অথবা স্বামীরা স্ত্রীদের ঘরের আসবাবপত্র বা গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে; বরং পুরুষদের ও বিশেষ মর্যাদাটুকু রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এজন্যেই বরাদ্ধ করা হয়েছে যাতে পৃথিবীর 'জীব পরিবেশ' তথা মানব পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একমাত্র ইসলামই নারীদের যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। কথাটা এজন্যে প্রশ্নাতীত সত্য যে, ইসলাম তথা কুরআন সুন্নাহ সেই আল্লাহরই দেয়া বিধান, যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন– তাদের নর-নারীতে শ্রেণি বিন্যাস করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে তার সৃষ্টির কল্যাণ করার যোগ্যতা কার আছে?

নারীদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আল কুরআনে বলা হয়েছে, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ করে জীবন-যাপন কর।" হাদীসে এসেছে خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" তা ছাড়া

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থ : " জান্নাত মায়েদের পদতলে" ইত্যাদি।

নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নেই বললেই চলে। ইসলাম নারীকে তারই হাতে সমস্ত মোহরানার টাকা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। স্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক মোহরের অর্থ তাকে দিতে হয়। আর মোহরের পরিমাণ হতে হবে মর্যাদার ভিত্তিতে। টাকা স্ত্রীকেই দিতে হয় আর তাতে স্বামীর কোনো অধিকারই থাকে না। আর তখন থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপরই ন্যস্ত। কসমেটিক্স থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হয়। এমনকি স্ত্রীর আয়ের উৎস কর সমস্ত ব্যয়ভার স্বামীর উপরই বর্তায়। তার আয়ের মালিক সেই হবে অথচ আর ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করবে স্বামী। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে ও স্বামীর সম্পত্তিতেও তার হিস্যা সংরক্ষিত আছে। নারীর এতবড় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিশ্বের অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। মুসলিম মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মতলববাজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এত সুন্দর ইলাহী ব্যবস্থা তথা ইসলামী জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। কতই না ভাল হতো! যদি শিক্ষিত মহিলারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতো।

আজকের সমাজে আল্লাহর দেয়া উপরিউক্ত বিশেষ মর্যাদার অপব্যবহার করে পুরুষরা নারীদের উপর যেমন চালাচ্ছে নির্যাতন ও অত্যাচার; তেমনি এ নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতির নামে এবং নারী স্বাধীনতার ধূয়া তুলে অবলা নারীদের নামিয়ে আনা হচ্ছে পুরুষদের

কর্মস্থলে। নারী মুক্তির আকর্ষণীয় যবনিকার অন্তরালে তাদের গণ্য করা হচ্ছে ভোগ্য পণ্যে বা ভোক্তার দ্রব্যে। মানব ইতিহাসের সামগ্রিক পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুতে অক্ষম অসহায় নারী সমাজ অপরিণামদর্শী ও সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞ পণ্ডিতমন্য কতিপয় পুরুষের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাতে সঁপে দিচ্ছে। আজকের পাশ্চাত্যের নারী সভ্যতার ইতিহাস একথার জ্বলন্ত সাক্ষী। তবুও কি মুক্তিকামী নারী সমাজের বোধোদয় হবে না? অন্যথা অনাগত প্রজন্ম এদের কখনো ক্ষমার চোখে দেখবে না। তাদের আদালতে এদের দেখতে পাওয়া যাবে আসামীর কাঠ গড়ায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নারীদের পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। তাই তাদের (পুরুষদের) অতি ধৈর্য ও সতর্কতা সহকারে চলা উচিত। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনে কোনো প্রকার গাফলাতি বা ত্রুটি দেখা যায়, তবে তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীদের প্রতি নিজের কর্তব্য পালনে মোটেই অবহেলা করবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিজের বৈশিষ্ট্য প্রসংঙ্গে স্বয়ং তাঁরই কথা "আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নর-নারীর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ও পুরুষদের কিছুটা অতিরিক্ত মর্যাদা দান কোনো প্রকারের বৈষম্য সৃষ্টি বা পক্ষপাতিত্বজনক নয়; বরং তাঁর অসীম জ্ঞান ও অনুপম ক্ষমতার কারণেই তিনি সৃষ্টিকূলের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন বিধায় যা কল্যাণকর তাই করে থাকেন। সৃষ্টির সার্বিক মঙ্গল কোন পথে– তা একমাত্র স্রষ্টাই জানেন। তাই তিনি সেভাবেই সুশৃঙ্খল নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হলে সহৃদয়তার সাথে করবে এবং তাদের দেয়া কোনো কিছু ফেরত নেয়া বৈধ নয়

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : তালাক দু'বার। তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে। আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোনো ক্ষতি নেই। এগুলো

আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলত যারাই আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম। (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২২৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতটিতে জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত একটি বড় রকমের সামাজিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্যা তালাক দিতে পারতো। স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হয়ে গেলে তাকে বারবার তালাক দিতো এবং আবার ফিরিয়ে নিতো। এভাবে বেচারী স্ত্রী না স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারতো আর না স্বাধীনভাবে আর কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মজীদের এই আয়াতটি এই জুলুমের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই আয়াতের দৃষ্টিতে স্বামী একটি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বড় জোর দু'বার 'রজঈ তালাক' দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'বার তালাক দেয়ার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়েছে সে তার জীবনকালে যখন তাকে তৃতীয়বার তালাক দেবে তখন সেই স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে তালাকের যে সঠিক পদ্ধতি জানা যায় তা হচ্ছে এই– স্ত্রীকে 'তুহর' (ঋতুকালীন রক্ত প্রবাহ থেকে পবিত্র)- এর অবস্থায় তালাক দিতে হবে। যদি এমন সময় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব চলছে তাহলে তখনই তালাক দেয়া সংগত নয়; বরং ঋতুস্রাব বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর এক তালাক দেয়ার পর চাইলে দ্বিতীয় 'তুহরে' আর এক তালাক দিতে পারে। অন্যথায় প্রথম তালাকটি দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো। এ অবস্থায় ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার আগে স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবার পরও উভয়ের জন্য পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগও থাকে। কিন্তু তৃতীয় 'তুহরে' তৃতীয়বার, তালাক দেয়ার পর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার বা পুনর্বার উভয়ের এক সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কোনো অধিকার থাকে না। তবে একই সময় তিন তালাক দেয়ার ব্যাপারটি যেমন অজ্ঞ লোকেরা আজকাল সাধারণভাবে করে থাকে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা কঠিন গোনাহ। নবী ﷺ কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন। এমনকি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এতদূর প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একই সময় স্ত্রীকে তিন তালাক দিতো তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

(তবুও একই সময় তিন তালাক দিয়ে চার ইমামের মতে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু তালাকদাতা কঠিন গোনাহের অধিকারী হবে। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটি মুগাল্লাযা বা গর্হিত তালাক হিসেবে গণ্য হবে)।

মোহরানা, গহনাপত্র ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি, যেগুলো স্বামী ইতপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল। সেগুলোর কোনো একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার নেই। এমনিতে কোনো ব্যক্তিকে দান বা উপহার হিসেবে কোনো জিনিস দিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়া ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ঘৃণ্য

কাজকে হাদীসে এমন কুকুরের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু বিশেষ করে একজন স্বামীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করার সময় সে নিজে তাকে এক সময় যা কিছু দিয়েছিল সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর। বিপরীত পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা নৈতিক আচরণ ইসলাম শিখিয়েছে।

অবশ্য স্ত্রী যদি স্বামীর কোনো অপরাধ ছাড়া তার থেকে অব্যাহতি চায় শরীয়াতের পরীভাষায় একে বলা হয় 'খুলা' তালাক। অর্থাৎ স্বামীকে কিছু দিয়ে স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক আদায় করে নেয়া। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঘরোয়াভাবেই যদি কিছু স্থিরীকৃত হয়ে যায় তাহলে তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে আদালত কেবল এতটুকু অনুসন্ধান করবে যে, এই ভদ্রমহিলা তার স্বামীর প্রতি যথার্থই এত বেশি বিরূপ হয়ে পড়েছে কিনা যার ফলে তাদের দু'জনের এক সাথে ঘর সংসার করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হবার পর আদালত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনো বিনিময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এই বিনিময় গ্রহণ করে স্বামীর অবশ্যই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। স্বামী ইতোপূর্বে যে পরিমাণ সম্পদ তার ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিময় হিসেবে তাকে ফেরত দেয়া সাধারণত ফকীহগণ পছন্দ করেননি।

'খুলা' তালাক 'রজঈ' নয়; বরং এটি 'বায়েন' তালাক। যেহেতু স্ত্রীলোকটি মূল্য দিয়ে এক অর্থে তালাকটি যেন কিনে নিয়েছে, তাই এই তালাকের পর আবার রুজু করার তথা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। তবে আবার যদি তারা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে এমনটি করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

অধিকাংশ ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদের মতে 'খুলা' তালাকের ইদ্দতও সাধারণ তালাকের সমান। কিন্তু আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে এমন বহুতর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ এক ঋতুকালকে এর ইদ্দত গণ্য করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অনুযায়ী একটি মামলার ফায়সালাও দিয়েছিলেন।

(ইবনে কাসীর,১ম খ-, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

যখন তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে না

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

অর্থ : অতঃপর যদি (দু'বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোনো ক্ষতি নেই। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। (এগুলো ভংগ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হিদায়াতের জন্য এগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। (সূরা : বাকারা : আয়াত-২৩১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই শেষাংশ বা ধারাবাহিকতার শেষ সীমা। কেউ তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর যদি পুনরায় তৃতীয় তালাক দিয়ে বসে তবে বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় তালাকের পরে ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাহার করার অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ নবায়ন করার যে সুযোগ ছিল, এখন (তৃতীয় তালাকের পর) আর ঐ সুযোগ থাকলো না। কেননা এমতাবস্থায় ধরা যায় যে, স্বামী সবকিছু বুঝে শুনেই স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এখন তার শাস্তি হলো তারা উভয়ে একমত হলেও বিবাহের নবায়নও করতে পারবে না। তাদের পুনর্বিবাহের শর্ত হলো স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের পর যদি সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয় অথবা সে মারা যায়, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

কুরআন ও হাদীসের বাণী এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে দেখা যায়, যখন কোনো দম্পতির তালাক ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প থাকে না, তখনই কেবল তালাক দেয়ার পথে এগুবে। আর তখন উত্তম পন্থাই অবলম্বন করবে। তা হচ্ছে এমন তহুরে তালাক দিবে যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। এটাই তালাকের উত্তম পন্থা। আর তারা ভাল মনে করলে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। ইদ্দত শেষে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা ইচ্ছা করলে তা নবায়ন করতে পারে।

কেউ যদি উত্তম পন্থার ভ্রূক্ষেপ না করে ইদ্দতের মধ্যে আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল। এবারও সে পূর্বের মত ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার অথবা ইদ্দত শেষে বিবাহ নবায়ন করতে পারে। অবশ্য দ্বিতীয়

পর্যায়ে সম্পর্ক রক্ষার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়ে গেলো। এখন সে এমন এক সীমারেখায় পর্দাপণ করলো যে, আর এক তালাক দিলে তাদের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বামী তার অধিকারের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিলো।

তালাকের নিকৃষ্ট পন্থা

ইসলামে তালাক মূলত একটি অপছন্দনীয় কাজ। জায়েয কাজসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে নিকৃষ্টতম। এতদসত্ত্বেও এছাড়া কোনো উপায় না থাকলে তখন উপরিউক্ত উত্তম পন্থায়ই এ কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে তবে তাতেও তালাক কার্যকর হবে সত্য, তবে তা হচ্ছে সমস্ত উম্মতের তালাকই হয়ে যাবে এবং তালাক প্রত্যাহার তো দূরের কথা বিবাহ নবায়ন করার সুযো টুকুও আর থাকবে না।

আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর "উমদাতুল আসার" গ্রন্থে এ মাসআলা বিষদভাবে উল্লেখ করেছেন।

মাহমুদ ইবনে লবীদের ঘটনা নাসাঈর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন তালাক এক সাথে দেয়াতে হুজুর খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোনো কোনো সাহাবী তাকে হত্যাযোগ্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হুজুর একে প্রত্যাহার যোগ্য তালাক ঘোষণা করার কোনো বর্ণনা কোথায়ও পাওয়া যায়নি। (মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-মাআরেফুল কুরআন) [অধিক জানার জন্যে ফিকহের কিতাবসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখা যেতে পারে।]

পুনর্বিবাহের একটি ঘৃণ্যতম ও অভিশপ্ত পন্থা

স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তাকে পুনঃগ্রহণ করার একটি কঠিন পথ হলো দ্বিতীয় স্বামী ঐ মহিলাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়ার পর ইদ্দত সমাপান্তে প্রথম স্বামী তাকে পুনঃবিবাহ করা। শরীয়তের পরিভাষায় যা আল্লালা বা হীলা নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কোনো ষড়যন্ত্র কিংবা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ সম্পূর্ণ হারাম।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এই ধরনের বিয়ে মোটেই বিয়ে বলে গণ্য হবে না; বরং এটা হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এই ধরনের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোনো ক্রমেই কোনো মহিলা তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। আঙ্গ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক যোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করা হয় তাদের উভয়ের ওপর লানত বর্ষণ করেছেন।

স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা বৈধ নয়

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ : আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হয় সোজাসুজি তাদেরকে রেখে দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের ওপর জুলুম করবে। আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাসায় পরিণত করো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ তোমাদের কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করছেন, যে কিতাব ও হিকমাত তিনি তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন তাকে মর্যাদা দান করো। আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ সব কথা জানেন।

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৩১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগে আবার তাকে ফিরিয়ে নেয় শুধুমাত্র কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে এটি কোনোক্রমেই সঠিক কাজ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ফিরিয়ে নিতে চাইলে এই উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নাও যে, এবার থেকে তার সাথে সদাচরণ করবে। অন্যথ্যায় ভদ্রভাবে তাকে বিদায় দাও।

এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের কিতাব ও হিকমত তথা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতের (উম্মাতের ওয়াসাত) মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদেরকে সত্যতা, সৎবৃত্তি, সৎকর্মশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। বাহানাবাজী করে আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাসায় পরিণত করা তোমাদের সাজে না। আইনের শব্দের আড়ালে আইনের মূল প্রাণসত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করো না। বিশ্বাসীকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার পরিবর্তে তোমরা নিজের গৃহে জালেম ও পথভ্রষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ো না।

সাবেক স্বামী বা অভিভাবক মহিলার নির্বাচিত নতুন স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারবে না

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৩২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : কোনো স্ত্রীলোককে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়ার পর ইদ্দতকালের মধ্যে যদি তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদ্দতাকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা দু'জন পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজনদের তাদের এই পদক্ষেপে বাধা দেয়া উচিত নয়। এছাড়া এ আয়াতটির এ অর্থও হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকাল অতিক্রম করার পর তার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে নিজের পছন্দমতো অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়। এ ক্ষেত্র তার পূর্ববর্তী স্বামী কোনো হীন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে যেন তার এ বিয়েতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যে মহিলাকে সে ত্যাগ করেছে তাকে যাতে আর কেউ গ্রহণ করতে এগিয়ে না আসে এজন্য যেন সে প্রচেষ্ট চালাতে না থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো মহিলার পছন্দমত ব্যক্তির সাথে বিয়ের বাধা সৃষ্টি করা যাবে না তখন; যদি তাদের সম্মতিটা হয় শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে। অন্যথায় শুধু বাধাদান নয়; বরং শক্তি প্রয়োগও উচিত হবে। যেমন, বিয়ে ছাড়াই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে শুরু করলে, তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে ছাড়াই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের বিশেষত তাদের সাথে সম্পর্কিত লোকদের সম্মিলিতভাবে বাধা দেয়া কর্তব্য। কোনো মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কুফু হীনতার স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কমে বিয়ে করতে চায় যাতে এর কুপ্রভাব বংশের উপর পড়তে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রেও তারা বাধা প্রদান করতে পারে।

এটা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্য গ্রহণীয় উপদেশ বলার অর্থ, ঈমানদারদের এর ব্যতিক্রম করা বা এতে শিথিলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

এ উপদেশ সম্বলিত নির্দেশের ব্যতিক্রম করা পাপ মগ্নতা ও ফিতনা ফাসাদের কারণ হতে পারে। কারণ প্রাপ্তবয়স্কা বুদ্ধিমতি যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করা; অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলে রাখার নামান্তর।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, পবিত্রতা ও কল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত আছেন। মানুষ তার ভবিষ্যত কল্যাণ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সুতরাং মানুষ আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে তার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সন্তানকে দুধ খাওয়াবে মা, আর তার জীবন ধারণের যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ : যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশি বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। কোনো মা'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে সন্তানটি তার। আবার কোনো বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও। কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার সন্তানদের অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে।

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৩৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতের প্রথমাংশে শিশুদের দুধ পান করানোর মেয়াদ সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ দু'বছর। ইমাম মালিক (র) থেকে দু'টো বর্ণনা পাওয়া যায়। একটিতে দু'বছর দু'মাস, আরেকটি হলো দু'বছর তিন মাস। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এর মেয়াদ হলো দু'বছর ছয় মাস। এ ব্যাপারে ফিকহের কিতাব দেখে বিস্তারিত জ্ঞান হাসিল করা যেতে পারে।

এ নির্দেশটি এমন এক অবস্থার জন্য যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে তালাক বা 'খুলা' তালাকের মাধ্যমে অথবা আদালত কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্ত্রীর কোলে রয়েছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত আয়াতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর সন্তানের দুধ পান করানো সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। মাআরেফুল কুরআনে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব মাতার উপর আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ হুকুম প্রযোজ্য যখন স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্কে ঠিক থাকবে অথবা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকবে। কিন্তু তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে ভরণ পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য। তবে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। কারণ শিশুর মালিক পিতা।

এ ক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর মর্যাদার বিবেচনা

স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি ধনী হয় তবে ভরণ-পোষণও হবে ধনীদের স্টান্ডারে। আর দু'জনই গরীব হলে ভরণ-পোষণও হবে গরীবদেরই মানে। আর যদি দু'জনের অবস্থা এক রকম না হয় তবে ভরণ-পোষণের মান নির্ধারণের ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, যদি পুরুষ ধনী হয় আর স্ত্রী গরীব হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে যা দরিদ্রদের চেয়েবেশি ও ধনীদের চেয়ে কম মানের হয়। ইমাম কারখীর মতে স্বামীর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে মান নির্ণিত হবে।

সহবাসের পূর্বে স্বামী মারা গেলেও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে। তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত। (সূরা আলা-বাকারা : আয়াত-২৩৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনের যে সময় কাল এখানে বর্ণিত হয়েছে এটি এমন বিধবাদেরও পালন করতে হবে যাদের সাথে স্বামীদের বিয়ের পর একান্তে বসবাস হয়নি। তবে গর্ভবতী বিধবাদের এই ইদ্দত পালন করতে হবে না। গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হবার সাথে সাথেই তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর পরই অথবা তার কয়েক মাস পরে সন্তান প্রসব হোক না কেন সমান কথা।

"নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে"- এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, এই সময় বিয়ে করতে পারবে না; বরং এই সঙ্গে নিজেকে কোনো প্রকার সাজ-সজ্জা ও অলংকারেও ভূষিত করতে পারবে না। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বামী মৃত্যুকালীন ইদ্দত পালনের সময় নারীরা রঙিন কাপড় ও অলংকার পরতে পারবে না, মেহেদী, সুর্মা, খুশ্‌বু ও খেজাব লাগাতে পারবে না, এমনকি কেশ বিন্যাস করতেও পারবে না। তবে এই সময় নারীরা ঘর থেক বাইরে যেতে পারবে কী না এ ব্যাপার মতবিরোধ আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মাদ ইবনে শীরীন এবং চার ইমামের মতে স্বামী যে ঘরে মারা গেছে ইদ্দত পালনকালে বিধবা স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকতে হবে। দিনের বেলা কোনো প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যেই তার অবস্থান হতে হবে। বিপরীত পক্ষে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আতা, তাউস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আযীয এবং সকল আহ্‌লুয যাহেরের মতে বিধবা স্ত্রী তার উদ্দতকাল যেখানে ইচ্ছা পালন করতে পারে এবং এ সময় সে সফরও করতে পারে।

বিধবাদেরকে ইশারা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া বৈধ কিন্তু গোপনে বিবাহ চুক্তি বৈধ নয়

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

অর্থ : ইদ্দতকালে তোমরা এই বিধবাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশারা ইংগিতে প্রকাশ করলে অথবা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রাখলে কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ জানেন, তাদের চিন্তা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু দেখো, তাদের সাথে কোনো গোপন চুক্তি করো না। যদি কোনো কথা বলতে হয়, প্রচলিত ও পরিচিত পদ্ধতিতে বলো। তবে বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ করবে না যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থাও জানেন। কাজেই তাঁকে ভয়

করো এবং একথাও জেনে রাখো, আল্লাহ ধৈর্যশীল এবং ছোট খাটো ত্রুটিগুলো এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত ২৩৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে ইদ্দত পালনরত বিধবাদের ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব জায়েয হলেও বিবাহ কার্যের গোপন চুক্তি জায়েয নয় এবং ইদ্দতের মধ্যে যথারীতি প্রকাশ্যে প্রস্তাব দিয়েও বিবাহ জায়েয নয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ইসলামী শরীয়তের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী বিবাহ কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে। সকল ইমামের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে বিবাহ শুদ্ধ নয়।

মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে অস্পষ্ট ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া জায়েয আছে। তেমনিভাবে তালাক প্রাপ্তাকেও এভাবে বিবাহ প্রস্তাব দেয়া বৈধ।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ইবনে কাসীরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে যখন তার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় তালাক দিয়েছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি ইবনে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন কর। তিনি আরো বললেন, ইদ্দত পালন শেষ হলে আমাকে জানাবে। অতঃপর ইদ্দত পালন শেষ হলে উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং উসামার সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। (ইবনে কাসীর)

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত বিধানাবলি হলো বিধবা অথবা বায়েন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে। সুতরাং তালাক রাজঈর ইদ্দত চলাকালে স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্যে পয়গাম দেয়া জায়েয নয়।

মোহরানা ধার্য ব্যতীত বিবাহ হলে এবং স্ত্রীকে স্পর্শ না করলেও তাকে তালাক দিলে কিছু সম্পদ দিতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ : নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হবে। সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের ওপর এটি একটি অধিকার।

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৩৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে বিয়ের আকদ হয়েছে ঠিক কিন্তু আক্‌দ হওয়ার সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাস হওয়ার পূর্বে তালাক হয়ে যায় তবে ঐ স্ত্রীকে মোহর দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু তবুও সামর্থানুযায়ী ঐ স্ত্রীকে অবশ্যই কিছু সম্পদ দিতে হবে। নেককার লোকদের উপর সামর্থ অনুসারে কিছু সম্পদ তাকে দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কতটুকু সম্পদ দিতে হবে কুরআন মজীদ তা নির্ধারণ করে দেয়নি; বরং তা লোকদের শিষ্টাচার ও ঈমানী মর্যাদার উপর ছেড়ে দিয়ে এতটুকু সীমা বলে দিয়েছে যে, ধনী ব্যক্তি তার আর্থিক সংগতি অনুযায়ী আর দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী কিছু দিয়ে দেবে।

ইসলামী শরীয়ত নারীদের ইজ্জত সম্ভ্রমের যে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যা ইসলামী সমাজ ছাড় আর কোথায়ও নেই তারই একটা নূন্যতম নিদর্শন হচ্ছে উপরিউক্ত বিধান। নারীর সাথে কেবল বিয়ের শরীয়তসম্মত চুক্তি বা আকদ হওয়ার কারণেই তাকে কিছু সম্পদ দিতে হবে। তার সাথে বিয়ে উত্তর দৈহিক সম্পর্ক না হলেও এবং বিয়ের সময় মোহর ধার্য না হয়ে থাকলেও ইসলামী শরীয়তের এ নির্দেশ। কারণ, সম্পর্ক স্থাপনের পর তা ছিন্ন করলে স্ত্রীগণ কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই হয়ে থাকে। তাই সামর্থানুসারে সে ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহর এ নির্দেশ।

আর যদি আকদ হওয়ার সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক সংঘটিত হয়। তবে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য স্ত্রী যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা স্বামী যদি মোহর দিয়ে দেয়, তবে তা তাদের বদান্যতা। অবশ্যই ক্ষমা করার বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। স্ত্রীর ক্ষমা করে দেয়াটা কোনো চাপে পড়ে অথবা আবেগে আতিসহ্যে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ক্ষমা করলে তবেই তা ক্ষমা হিসেবে গণ্য হতে পারে, অন্যথায় নয়।

আমাদের সমাজে 'মোহর' মাফ করে দেয়ার বিষয়টি স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। উপরিউক্ত অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকেও ক্ষমা হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়াকেও মাফ করে দেয়া বলা হয়েছে হয়তো এজন্যে যে, আরব দেশে সাধারণ প্রথানুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহর দিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে প্রদত্ত মোহরের অর্ধেক স্বামীর প্রাপ হয়ে যেত। কাজেই সে যদি এই অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে। ক্ষমা বা মাফ করা উত্তম তাকওয়ার অনুকুল। কেননা তালাক যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ক্ষমা তারই নিদর্শন যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে উত্তম ও সওয়াবের কাজ। সুতরাং ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে আর তা হতে পারে স্বামীর পক্ষ থেকেও। (মাআরেফুল কুআন)

সাক্ষী হিসেবে নারী

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى.

অর্থ : তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার স্বাক্ষী রাখো। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৮২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতাংশে লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলামে লেনদেনে দলীল সম্পাদনার সাথে সাথে সাক্ষী রাখার জন্যে বিধান দেয়া হয়েছে। যেন কখনো কোনো পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফায়সালা করা যেতে পারে। কিন্তু কিফহ শাস্ত্রবিদগণের মতে কেবল লেখা শরীয়ত সম্মত প্রমাণ নয়, সাথে সাথে সাক্ষীও থাকতে হবে। সাক্ষী ছাড়া কেবল লেখার উপর ভিত্তি করে বিচার ফায়সালা করা শরীয়ত সম্মত নয়।

শরীয়ত সাক্ষীর সংখ্যাও নির্ধারণ করে দিয়েছে, সমাজে গ্রহণযোগ্য দু'জন মুসলমান পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে অন্তত: একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী বানাতে হবে। যাতে করে একজন নারী বিষয়টি ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণের কতিপয় জরুরি নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. সাক্ষীর সংখ্যা হবে দু'জন পুরুষ।
২. সাক্ষীদ্বয়কে মুসলিম হতে হবে।
৩. দু'জন পুরুষ না পেলে অন্তত: একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী হবে।
৪. সাক্ষী করতে হবে এমন সব লোককে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র বিশ্বস্ততার কারণে লোক সমাজে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত।
৫. একা একজন পুরুষ অথবা কেবল দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট নয়।

২. সূরা আলে ইমরান (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ)

আয়াত : ২০০ রুকূ : ২০ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

এ সূরার ৩৩ নং আয়াতের 'আল ইমরান' কথাটিকে ভিত্তি করে এ পরিচয়মূলক নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি চার দফায় নাযিল হয়েছে। যেমন-

১. প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু' আয়াত অর্থাৎ ১ থেকে ৩২ নং আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

২. ৩৩ থেকে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত নবম হিজরীতে ঐ সময় নাযিল হয়, যখন নাজরান থেকে একদল খ্রিস্টান প্রতিনিধি রাসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করতে আসে।

৩. ৮ম রুকুর শুরু থেকে ১২তম রুকুর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৪ থেকে ১২০ নং আয়াত পর্যন্ত এক বা একাধিক ভাষণ হিসেবে নাযিল হয়। এ আয়াতগুলো বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝখানে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ এবং তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধ হয়।

৪. চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। উহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলি

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলী কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সর্তক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রাসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত নিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী

কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহ্‌লি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কী আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি; বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে-

১. এই সত্য দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিগুলোকে অকস্মাত নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক'শো ঘরের বেশি ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

২. হিজরতের পর নবী ﷺ মদীনার আশপাশের ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামান্যতমও সম্মান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এই আহ্‌লি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও

নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবদের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নাযির সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদিনাবাসীদের সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোনো পরোয়াই তারা করেনি। শেষ যখন তাদের দুষ্কর্ম ও চুক্তি ভঙ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশি দুষ্কর্মপরায়ণ 'বনী কাইনুকা' গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদিনার মুনাফিক মুসলমান ও হিযাজের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশঙ্কা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী ﷺ যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হতেন।

৩. বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোশিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই উহুদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী ﷺ-এর সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিন শত মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর ﷺ সাথে যে সাত শত লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালালো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এত বিপুল সংখ্যক আস্তীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

৪. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল, তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না।

একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থন যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যাবতীয় ঘটনাবলির ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামে দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগিতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন, এ যুদ্ধের ওপর কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত ভিন্ন!

আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতি গঠিত হয়

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

(সূরা-আল ইমরান : আয়াত : ৫-৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

এক, তোমাদের প্রকৃতিকে তাঁর মতো করে কেউ জানতে পারে না, এমনকি তোমরা নিজেরাও জানতে পারো না। কাজেই তার পথপ্রদর্শন ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া তোমাদের গত্যন্তর নেই।

দুই, যিনি গর্ভাশয়ে তোমাদের উৎপত্তি থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ছোট ছোট প্রয়োজনগুলোও পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি দুনিয়ার জীবনে তোমাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অথচ তোমরা সবচেয়ে বেশি এ জিনিসটিরই মুখাপেক্ষী।

কোনো মানব সন্তান মাতা-পিতার ইচ্ছায় যেমন জন্মগ্রহণ করে না, তেমনি আকার-আকৃতিতেও মাতা-পিতার কোনো হাত নেই। নারী জাতির উদর থেকে আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় ও স্ব-ইচ্ছায় মানব জাতির রূপরেখা, স্বভাব-চরিত্র, স্থায়িত্ব, আয়ু ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকেন। অতএব যার হাতে এসব কিছুই নিবন্ধ একমাত্র তিনিই মানব জাতির ইলাহ মাবুদ হওয়ার যোগ্য। অন্য আয়াতে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন। তিনি কাউকে ছেলে দান করেন কাউকে দিয়ে থাকেন মেয়ে, আর কাউকে রাখেন

আকীম অর্থাৎ বন্ধা– নিঃসন্তান। আবার তিনি কাউকে দু'ধরনের সন্তান- ছেলে ও মেয়ে উভয়টিই দিয়ে থাকেন।

যদিও মাতা-পিতার যৌন মিলনের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এমন অনেক দম্পতি আছেন যারা শেষ বয়সে উপনীত হয়েও কোনো সন্তান লাভে সক্ষম হন না। অনেকে অনেক চেষ্টা-তদবীর করেও সন্তান লাভ করতে পারেন না। অথচ অনেক দম্পতি এমন আছে তারা আর সন্তান কামনা করে না– জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর অজান্তে গর্ভে সন্তান এসে গেছে। মোটকথা সন্তান হওয়া না হওয়ার মূল চাবিকাঠি রাব্বুল আলামীনের হাতে।

দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীর অবস্থান শীর্ষে

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

অর্থ : মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদী পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. নারী ২. সন্তানাদি ৩. সোনা-রূপার ভা-ার
৪. উৎকৃষ্ট ঘোড়া (বাহন) ৫. গৃহপালিত জন্তু ৬. শষ্য ক্ষেত।

এসব উল্লেখযোগ্য প্রধান নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারী হচ্ছে শীর্ষস্থানীয়। হাদীসের ভাষায় خَيْرُ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ অর্থাৎ "মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে সতী নারী।"

নারীর সতীত্বের ব্যাখ্যায় হাদীসে বলা হয়েছে–"স্বামী যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন সে তাকে সুখী করে, তাকে কোনো আদশে করলে সে আনুগত্য স্বীকার করে, তাকে ঘরে রেখে গেলে সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে ও স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করে।" অন্য এক হাদীসে আছে মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার কাছে নারী ও সুগন্ধি খুবই প্রিয় বস্তু। তবে নামাযে আমার হৃদয় মনে প্রশান্তি আসে।"

মানুষকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া উক্ত ছয়টি নেয়ামতের মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান হলো নারী। বাকিগুলো মূলতঃ নারীকে কেন্দ্র করেই এবং নারীর কারণেই। আল্লাহ

তায়ালা মানুষের মনে এসব নেয়ামতের প্রতি স্বভাবগতভাবেই আশক্তি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানব স্বভাবের মধ্যে এসবের আশক্তি সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তায়ালার অনেক রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

১. এসবের প্রতি আশক্তি ও আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেত। মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পাঠানোর কোনো মূল্য হতো না আর পৃথিবী বে-আবাদ হয়ে পড়তো।

২. মানুষের মনে জাগতিক নেয়ামতের প্রতি আশক্তি ও ভালবাসা না থাকলে তারা পরকালীন প্রশান্তি কামনার্থে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হতো না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা অর্জন করতে পারতো না।

৩. এসব আকর্ষণীয় নেয়ামতের প্রতি মানুষের অন্তরে ভালবাসা ও আশক্তি সৃষ্টি করে মূলত তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ দেখতে চান কারা এসবের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা স্মরণ রেখে এগুলোকে আল্লাহ দেয়া সীমারেখার মধ্যে রেখে ব্যবহার করে ও নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে নশ্বর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করে। পক্ষান্তরে কারা দুনিয়ার এসব চাকচিক্য ও খেল-তামাশার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিয়ন্ত্রণবিহীন জীবনাযাপন করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

অর্থ : "আমি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্যে সৃষ্টি করেছি। যাতে তাদের মধ্যে কে সৎকাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।" (সূরা আল কাহাফ : আয়াত-৭)

পৃথিবীতে যেসব বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের চোখে সুশোভিত করে দিয়েছেন শরীয়তসম্মত পন্থায় সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত উপার্জন ও যথাবিধি ব্যবহার করলে উভয় জাহানেই সাফল্য নিশ্চিত। পক্ষান্তরে ওসব বস্তু অবৈধ পন্থায় উপার্জন ও ব্যবহার করলে সামগ্রিক ধ্বংস অনিবার্য।

উদাহরণস্বরূপ প্রধান আশক্তির বস্তু হিসেবে নারীকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নারীর প্রতি আশক্তি পুরুষের স্বভাবজাত কামনা বাসনা আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার মূলে রয়েছে পৃথিবীর সামগ্রিক শৃংখলা ও সৌন্দর্য রক্ষা ও বিশ্বের উৎকর্ষ সাধনের নিয়ামক স্বরূপ ভূমিকা রাখা। এখন কেউ যদি এ কামনা বাসনাকে বিধি বহির্ভূত পন্থায় ও শরীয়ত বিরোধী উপায়ে ব্যবহার করে সামাজিক কাঠামো ভেঙে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে মত্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের আল্লাহয় স্বয়ং তা থেকে প্রতিহত করবেন না। আল্লাহ তো তাদের একদিকে হক-বাতিল, ভাল-মন্দ, নেক-বদ ইত্যাদির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অন্যদিকে মানুষকে দিয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা। কর্মের স্বাধীনতা নির্বাচন স্বাধীনতা। আল্লাহ পরীক্ষা করছেন মানুষ এসব স্বাধীনতা কীভাবে ভোগ করে।

নর-নারীর পারস্পরিক যৌন সম্পর্কে যখন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালিত হয় তখন তা পশুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে শরীয়তসম্মত পন্থায় যদি তা সুনিয়ন্ত্রিত থাকে

তবেই তাতে যেমন সেরা সৃষ্টি মানুষের সম্ভ্রম বজায় থাকে তেমনি তাতে সামাজিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় থেকে বিশ্ব সভ্যতায় সূচীত হয় সত্যিকারের প্রগতি ও সমৃদ্ধি। আজকের পাশ্চাত্য জগতও তাদের সম্পর্কে প্রকাশিত সমকালীন পত্র-পত্রিকা যে অবাধ যৌন আচরণে অশুভ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে তা আজকের পৃথিবীর অজানা নয়।

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় উপরিউক্ত যেকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর উল্লেখ করার পর এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা হলো :

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

অর্থ : "এসব নেয়ামত সামগ্রী হচ্ছে পার্থিব জীবনের ব্যবহার করার জন্যে। (এগুলোকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করার জন্যে নয়)। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা।" অন্য কথায় দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ ঠিক তেমনি অস্থায়ী যেমন অস্থায়ী দুনিয়ার জীবন। পক্ষান্তরে পরকালীন জীবন যেমন স্থায়ী তেমনি স্থায়ী সে জীবনের নেয়ামতসমূহ। এজন্যেই আল্লাহর ঘোষণা হলো একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম ঠিকানা যার নিয়ামতসমূহ না ধ্বংস হবে না হ্রাস পাবে। বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি, যে অস্থায়ী সুখ-শান্তি ও চাকচিক্যে মত্ত না হয়ে স্থায়ী শান্তি ও সার্বিক সাফল্য প্রাপ্তির চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ.

অর্থ : বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওগুলোর চাইতে ভালো জিনিস কী? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তার বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'যওজ'। এ অর্থ হচ্ছে 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ'। তবে আখেরাতে 'আযওয়াজ' অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলি সহকারে। যদি দুনিয়ায় কোনো স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয়, তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোনো সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোনো স্ত্রী হয়

সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ, তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো সৎপুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোনো স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

আল্লাহ অপাত্রে দান করেন না। উপরি উপরি বা ভাসাভাসাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার নীতি নয়। তিনি তার বান্দাহদের কার্যাবলি, সংকল্প ও ইচ্ছা পুরোপুরি ও ভালোভাবেই জানেন। কে পুরস্কার লাভের যোগ্য, আর কে যোগ্য নয়, তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।

মাতৃগর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মান্নত করার ইতিহাস প্রসঙ্গে

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ : (তিনি তখন শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা বলছিল, "হে আমার রব ! আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমার জন্য নজরনা দিলাম, সে তোমার জন্য উৎসর্গ হবে। আমার এই নজরানা কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো।" (সূরা : আল ইমরান : আয়াত-৩৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী নবীদের যুগে তাঁদের শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত ছিল। কোনো একটি সন্তানকে আল্লাহর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাকে কোনো পার্থিব কাজে ব্যবহার করা হতো না। এ প্রথানুসারে মরিয়মের মাতা নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মান্নত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোনো জাগতিক কাজে নিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু প্রসবান্তে যখন দেখলেন যে এটা তো কন্যা সন্তান। কন্যাকে কি আল্লাহর ঘরের খেদমতে নিয়োজিত করা যাবে? এই ভেবে তিনি আক্ষেপ করে বললেন : رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى "হে রব! আমি তো প্রসব করলাম একটা কন্যা সন্তান।"

একজন ঈমানদারের নিজের জান-মাল ও সন্তান সন্ততিকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার বাসনা থাকা তার ঈমানের দাবী। যুগে যুগে মানব ইতিহাস থেকেও তাই প্রমাণিত। তাছাড়া সন্তানাদিকে সৎপথে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলায় মাতা-পিতার ভূমিকাই কার্যকরী হয়ে থাকে অধিক। তবে মাতার যোগ্যতা ও মানসিকতা এ ক্ষেত্রে অধিকতর দায়ী ও ফলপ্রসু। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনে যেমন মাতার দায়িত্ব ও ভূমিকা বেশি তেমনি তাদের উপর অধিক প্রভাব মাতার। কারণ তারা পিতার তুলনায় মাতার সাহচর্য পায় অনেক বেশি। মরিয়ম এ ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মাতারও সন্তানাদির জীবন গঠনের পরিকল্পনা করতেন। সুতরাং আধুনিক নারী সমাজ প্রাচীন নারী সমাজের চেয়ে অগ্রসরতার দাবী করবে কিসের ভিত্তিতে?

ইমরানের স্ত্রী মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তান (অর্থাৎ মরিয়ম)-কে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, "তুমি মেহেরবানী করে এ মান্নত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শুন ও জান।"

কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজে দেখা যায়, জনক-জননীরা সন্তান পাওয়ার জন্যে যেমন শিরকের পথ ধরে, তেমনি সন্তান লালন-পালনেও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সন্তান কামনা করে কোনো মাযার বা কোনো অলীর কাছে। আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাম রাখা থেকে তার শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিতেও প্রকাশ্য শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হাদীসের ভাষায় সন্তানাদি স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর জন্ম নেয়, কিন্তু মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মাজূসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে ছাড়ে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়, মরিয়মের মাতা পুরো তাওহীদী আকীদায় সন্তান কামনা করেছিলেন। এভাবে মান্নত মানার ব্যাপারেও মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাসে তাওহীদের শিক্ষা পাওয়া যায়।

যে কন্যা পুত্রের চেয়ে উত্তম বলে ঘোষিত হয়েছিল

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : তারপর যখন সেই শিশু কন্যাটি তার ওখানে জন্ম নিল, সে বললো, "হে আমার প্রভু! আমার এখানে তো মেয়ে জন্ম নিয়েছে। অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা আল্লাহর জানাই ছিল। আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো হয় না। যা হোক আমি তার নাম রেখে দিলাম মারয়াম। আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।"

(সূরা আল ইমরান : আয়াত-৩৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মারইয়াম (عليها السلام)-এর জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর মাতা ইমরানের স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। একদা তিনি একজন পথিককে দেখলেন, সে তার বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি জাগ্রত হয়। তিনি কায়মনো বাক্যে আল্লাহর কাছে সন্তান প্রাপ্তির আবেদন জানালেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি গর্ভধারণ করেন।

তখনকার শরীয়তে প্রচলিত ইবাদাত পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। কোনো সন্তানকে আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাকে কোনো পার্থিব কাজে লাগানো হতো না। এ পদ্ধতি মোতাবেক মারইয়ামের মাতা নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে বিশেষভাবে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করার

মান্নত করলেন। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা তাঁর জানা ছিল না। সন্তান প্রসব করার পর যখন দেখলেন যে; তিনি তো একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। তখন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, আয় আল্লাহ! আমি তো আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার ঘরের খেদমতের জন্যে মান্নত করেছিলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এ যে একটা কন্যা সন্তান!

মেয়েরা এমন অনেক প্রাকৃতিক দুর্বলতা ও তামাদ্দুনিক বিধি-নিষেধের আওতাধীন থাকে, যেগুলো থেকে ছেলেরা থাকে মুক্ত। কাজেই ছেলে জন্ম নিলে আমি যে উদ্দেশ্যে নিজের সন্তান তোমার পথে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, তা ভালোভাবে পূর্ণ হতো।

মারইয়ামের মাতা কন্যাকে আল্লাহর ঘরের খেদমত করার অযোগ্য মনে করে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তার মান্নত মতে নিজের কন্যাকে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের কাজ করানো কি সম্ভব? ছেলে হলেই সে তার মান্নত পূরণ করা যেতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বিপরীত। সেই কন্যাকে দিয়েই আল্লাহর তার মাতার মান্নত পূরণ করার মত যোগ্যতা ও গুণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা মাতার আন্তরিকতার প্রতি তাকিয়ে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন।

"আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।" কথাটি-মারইয়ামের মাতার। এ প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানের নাম রাখার অধিকার মাতারও রয়েছে। সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মাতার ভূমিকা যথার্থ ও কাম্য। এ বিষয়ে তার অধিকার স্বীকৃত।

ইমরানের স্ত্রী নিজের কন্যা মারইয়ামকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসীর, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে, যখনই কোনো সন্তান জম্মগ্রহণ করে, তখনই শয়তান তাকে স্পর্শ করে এবং শয়তানের স্পর্শের কারণে সন্তান চিৎকার করে। তবে মারইয়াম এবং তার সন্তান এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা।

বৃদ্ধ স্বামী ও বন্ধা নারীর সন্তান লাভ

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.

অর্থ : যাকারিয়া বললো, "হে আমার রব ! আমার সন্তান হবে কেমন করে? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধা ।" জবাব এলো, এমনটিই হবে । আল্লাহ্ যা চান তাই করেন । (সূরা : আল ইমরান : আয়াত-৪০)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : একদিন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন । ফেরেশতারা তখন তাঁকে ডেকে বললো, আল্লাহ্ আপনাকে একটা পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন । সে সন্তান অনেকগুলো গুণেরও অধিকারী হবেন । আল্লাহর পাঠানো এ সুসংবাদের জবাবে উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো বলেছিলেন । যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সন্দেহের কারণে এসব প্রশ্ন করেননি; বরং তাঁর তো আল্লাহর শক্তি-সামর্থের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস এবং আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় ঈমান ছিলই । তবুও তিনি জানতে চাইলেন যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীর বার্ধক্য ও বন্ধাত্ব বহাল রেখেই সন্তান দেয়া হবে, না এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হবে? আল্লাহ বললেন, অবস্থা যা আছে তাই থাকবে । এ অবস্থায়ও আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান হবে ।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কুদরতের ঐতিহাসিক সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে । যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন বৃদ্ধ আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধা । সন্তান লাভের জাগতিক অবস্থা তখন তাদের ছিল না । সেই অসম্ভব অবস্থায়ও যাকারিয়া মারইয়ামের কাছে অসম্ভব পরিবেশে অলৌকিকভাবে অসময়ের ফল দেখে আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় ঈমান থাকায় তিনি সন্তান প্রার্থনা করলেন । আজকের সমাজে একদিকে নিঃসন্তানের সন্তান পাওয়া জন্যে ধর্ণা দেয় পীর, বুজর্গদের মাজারে, পথ ধরে শিরকের, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাওহীদ পরিপন্থী বিশ্বাস ও কর্মের দিকে তারা এগিয়ে যায় । অন্যদিকে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সন্তান উৎপাদনক্ষম যুগলেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ ধরে । সন্তান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর যে পূর্ণ কুদরত বিরাজিত তা যেমন মরিয়ম আলাইহিস সালাম-এর বিশ্বাস তেমনি যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এ বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখতেন, কিন্তু আমাদের সমাজের লোকেরা এ ধরনের কাজে শিরকের পথে ধাবিত হয় অহরহ । অথচ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর বাহ্যিক অবস্থান সন্তান প্রাপ্তির বয়স না থাকলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি একমাত্র তারই নিকট সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন । যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মারইয়ামকে শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফলমূল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমুল দিয়ে জীবিকা দান সার্বিক অবস্থা ছিল সন্তান লাভের সম্পূর্ণ বিপরীত । তিনি নিজে বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার সম্মুখীন ছিলেন, চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর স্ত্রীও ছিল বন্ধা । এতদসত্ত্বেও সন্তান লাভের আকৃতি তাঁর অন্তরের গভীরে দানা বেঁধে উঠলে তিনি নিবৃত্তে আকুল কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকেন ।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

"হে রব! আপনি দয়া করে আপনার পক্ষে থেকে আমাকে একটা নেক সন্তান দিন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।" উত্তরে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা মারফত সুসংবাদ পাঠালেন। : اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى "আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া নামও আল্লাহই নির্ধারিত করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ব যুগে সর্বাবস্থায়ই তাঁর কুদরতের রহস্য দেখাতে পারেন। প্রয়োজন কেবল প্রগাঢ় ঈমানের।

নারীর মর্যাদার মাপকাঠী পবিত্রতা

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : তারপর এক সময় এলো, ফেরেশতারা মারয়ামের কাছে এসে বললো, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের সেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। (সূরা : আল ইমরান : আয়াত-৪২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মারইয়ামের মাতার মান্নত অনুযায়ী তৎকালীন শরীয়তের রীতি অনুসারে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেমা ছিলেন। তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। তিনি সারা রাত আল্লাহ ইবাদাতে রত থাকতেন। মুজাহিদ বলেন, মারইয়াম আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে দীর্ঘ সময় ইবাদাতে মশগুল থাকার কারণে উভয় পাঁয়ে খুঁত এসে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন এবং আল্লাহ যে দুনিয়ার যাবতীয় শৃংখলা ও কার্যাবলি আনজাম দান করেন এবং কোনো কিছুই আপনা আপনি যেমন সংগঠিত হয় না; তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই সবকিছুই হয় না; বরং প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতিও আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তারই নিদর্শন স্বরূপ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারইয়ামের গর্ভে স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আল্লাহর অসীম কুদরতের পিতা ছাড়াই জন্ম নিলেন এবং জন্মের পরেই নিজের পরিচয় দিয়ে লোকদের সাথে কথা বলতে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তৈরি করেছেন মাতা-পিতা ছাড়া। আর ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সৃষ্টি করলেন পিতা ছাড়া কেবল মাতা থেকে। আল্লাহর এ কুদরতের নিদর্শন দেখানোর জন্যে এমন এক নারী অর্থাৎ মারইয়ামকে নির্বাচন করলেন যিনি রাতভর আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং তিনি ছিলেন নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী।

মর্যাদাবান নারীরা সমাজ বিমুখ থাকে না

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

অর্থ : হে মারইয়াম! তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো। তাঁর সামনে সিজদানত হও এবং যেসব বান্দা তাঁর সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হও। (সূরা : আল ইমরান : আয়াত-৪৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-কে তৎকালীন নারী কুলের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দানের ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে তাঁকে স্বীয় রবের অনুগত হওয়ার জন্য, রবের সিজদা করার জন্যে এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকু' করার জন্যে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন। মানব সমাজের প্রত্যেক পর্যায়ে সকল কালের নর-নারীরা জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলিতে হয়ত সত্য পথে চলেছে নয়ত চলেছে বাতিলের পথে। সকল নর-নারীকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী হকপন্থী ও বাতিল পন্থী-এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। মর্যাদাবান নারীরা বাস্তবে অন্যান্য মর্যাদার অধিকারীদেরই দলভুক্ত হয়ে চলবে এটাই স্বাভাবিক। রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করার অর্থ সমাজের সৎপন্থীদের দলভুক্ত থাকা এবং ব্যক্তিগতভাবেও সৎকাজ করা।

সমাজের জনসংখ্যার অর্ধেক যেমন নারী তেমনি বিশ্ব সৌন্দর্য সংস্থাপনে নরের মত নারীর ভূমিকাও কম নয়। ইসলাম নারীদেরকেও নির্ধারিত পরিমণ্ডলে ও নির্দিষ্ট গণ্ডীতে থেকে সামাজিক শান্তি স্থাপনে ও সমাজের উন্নতি বিধানে সম্ভাব্য ভূমিকা রাখার অবকাশ দিয়েছে। এমন নয় যে, কেবল নরেরাই সমাজে সক্রিয় থাকবে আর নারীরা থাকবে নিক্রীয় হয়ে। বস্তুত নারীদের নিক্রীয় থাকা বা সমাজ বিমুখ থাকা বা সার্বিক কর্মকাণ্ডে কোনো ভূমিকা না রাখা, কখনো কোনো মর্যাদাশীল জাতি মাত্রেরই কাম্য হতে পারে না। ইসলামের গৌরবময় যুগেও নারীদের ভূমিকা ছিল সমাজের সার্বিক কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। রাসূলের যুগে নারীরা জিহাদের জন্য যুদ্ধ ময়দানেও গিয়েছিলেন।

আল্লাহ পিতা ছাড়া শুধু মা থেকে সন্তান দিয়েছেন

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থ : একথা শুনে মারইয়াম বললো, "হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কেমন করে হবে? আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি।" জবাব এলো, "এমনটিই হবে। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটুকুই বলেন হয়ে যাও, তাহলেই তা হয়ে যায়।"(সূরা আল ইমরান : আয়াত-৪৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : ফেরেশতারা মারইয়ামকে বললেন, "হে মারইয়াম আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে ঈসা ইবনে মারইয়াম।' তিনি ইহ-পরকালের সম্মানিত ও আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। যিনি দোলনায় ও কোলে থেকে মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর যিনি পুণ্যবানদের একজন। তখন মারইয়াম আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আমার গর্ভে কী করে সন্তান জন্মিবে! আমি তো বিবাহিতা নই। আমি ব্যভিচারিণীও নই।" কারণ স্বাভাবিক নিয়মে তো নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। তিনি বলেন, "আমাকে তো কখনো কোনো নর স্পর্শ পর্যন্ত কেরনি।" কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার সন্তান হবে। এখানে যে 'এমনটি হবে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যাকারিয়া আলাইহিস সালামের জবাবেও এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে এর যে অর্থ ছিল এখানেও সেই একই অর্থ হওয়াই উচিত। তা ছাড়া পরবর্তী বাক্য বরং পূর্বাপর সমস্ত বর্ণনাই এই অর্থ সমর্থন করে যে, কোনো প্রকার যৌন সংযোজন ছাড়াই মারয়ামকে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহর জাত ও সিফাতে যে কাউকে সমকক্ষ মনে করা শিরক তেমনি মানুষের কোনো সিফাত-বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাও শিরক। ইয়াহুদীরা বলতো ওযায়ের আল্লাহর পুত্র আর খ্রিস্টানরা বলতো ঈসা আল্লাহর পুত্র। এভাবে আল্লাহর কিতাবের আহল হয়েও এ দু'টো সম্প্রদায়–ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর সাথে মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য জন্মদান ও যৌন কর্মকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির একটা দিক উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কিছু সৃষ্টিতে আল্লাহ কোনো কারণ উপকারণের মুখাপেক্ষী নন; কিছু মুহাককিক আলিমগণের মতে আল্লাহকে কোনো কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'কুন' শব্দটিও বলতে হয় না। তাদের মতে 'কুন' বলতে যতটুকু সময় লাগে আল্লাহর ইচ্ছা বলে কোনো কিছু ততটুকু সময়ের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা 'কুন' বলার প্রতিও মুহতাজ নন; বরং সে জন্যে তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। আল্লাহর অসীম কুদরতের তিনি আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ-স্ত্রী ছাড়া, হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ

(আদম) থেকে, আর ঈসা আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন নারী (মারইয়াম) থেকে। এটা আল্লাহর কুদরত। কিন্তু আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায় বিশেষ কোনো কারণে, বিশেষ কোনো সময়ে। তাছাড়া সবকিছুই সাধারণ আল্লাহর আদত অনুসারেই প্রকাশ পায়। দুনিয়ার সাধারণ নিয়মই হলো আল্লাহর আদত। নাস্তিকরা যাকে বলে প্রকৃতি। বস্তুত প্রকৃতি বলতে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহর নিকট নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই আমলের ক্ষেত্রে

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُم مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ.

অর্থ : জবাবে তাদের রব বললেন, আমি তোমাদের কারো কর্মকাণ্ড নষ্ট করবো না। পুরুষ হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়েছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবো যার নীচে দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আছে।

(সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৯৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আমলী ঈমানদার লোকদের কতিপয় দোয়া-মুনাযাতের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সে দোয়ার মনজুরী এবং আমলী লোকদের নেক আমলের বিপুল প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সৎকাজ যেই করুক না কেন সে তার পুরোপুরি প্রতিদান ও সওয়াব পাবে। কাজটি চাই কোনো পুরুষই করুক অথবা কোনো নারীই করুক। প্রতিদান প্রাপ্তিতে উভয়ের জন্যেই একই নিয়ম। আল্লাহর দরবারে এমন কোনো নিয়ম নেই যে, একই কাজ যদি পুরুষ করে তবে এক প্রকার ফল পাবে, আর যদি স্ত্রীলোকেরা করে তবে অন্য প্রকারের ফল পাবে। আল্লাহ নর ও নারীর পার্থক্যের দরুন তাদের আমলের প্রতিফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কথা হলো– بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ "তোমরা (নর-নারী) পরস্পরের অংশ বিশেষ।" কাজেই আমলের ফলাফলের দিক থেকেও কোনো তারতম্য নেই বা থাকবে না।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা স্বল্প ধারণার লোকেরা মনে করে থাকে যে, ইসলাম কেবল পুরুষদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়। নারীদের কোনো মর্যাদা বা অধিকার ইসলামে নেই।

এমনকি আজকের সমাজে কিছু নামধারী মুসলিম যুবক-যুবতীদেরও এমনি ধারণা রয়েছে। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামী তাহজীব-তমাদ্দুনের যথার্থ ধারণা ও আমল না থাকার কারণে এবং আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের একটি অংশের মধ্যে অতি সুকৌশলে এ জাতীয় বিষক্রিয়ার সংক্রমণ ঘটেছে।

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বিশ্বের অমুসলিমদের ইসলাম বিরোধী শ্লোগান নিজেদের মধ্যে শুধু প্রচলন নয়; বরং নিজেরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নিচ্ছে। যেমন সাম্প্রদায়িকতা'। যে ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার মুলোৎপাটনকারী সার্বজনীন আদর্শ। সে ইসলামকেই দুর্নাম করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার নামে।

আল-কুরআনের উপস্থাপিত নারী পুরুষের মর্যাদার পার্থক্যহীনতা, নর-নারীদের যথোপযুক্ত মর্যাদার ঘোষণা আজকের বিশ্বে কার্যকর না থাকার দরুণ উদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নারী দিবস, শিশু দিবস ইত্যাদি দিবসগুলো আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সমাজে বাস্তবায়িত হলে এসব দিবস পালনের কি প্রয়োজন হতো?

৩. সূরা আন নিসা (سُوْرَةُ النِّسَاءِ)

আয়াত : ১৭৬ রুকু : ২০ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

তৃতীয় আয়াতের 'আন নিসা' শব্দ থেকে এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় ও বিষয়বস্তু

এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিল এবং তার নাযিলের সময়টা কী ছিল, তবুও কোনো কোনো বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইংগিত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইংগিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি।

- যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বণ্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কীভাবে বণ্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলে মেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরই ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম চারটি রুকূ ও পঞ্চম রুকূর প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে।
- যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ার রেওয়ায়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকূ) এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে।
- চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নযীরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদীদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সর্তকবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো, সেটি এর পূর্বে কোনো নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে শক্তিশালী অনুমান করা যেতে পারে।
- বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম রুকূ) তায়াম্মুমের কথা উল্লেখিত হয়েছিল সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিল মনে করতে হবে।

নাযিল হওয়ার কারণ ও আলোচ্য বিষয়

এভাবে সামগ্রীক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরাটির আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।

নবী ﷺ-এর সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. একটি নতুন ইসলামী সমাজ সংগঠনের বিকাশ সাধন। হিজরাতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশেপাশের এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সমাজরীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা নতুন নীতি-নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল।

২. আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমূহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা।

৩. এ বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এ জন্য আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চাইতে বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কীভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দ-বিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদপানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংগঠন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত

থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী শক্তিদের সাথে যে সংঘাত চলছিল উহুদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল। উহুদের পরাজয় আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ, ইহুদী প্রতিবেশিবৃন্দ ও ঘরের শত্রু বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকেরা সব ধরনের ভীতি ও আশঙ্কার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার এবং কোনো খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

মুসলমানদের বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে ওযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপে করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশি পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সকদিক থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয় এবং এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্ ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এ ছাড়া তার জন্য জয়লাভের আর কোন উপায় ছিল না। তাই মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোনো দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিক ও তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য মানব বংশের বিস্তার সাধন

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম। আর তারই দেহ থেকে সৃষ্টি তাঁর সঙ্গিনী বিবি হাওয়া আলাইহাস সালাম। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলেন, হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে আদম আলাইহিস সালাম-এর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম তখন ঘুমে ছিলেন। জেগে দেখেন তাঁর পাশে এক মহিলা শায়িত আছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। অতঃপর জৈবিক চাহিদায় স্বাভাবিকভাবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পুরুষ থেকে মহিলা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তার প্রয়োজনও রাখা হয়েছে পুরুষের প্রতি।

যেহেতু সামনের দিকের আয়াতগুলোতে মানুষের পারস্পরিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে ভূমিকা ফাঁদা হয়েছে, একদিকে আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁর অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ।

"তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে"। অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত্র কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

"সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া"। এ বিষয়টির বিস্তারিত জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। সাধারণভাবে কুরআনের তাফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেন এবং বাইবেলে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ-

আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তালমুদে আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, ডান দিকের ত্রয়োদশ হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ এ ব্যাপারে নীরব। আর এর সপক্ষে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কাজেই কথাটিকে আল্লাহ যেভাবে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট রেখেছেন তেমনি রেখে এর বিস্তারিত অবস্থান জানার জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো।

একজন পুরুষ শর্ত সাপেক্ষে সর্বাধিক চার নারীকে বিয়ে করতে পারবে

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

অর্থ : আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীমদের (মেয়েদের) প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের মনমত দু'জন ও তিনজন ও চারজনকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে) ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি (বিয়ে কর) অথবা তোমাদের অধিকারে যেসব মেয়ে আছে (ক্রীতদাসী) তাদেরকে বিয়ে করো। এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

(সূরা আন নিসা : আয়াত-৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মুফাস্সিরগণ এর তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন-

১. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহেলী যুগে যেসব এতিম মেয়ে লোকদের অভিভাবকত্বাধীন থাকতো তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে অথবা তাদের ব্যাপারে তো উচ্চবাচ্য করার কেউ নেই, যেভাবে ইচ্ছা তাদের দাবিয়ে রাখা যাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক অভিভাবক নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করতো, তারপর তাদের ওপর জুলুম করতে থাকতো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে সমাজে আরো অনেক মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো। এ সূরার ১৯ রুকূর প্রথম আয়াতটি এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে।

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ছাত্র ইকরামা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহেলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোনো নির্ধারিত সীমা ছিল না। এক একজন লোক দশ দশটি বিয়ে করতো। স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সংসার খরচ বেড়ে যেতো। তখন বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের এতিম ভাইঝি ও ভাগ্নীদের এবং অন্যান্য অসহায় আত্মীয়াদের অধিকারের দিকে হাত বাড়াতো। এ কারণে আল্লাহ বিয়ের জন্য চারটির সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জুলুম ও বেইনসাফী থেকে বাঁচার পন্থা এই যে, এ থেকে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করবে যাতে তাদের সাথে সুবিচার করতে পার।

৩. সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ এবং অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, এতিমদের সাথে বেইনসাফী করাকে জাহেলী যুগের লোকেরাও সুনজরে দেখতো না। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কোনো ধারণাই তাদের মনে স্থান পায়নি। তারা যতগুলো ইচ্ছা বিয়ে করতো। তারপর তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাতো ইচ্ছে মতো। তাদের এ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা এতিমদের ওপর জুলুম ও বেইনসাফী করতে ভয় করে থাকো, তাহলে মেয়েদের সাথেও বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো। প্রথমত চারটির বেশি বিয়েই করো না। আর চারের সংখ্যার মধ্যেও সেই ক'জনকে স্ত্রী হিসেব গ্রহণ করতে পারবে যাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে।

আয়াতের শব্দাবলি এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে, যার ফলে সেখান থেকে এ তিনটি ব্যাখ্যারই সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি একই সঙ্গে আয়াতটির এ তিনটি অর্থই যদি এখানে উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ ছাড়া এর আর একটা অর্থও হতে পারে। অর্থাৎ এতিমদের সাথে যদি এভাবে ইনসাফ না করতে পারো তাহলে যেসব মেয়ের সাথে এতিম শিশু সন্তান রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করো।

এ আয়াতের ওপর মুসলিম ফকীহগণের 'ইজ্‌মা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে এক ব্যক্তির চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হাদীসে বলা হয়েছে, তায়েফ প্রধান গাইলানের ইসলাম গ্রহণ কালে নয়জন স্ত্রী ছিল। নবী ﷺ তাঁকে চারজন স্ত্রী রেখে দিয়ে বাকি পাঁচজনকে তালাক দবার নির্দেশ দেন। এভাবে আর এক ব্যক্তির (নওফল ইবনে মুআবীয়া) ছিল পাঁচজন স্ত্রী। নবী ﷺ তার এক স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকম দেন।

এছাড়াও এ আয়াতে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতাকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারের শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার শর্ত পূরণ না করে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতার সুযোগ ব্যবহার করে সে মূলত আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যে স্ত্রী বা যেসব স্ত্রীর সাথে সে ইনসাফ করে না ইসলামী সরকারের আদালতসমূহ তাদের অভিযোগ শুনে সে ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। কোনো কোনো লোক পাশ্চাত্যবাসীদের খ্রিস্টবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আড়ষ্ট ও পরাজিত মনোভাব নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে যে, একাধিক বিয়ের পদ্ধতি (যা আসলে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একটি খারাপ পদ্ধতি) বিলুপ্ত করে দেয়াই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজে এ পদ্ধতির খুব বেশি প্রচলনের কারণে এর ওপর কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ আরোপ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের কথাবার্তা মূল নিছক মানসিক দাসত্বের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে মূলগতভাবে অনিষ্টকর মনে করা কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ কোনো কোনো অবস্থায় এটি একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে পরিণত হয়। যদি এর অনুমতি না থাকে তাহলে যারা এক স্ত্রীতে তুষ্ট হতে পারে না, তারা বিয়ের সীমানার বাইরে এসে যৌন বিশৃংখলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে। এর ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-নৈতিকতার মধ্যে যে অনিষ্ট সাধিত হবে তা হবে একাধিক স্ত্রীর গ্রহণের অনিষ্টকারিতার চাইতে অনেক বেশি। তাই যারা এর প্রয়োজন অনুভব করে কুরআন তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছে। তবুও যারা মূলগতভাবে একাধিক বিয়েকে একটি অনিষ্টকারিতা মনে করেন, তাদেরকে অবশ্যই এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে,তারা কুরআনের রায়ের বিরুদ্ধে এ মতবাদের নিন্দা করতে পারেন এবং একে রহিত করারও পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু নিজেদের মনগড়া রায়কে অনর্থক কুরআনের রায় বলে ঘোষণা করার কোনো অধিকার তাদের নেই। কারণ কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে বৈধ ঘোষণা করেছে। ইশারা ইংগিতেও এর নিন্দায় এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেনি, যা থেকে বুঝা যায় যে, সে এর পথ বন্ধ করতে চায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু বিবাহ

ইউরোপীয় নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু বিবাহের বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করে আসছে। তাদের মতে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি যৌন স্পৃহা দমন করার জন্যেই এমনটি করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষের সাথে তো মহানবী ﷺ-এর কোনো তুলনাই চলে না। যে কোনো নিরপেক্ষ চিন্তার বুদ্ধিজীবি লোক মহানবীর জীবন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ চিন্তা করতে পারে না। কারণ তাঁর

জীবন-পদ্ধতিই প্রমাণ করবে যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে তা করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন তৎকালীন আরব জাহানের সামনে উম্মুক্ত ছিল। বাল্য জীবন থেকে তিনি সবার কাছে ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী আল আমীন বা বিশ্বাসী হিসেবে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন চল্লিশ বছর বয়স্কা এমন এক বিধবাকে যার ইতিপূর্বে আরও দু'জন স্বামী মারা গিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পর মহানবী ﷺ হেরা গুহায় মাসের পর মাস সময় ধরে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আরবের কে এ ঘটনা জানতো না? তাঁর সেই প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।

এ পঞ্চাশ বছর বিশেষ করে তাঁর যৌবনকাল সবটাই মক্কাবাসীদের চোখের সমানেই অতিক্রান্ত হয়েছে। মক্কায় কোনো শত্রু তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করতো না। শত্রুরা তাঁকে যাদুকর, উম্মাদ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছে সত্য, কিন্তু কখনো তাকে ভোগ সর্বস্ব বা যৌন বিকার গ্রস্ত হওয়ার মিথ্যা দাবী করতে পারেনি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫৪ বছর বয়স পর্যন্ত মহানবী ﷺ একজন স্ত্রী নিয়েই ঘর সংসার করেছিলেন। অর্থাৎ পঁচিশ বছর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে নিয়ে এবং চার বছর সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে নিয়ে তিনি দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। তারপর আটান্ন বছর বয়সে তাঁর চারজন স্ত্রী একত্রিত হন। অন্যান্যদেরকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন পরবর্তী দু'তিন বছরে। আমরা জানি সাহাবায়ে কিরাম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ছিলেন মহানবী ﷺ-এর উপর নিবেদিত প্রাণ। এমতাবস্থায় তিনি তো ইচ্ছা করলে অনেক সংখ্যক কুমারী মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি করেননি। একমাত্র আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে কুমারী স্ত্রী হিসেবে নবী ﷺ-এর সান্নিধ্যে আসেন। কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের সমালোচনার কোনো ভিত্তিই ধোপে টিকে না। ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী।

স্ত্রীদের মোহর দিতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓــًٔا مَّرِیۡٓـــٴًﺎ .

অর্থ : আর নারীগণকে তাদের দেন-মোহর প্রদান কর কিন্তু পরে যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু অংশ তোমাদেরকে প্রদান করে, তবে তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (আন নিসা : আয়াত-৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : স্ত্রীদের মোহরানার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে তখনকার দিনে নানা ধরনের যুলুম অত্যাচার চলতো। যেমন মোহরানার টাকা স্ত্রীদের হাতে না পৌছিয়ে পৌছানো হতো অভিভাবকদেরকে। আর অনেক সময় অভিভাবকরা তা আদায় করে নিজেরাই আত্মসাত করতো। তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, মোহরানার টাকা তাকেই পরিশোধ কর, অন্যকে নয়। এখানে

অভিভাবকদের প্রতিও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মোহরানা আদায় করে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দ্বিতীয় : স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ও তিক্ততা থাকতে পারবে না। তখনকার দিনে মোহরানা পরিশোধ করাকে জরিমানা দেয়ার মতো মনে করা হতো। স্বামীর এ অনাচার ও অভিভাবকদের সংকীর্ণতা রোধ করার লক্ষ্যেই রাব্বুল আলামীন نِحْلَةً (নিহ্লাতান) শব্দ ব্যবহার করেছেন। অভিধানে نِحْلَةً বলতে ঐ দানকে বলা হয় যা অত্যন্ত খুশীমনে ও আন্তরিকতা সহকারে প্রদান করা হয়। মূলত স্ত্রীদের মোহরানা অবশ্য পরিশোধযোগ্য ঋণ বিশেষ। এ ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য ঋণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে অবশ্য দেনা হিসেবে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরানাও তেমনি হৃষ্টচিত্তে ও উদারমনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ অনেক স্বামী স্ত্রীকে অসহায় অবলা পেয়ে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে বা কৌশল অবলম্বন করে মোহরানা মাফ করিয়ে নিয়ে থাকে। তখনকার দিনেও এমনটি করা হতো। কিন্তু এভাবে মাফ করিয়ে নিলে প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। কারণ এ ধরনের মাফ করা তো স্বেচ্ছায় না হয়ে পরিবেশ পরিস্থিতির চাপের মুখে হয়ে থাকে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাযী শুরাইহর ফায়সালা হচ্ছে, যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে সম্পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় এবং তারপর আবার তা দাবী করে, তাহলে তা আদায় করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে। কেননা তার দাবী করাই একথা প্রমাণ করে যে, সে নিজের ইচ্ছায় মোহরানার সমুদয় অর্থ বা তার অংশবিশেষ ছাড়তে রাজী নয়।

স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধের বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। কিন্তু মুসলিম সমাজ অন্যান্য জরুরি বিষয়ের ব্যাপারে যেমন উদাসীনতা প্রদর্শন করে ঠিক স্ত্রীর মোহারানার বেলায়ও তাই করে আসছে। অধিকন্তু আজকের মুসলিম সমাজে বিজাতীয়দের অনুকরণে যৌতুকের অভিশাপ জেঁকে বসেছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। মেয়েদের মীরাস থেকে বঞ্চিত করার মত জঘন্য তৎপরতাও এজন্যে কম দায়ী নয়। এমনকি ইসলামের মৌলিক ইবাদাত পালনে অভ্যস্ত দীনদার ব্যক্তিরাও দীনের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে পশ্চাদপদ বিধায় এমনিভাবে দীনের বহু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাকে। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে নানান অনাচার ও ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী রীতিনীতি। আর বাস্তব জীবনে মুসলিম অমুসলিমের জীবন ধারা এককার হয়ে পড়েছে। পরিণামে পৃথিবীর মানব সাধারণ বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অনিবার্য সুফল থেকে।

বস্তুত আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী লোকদের ঈমানী দায়িত্ব হলো সমাজে প্রচলিত এসব জুলুম-অত্যাচার থেকে দূরে থাকা। স্ত্রীর মোহরানার টাকা ও বোনদের প্রাপ্য মীরাস এবং ভাইদের মৃত্যুর পর ভাতিজা ও ভাইঝীদের মীরাস ও যাবতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং প্রাপকদের পাওনা হিসাব-নিকাশ করে পুরোপুরি তাদের পরিশোধ করা। নামায-রোযার চেয়ে এসবের গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ নামায-রোযা তো আল্লাহর হক, অথচ এসবই হচ্ছে বান্দার হক। আল্লাহ সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অংশ নির্ধারিত

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا.

পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যেও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ রয়েছে কম বা বেশি হোক, এসব অংশ নির্ধারিত। (সূরা আন নিসা : আয়াত-৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন-

১. মীরাস কেবল পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও অধিকার।

২. যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যই বণ্টিত হতে হবে। এমন কি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা।

৩. এ আয়াত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য যে কোনো ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জারী হবে।

৪. এ থেকে জানা যায় যে, মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে মারা যায়।

৫. এ থেকে এ বিধানও নির্দিষ্ট হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম আত্মীয় মীরাস লাভ করবে না।

সম্পত্তি বণ্টনে কন্যার অংশই মূল ভিত্তি

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে এ বিধান জারি করেছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। তবে যদি শুধু কন্যা হয় এবং দু'জনের বেশি হয়

তাহলে তারা পরিত্যাক্ত সম্পদের তিনভাগের দু'ভাগ পাবে। আর যদি কন্যা এক হয় তবে সে অর্ধেক পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তবে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে তার রেখে যাওয়া সম্পদের ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি সে নিঃসন্তান এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয় তাহলে মা পাবে তিনভাগের একভাগ, কিন্তু যদি তার একাধিক ভাই-বোন থাকে তবে মা ছয়ভাগের একভাগ পাবে। এসব মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা নিকটবর্তী তোমরা তা জান না। এ বন্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে মেয়েদের দ্বিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে শরীয়াত পুরুষদের ওপর অর্থনেতিক দায়িত্বের বোঝা বেশি করে চাপিয়ে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইনসাফের দাবী।

দু'টি মেয়ের ব্যাপারেও এই একই বিধান কার্যকর। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির যদি কোনো পুত্রসন্তান না থাকে এবং সবগুলোই থাকে কন্যা সন্তান, কন্যাদের সংখ্যা দুই বা দু'য়ের বেশি হোক না কেন, তারা সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। অবশিষ্ট তিনভাগের একভাগ অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র একটি পুত্র থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফিক্হবিদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে সে-ই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর যদি অন্যান্য ওয়ারিসরাও থাকে, তাহলে তাদের অংশ দিয়ে দেবার পর বাকি সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে।

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর সন্তান যদি সবগুলোই হয় কন্যা বা সবগুলোই পুত্র অথবা পুত্র কন্যা উভয়ই হয় বা একটি পুত্র অথবা একটি কন্যা হয়, তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগে এ ওয়ারিসরা শরীক হবে।

বাপ-মা ছাড়া যদি আর কেউ ওয়ারিস না থাকে তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগ বাপ পাবে। অন্যথায় তিনভাগের দু'ভাগে বাপ ও অন্যান্য ওয়ারিসরা শরীক হবে।

ভাই-বোন থাকলে মায়ের অংশ তিনভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের একভাগ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে ছয় ভাগের এক ভাগ বের করে নেয়া হয়েছে তা বাপের অংশে দেয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে, মৃতের বাপ-মা জীবিত থাকলে তার ভাই-বোনরা কোনো অংশ পাবে না।

অসিয়তের বিষয়টি ঋণের আগে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঋণ রেখে মারা যাওয়া কোনো জরুরি বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করা তার জন্য একান্ত জরুরি। তবে বিধানের গুরুত্বের দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ

ব্যাপারে একমত যে, ঋণের স্থান অসিয়তের চাইতে অগ্রবর্তী। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে, তারপর অসিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সবশেষে মীরাস বন্টন করা হবে। অসিয়ত সম্পর্কে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি তার সমগ্র সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অসিয়ত করতে পার। অসিয়তের এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ হচ্ছে এই যে, মীরাসী আইনের মাধ্যমে যেসব আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না, এখান থেকে তাদের যাকে যে পরিমাণ সাহায্য দেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়, তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন কোনো এতিম নাতি বা নাতনী রয়েছে। মৃত পুত্রের কোনো বিধবা স্ত্রী কষ্টে জীবন যাপন করছে। অথবা কোনো ভাই, বোন, ভাবী, ভাই-পো, ভাগনে বা কোনো আত্মীয় সাহায্য-সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে অসিয়তের মাধ্যমে তাদের অন্য হকদারদের জন্য বা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পত্তির অংশ অসিয়ত করা যেত পারে। সারকথা হচ্ছে এই যে, সম্পদ-সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ বা তার চাইতে কিছু বেশি অংশের ওপর ইসলামী শরীয়াত মীরাসের আইন বলবৎ করেছে। শরীয়াতের মনোনীত ওয়ারিসদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে। আর তিন ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে কিছু কম অংশের বন্টনের দায়িত্বভার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের বিশেষ পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষিতে (যা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে) সে যেভাবে সংগত মনে করবে বন্টন করার জন্য অসিয়ত করে যাবে। তারপর কোনো ব্যক্তি যদি তার অসিয়তে জুলুম করে অথবা অন্য কথায় নিজের ইখতিয়ারকে এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে যার ফলে কারো বৈধ অধিকার প্রভাবিত হয়, তাহলে এর মীমাংসার দায়িত্ব পরিবারের লোকদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এ ত্রুটি সংশোধন করে নেবে অথবা ইসলামী আদালতের কাযীর কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানাবে এবং তিনি অসিয়তের ত্রুটি দূর করে দেবেন।

মীরাসে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে (তাদের জ্ঞান অনুযায়ী) আল্লাহর এই আইনের ত্রুটি দূর করতে চায়, তাদেরকে এ জবাব দেয়া হয়েছে।

নারীরা বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ওয়ারিশ হয়

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوٓا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সম্পদের অর্ধেক পাবে যদি তাদের সন্তান না থাকে। আর যদি সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের চারভাগের একভাগ পাবে, ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের স্ত্রীরা সম্পদের চারভাগের একভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। আর যদি সন্তান থাকে তাহলে তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের আটভাগের একভাগ পাবে, ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারী মারা যায়। এ অবস্থায় যে, তার এক সৎভাই কিংবা সৎবোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। কিন্তু তারা যদি একাধিক হয়, তবে তারা প্রত্যেকে তিনভাগের একভাগ সমান হারে পাবে, ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। ওসীয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয় এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে কারিমায় স্বামী ও স্ত্রীদের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নারীগণও পুরুষদের মত বংশগত ও জম্মগত সম্পর্কের কারণে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে থাকে। মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে যে যে অবস্থায় পুরুষদের অধিকার রয়েছে সে সে অবস্থায় নারীদেরও অধিকার রয়েছে। একজন স্ত্রী হোক বা একাধিক তাদের যদি সন্তান থাকে তাহলে তারা আট ভাগের একভাগ এবং সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ পাবে। আর এ চার ভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের একভাগ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ বা তিন ভাগের দু'ভাগ থেকে অন্য কোনো ওয়ারিস থাকলে তারা অংশ পাবে। অন্যথায় অবশিষ্ট ঐ সমস্ত সম্পত্তি ঐ ব্যক্তি অসিয়ত করতে পারবে।

এ আয়াতের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এখানে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের সাথে তার আত্মীয়তা কেবলমাত্র মায়ের দিক থেকে এবং তাদের বাপ আলাদা। আর সহোদর এবং বৈমাত্রের ভাই-বোনের

ব্যাপারে, মৃতের সাথে বাপের দিক থেকে যাদের আত্মীয়তা, তাদের সম্পর্কিত বিধান এ সূরার শেষের দিকে বিবৃত হয়েছে।

অসিয়ত যদি এমনভাবে করা হয় যে, তার মাধ্যমে হকদার আত্মীয়দের হক নষ্ট হয়, তাহলে এ ধরনের অসিয়ত হয় ক্ষতিকর। আর নিছক হকদারদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি যখন অনর্থক নিজের ওপর এমন কোনো ঋণের স্বীকৃতি দেয়, যা সে প্রকৃতপক্ষে নেয়নি, অথবা হকদারকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে এমনি কোনো কূটচাল চালে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ঋণও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ক্ষতিকারক বিষয়কে কবীরা গোনাহ্ গণ্য করা হয়েছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। অন্য একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন, মানুষ তার সারা জীবন জান্নাতবাসীদের মতো কাজ করতে থাকে কিন্তু মরার সময় অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতি করার ব্যবস্থা করে নিজের জীবনের আমলনামাকে এমন কাজের মাধ্যমে শেষ করে যায়, যা তাকে জাহান্নামের অধিকারী করে দেয়। এ ক্ষতি করার প্রবণতা ও অন্যের অধিকার হরণ যদিও সর্বাবস্থায় গোনাহ্ তবুও 'কালালাহ্'-এর (যে নিঃসন্তান ব্যক্তির বাপ-মাও জীবিত নেই) ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বিশেষ করে এর উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, যে ব্যক্তির সন্তানাদি নেই আবার বাপ-মাও জীবিত নেই, তার মধ্যে সাধারণত নিজের সম্পদ-সম্পত্তি নষ্ট করার প্রবণতা কোনো না কোনোভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সে দূরবর্তী আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

আল্লাহ্র জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করার পেছনে এখানে দু'টি কারণ রয়েছে। এক, যদি এ আইন ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। দুই, আল্লাহ্ যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। কারণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ্ ভালো জানেন। এই সঙ্গে আল্লাহ্র ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুনের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহ্ কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি; বরং তিনি এমন নীতি-নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যা মেনে চলা মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং এর ফলে মানুষ কোনো কষ্ট, অভাব ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হবে না।

নারীকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন

وَ الّٰتِیۡ یَاۡتِیۡنَ الۡفَاحِشَۃَ مِنۡ نِّسَآئِکُمۡ فَاسۡتَشۡهِدُوۡا عَلَیۡهِنَّ اَرۡبَعَۃً مِّنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ شَهِدُوۡا فَاَمۡسِکُوۡهُنَّ فِی الۡبُیُوۡتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الۡمَوۡتُ اَوۡ یَجۡعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیۡلًا.

অর্থ : তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারের কাজে লিপ্ত হয়, তাদের উপর তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথনির্দেশ দেন। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারে লিপ্ত নারীর বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে হলে চারজন পুরুষ সাক্ষী গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে শরীয়ত অত্যন্ত কঠোর বিধান দিয়েছে। প্রথমত এ জাতীয় ঘটনায় চারজন সাক্ষী তলবের নির্দেশ এবং তাদের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নারীদের সম্পদে হস্তক্ষেপ বৈধ নয়

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا یَحِلُّ لَکُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ کَرۡهًا ؕ وَ لَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَیۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ یَّاۡتِیۡنَ بِفَاحِشَۃٍ مُّبَیِّنَۃٍ ۚ وَ عَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنۡ کَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰۤی اَنۡ تَکۡرَهُوۡا شَیۡئًا وَّ یَجۡعَلَ اللّٰهُ فِیۡهِ خَیۡرًا کَثِیۡرًا.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বন্দি করে রেখ না, কিন্তু তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্বাচরণ কর। কেননা হতে পারে তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : জাহেলী যুগে নারীদের উপর স্বামীদের পক্ষ থেকে যেমন উৎপীড়ন নির্যাতন চলতো, তেমনি চলতো ওয়ারিসদের পক্ষ থেকেও। ইসলাম উভয় ধরনের উৎপীড়নকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল কুরআন বৈবাহিক উৎপীড়ন ওয়ারিশী উৎপীড়ন– দু'টোকেই হারাম করে দিয়েছে আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোনো ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয় না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলি থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলি প্রকাশের সুযোগ পায়, তাহলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোনো কোনো কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর মনে হয় এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশি। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী ﷺ বলেন, "তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয়।"

অন্য একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেন, "বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়।"

স্ত্রীদেরকে দেয়া কোনো কিছু ফেরত নেয়া বৈধ নয়

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

অর্থ : আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাদের কাউকে অঢেল সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। তোমরা কি তা গ্রহণ করতে চাও অপবাদ ও প্রকাশ্যে পাপাচারের মাধ্যমে।

আর কীভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছ এবং স্ত্রীদের নিকট থেকে তোমরা দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছ। (সূরা আন নিসা : আয়াত : ২০-২১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ ছাড়াই যদি স্বামী নিছক নিজের বাসনা চরিতার্থ করার মানসে বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, এমতাবস্থায় যদি সে অগাধ অর্থ-সম্পদও তাকে দিয়ে

থাকে, তবে তালাকের বিনিময়ে তার কোনো অংশ ফেরত নেয়া কিংবা আদায় যোগ্য দেনা মাফ করানো স্বামীর জন্যে হারাম। কারণ এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর তো কোনো দোষ নেই তাছাড়া মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার কারণও পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বিয়েও হয়েছে উভয়ের মিলনও হয়েছে।

পাকাপোক্ত অংগীকার অর্থ বিয়ে। কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবুত ও শক্তিশালী অংগীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবুতীর ওপর ভরসা করেই একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইচ্ছায় এ অংগীকার ও চুক্তি ভংগ করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ করেছিল তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার থাকে না।

পূর্ব পুরুষ ও অধঃস্তন পুরুষদের স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ নয়

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا.

অর্থ : তোমাদের বাপ-দাদা যেসব নারীদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর না; তবে আগে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীলতা ও গুনাহের কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা। (সূরা আন নিসা : আয়াত : ২০-২১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : জাহেলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা নির্দ্বিধায় বিয়ে করে নিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এ নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ একে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন। এতো এক কুরুচী ও কুস্বভাবের কাজ। দীর্ঘদিন যাকে মা বলে সম্বোধন করা হয়ে আসছে। পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব চরিত্রের জঘন্যতম অপমৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে?

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা ঐ নারীকে বিয়ে করো না যাদেরকে তোমাদের পিতা, দাদা, নানা বিয়ে করেছেন। তবে অতীতে এমন কিছু হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। ভবিষ্যতে যেন এমনটি কিছুতেই না হতে পারে। নিশ্চয়ই এ কাজটি যুক্তির দিক থেকে অশ্লীল, সুস্থ বিবেকের লোকের পরিভাষায় অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং শরীয়তের আইনেও নেহায়াত মন্দ পথ।

সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাবলির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করে সাধারণভাবে কুরআন মাজীদে অবশ্যই একথা বলা হয়ে থাকে, "যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে"। এর দু'টি অর্থ হয়।

এক, অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার যুগে তোমরা যে সমস্ত ভুল করেছো, সেগুলো পাকড়াও করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, এখন যথার্থ নির্দেশ এসে যাবার পর

তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে নাও এবং ভুল ও অন্যায় কাজগুলো পরিহার করো, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না।

দুই, আগের যুগের কোনো পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না যে, আগের আইন বা রীতি অনুযায়ী যে কাজ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাকে নাকচ করে দিয়ে তা থেকে উদ্ভুত ফলাফলকে অবৈধ ও তার ফলে যে দায়িত্ব মাথায় চেপে বসেছে তাকে অনিবার্যভাবে রহিত করা হচ্ছে। যেমন এখন বিমাতাকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ পর্যন্ত যত লোক এ ধরনের বিয়ে করেছে, তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে জারজ গণ্য করা হচ্ছে এবং নিজেদের পিতার সম্পদ সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার রহিত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে যদি লেনদেনের কোনো পদ্ধতিকে হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, এ পদ্ধিতে এর আগে যতগুলো লেনদেন হয়েছে, সব বাতিল গণ্য হয়েছে এবং এখন এভাবে কোনো ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে তা তার থেকে ফেরত নেয়া হবে অথবা ঐ সম্পদকে হারাম গণ্য করা হবে।

ইসলামী আইন মোতাবিক এ কাজটি একটি ফৌজদারী অপরাধ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ এই অপরাধকারীদেরকে মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দিয়েছেন। আর ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে যে রেয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশটি বর্ণনা করেছিলেন, "যে ব্যক্তি মুহরিম আত্মীয়ের মধ্য থেকে কারো সাথে যিনা করে তাকে হত্যা করো"।

ফিক্হবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে এহেন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে যদি সে কোনো মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে তাকে যিনার শাস্তি দেয়া হবে আর যদি বিয়ে করে থাকে তাহলে তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

যে সব মহিলাদের বিয়ে করা হারাম

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ি। আর তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে মিলন করে থাক, তবে যদি মিলন না করে থাক তবে দোষ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রবধুকে এবং দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও হারাম করা হয়েছে। তবে আগে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা আন নিসা : আয়াত-২৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত আয়াতে যে ১৪ প্রকার মহিলাকে বিয়ে করা হারাম তাদের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে-

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন সাত প্রকারের মহিলা বংশগত কারণে আর সাত প্রকারের মহিলা বৈবাহিক কারণে বিবাহ করা হারাম হয়েছে। এখানে মা বলতে আপন মা ও বিমাতা উভয়ই বুঝায়। তাই উভয়ই হারাম এ ছাড়া বাপের মা ও মায়ের মা-ও এ হারমের অন্তর্ভুক্ত। যে মহিলার সাথে বাপের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে পুত্রের জন্য হারাম কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রথম যুগের কোনো কোনো ফকীহ একে হারাম বলেন না। আর কেউ কেউ হারাম বলেছেন; বরং তাদের মতে, বাপ যৌন কামনা সহ যে মহিলার গা স্পর্শ করেছে সেও পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সে বাপের জন্য হারাম কিনা এবং যে পুরুষের সাথে মা বা মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল অথবা পরে হয়ে যায়, তার সাথে বিয়ে করা মা ও মেয়ে উভয়ের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারেও প্রথম যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফকীহদের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। তবে সামান্য চিন্তা করলে একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যার ওপর তার পিতার বা পুত্রেরও নজর থাকে অথবা যার মা বা মেয়ের ওপরও তার নজর থাকে, তাহলে এটাকে কখনো সুস্থ ও সৎ সামাজিকতার উপযোগী বলা যেতে পারে না। যে সমস্ত আইনগত চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবাহ ও অবিবাহ, বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী এবং স্পর্শ ও

দৃষ্টিপাত ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতের স্বাভাবিক প্রকৃতি তা মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সোজা কথায় পারিবারিক জীবনে একই স্ত্রীলোকের সাথে বাপ ও ছেলে অথবা একই পুরুষের সাথে মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ এবং শরীয়াত একে কোনোক্রমেই বরদাশ্‌ত করতে পারে না। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মেয়ের যৌন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার মা ও মেয়ে উভয়ই তার জন্যে হারাম হয়ে যায়"।

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাই পছন্দ করেন না, যে একই সময় মা ও মেয়ে উভয়ের যৌনাংগে দৃষ্টিপাত করে"।

এ হাদীসগুলো থেকে শরীয়াতের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাতনী ও দৌহিত্রীও কন্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে মেয়ের জন্ম হয় সেও হারাম কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্যই মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মলেক রা. ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) মতে সেও বৈধ কন্যার মতোই মুহরিম। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর (র) মতে সে মুহরিম নয় অর্থাৎ তাকে বিয়ে করা যায়; কিন্তু আসলে যে মেয়েটিকে সে নিজে তার নিজেরই ঔরসজাত বলে জানে, তাকে বিয়ে করা তার জন্য বৈধ, এ চিন্তাটিও সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবেককে ভারাক্রান্ত করে।

সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন- তিন জনই সামনভাবে এ নিদের্শের আওতাধীন।

এ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়ের-ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। বাপ ও মায়ের বোন সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যে পর্যায়েরই হোক না কেন তারা অবশ্যই পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ভাই ও বোন সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যে কোনো পর্যায়েরই হোক না কেন তাদের কন্যারা নিজের কন্যার মতই হারাম।

সমগ্র উম্মাতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে স্ত্রীলোকদের দুধ পান করে তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি মায়ের পর্যায়ভুক্ত ও তার স্বামী বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং আসল মা ও বাপের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায় দুধ-মা ও দুধ-বাপের সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মীয়তাও তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এ বিধানটির উৎসমূলে রয়েছে নবী করীম ﷺ-এর এ নির্দেশটি- "বংশ ও রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যা হারাম দুধ সম্পর্কের দিক দিয়েও তা হারাম"।

তবে কী পরিমাণ দুধ পানে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে যে পরিমাণ দুধ পান করলে একজন রোযাদারের রোযা ভেঙে যেতে পারে কোন স্ত্রীলোকের সেই পরিমাণ দুধ যদি শিশু পান করে, তাহলে হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে তিনবার পান করলে এবং ইমাম শাফেঈর মতে পাঁচ বার পান করলে এ হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও কোন্‌ বয়সে দুধ পান করলে বিবাহ

সম্পর্ক হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ নিম্নোক্ত মত পোষণ করেন।

১. শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের যে স্বাভাবিক বয়স কাল, যখন তার দুধ ছাড়ানো হয় না এবং দুধকেই তার খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয়, এই সময়ের মধ্যে কোন মহিলার দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। নয়তো দুধ ছাড়ানোর পর কোনো শিশু কোনো মহিলার দুধ পান করলে, তা পানি পান করারই পর্যায়ভুক্ত হয়। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মত পোষণ করেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এই অর্থে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যুহরী, হাসান বসরী কাতাদাহ, ইকরামাহ ও আওযাঈও এ মত পোষণ করেন।

২. শিশুর দুই বছর বয়স কালের মধ্যে যে দুধ পান করানো হয় কেবল মাত্র তা থেকেই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু মত। ফকীহগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ওসুফিয়ান সাওরী এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফারও একটি অভিমত এরই সপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম মালিকও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন, দু'বছর থেকে যদি এক মাস দু'মাস বেশি হয়ে যায় তাহলে তার ওপরও ঐ দুধ পানের সময় কালের বিধান কার্যকর হবে।

৩. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফারের বিখ্যাত অভিমত হচ্ছে, দুধপানের মেয়াদ আড়াই বছর এবং এই সময়ের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে দুধ-সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।

৪. যে কোনো বয়সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বয়স নয়, দুধই আসল বিষয়। পানকারী বৃদ্ধ হলেও দুধ পানকারী শিশুর জন্য যে বিধান তার জন্যও সেই একই বিধান জারী হবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ মত পোষণ করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই এরই সমর্থনে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ফকীহদের মধ্যে উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে রিবাহ, লাইস ইবনে সা'দ ও ইবনে হাযম এই মত অবলম্বন করেছেন।

যে মহিলার সাথে শুধু মাত্র বিয়ে হয়েছে তার মা হারাম কী না এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ রাহেমাহুমুল্লাহু তার হারাম হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু মতে কোনো মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান না করা পর্যন্ত তার মা হারাম হবে না।

সৎ-বাপের ঘরে লালিত হওয়াই এই ধরনের মেয়ের হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মহান আল্লাহ নিছক এই সম্পর্কটির নাজুকতা বর্ণনা করার জন্য এ শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ-মেয়ে সৎ-বাপের ঘরের লালিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে সৎ-বাপের জন্য হারাম।

এই শর্তটি কেবলমাত্র এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যাকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম নয়। কেবল মাত্র নিজের ঔরস জাত পুত্রের স্ত্রীই বাপের জন্য হারাম। এভাবে পুত্রের ন্যায় প্রপুত্র ও দৌহিত্রের স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

নবী ﷺ-এর নির্দেশ, খালা ও ভাগিনী এবং ফুফু ও ভাইঝিকেও এক সাথে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে একটা মূলনীতি মনে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে, এমন ধরনের দু'টি মেয়েকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো তাহলে অন্য জনের সাথে তার বিয়ে হারাম হতো।

অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ

অর্থ : এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসী ছাড়া অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীদেরকেও বিয়ে করা হারাম। এটা হল তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

(সূরা : আন নিসা : আয়াত-২৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যে চৌদ্দ প্রকার স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে পূর্বে তার তের প্রকারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে চৌদ্দতম প্রকারের মহিলার উল্লেখ করা হয়েছে; আর তারা হচ্ছে অন্যের বিবাহে আবদ্ধ স্ত্রীলোক। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ও এ আয়াতের প্রথমাংশে যে চৌদ্দ প্রকারের স্ত্রী লোককে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে-

ক. বংশের কারণে হারাম

খ. দুধ পানের কারণে হারাম

গ. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম।

এ তিন কারণে হারাম ঘোষিত মহিলারা চিরদিনের জন্যে হারাম।

আয়াতে "অধিকারভুক্ত দাসীগণকে" হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে অধুনা এক শ্রেণির মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেও বিভ্রান্তি বিরাজ করছে।

যেসব মেয়ে যুদ্ধ বন্দিনী হয়ে এসেছে এবং তাদের স্বামীরা দারুল হার্বে (ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের শত্রুদের শাসিত দেশ) রয়ে গেছে তারা হারাম নয়। কারণ দারুল হার্ব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিয়ে ভেঙে গেছে। এই ধরনের মেয়েদের বিয়েও করা যায় আবার যাদের মালিকানায় তারা আছে তারা তাদের সাথে সংগমও করতে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একই সাথে বন্দী হয়ে আসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিধান গৃহীত হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম্ আবু হানীফা ও তাঁর সাথীগণের মতে, তাদের বিয়ে অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তাদের বিয়ে অটুট থাকবে না।

যুদ্ধ বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে বহু রকমের বিভ্রান্তি লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার।

১. যে সমস্ত মেয়ে যুদ্ধে বন্দী হয়, তাদেরকে বন্দী করার সাথে সাথেই যে কোনো সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না; বরং ইসলামী আইন অনুযায়ী এই ধরনের মেয়েদেরকে সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যেসব মুসলমান বন্দী হয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেও পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। একজন সৈনিক কেবলমাত্র সরকারের পক্ষ থেকে তাকে যে যুদ্ধ বন্দিনীটি দেয়া হয় তার সাথেই সংগম করতে পারে।

২. যে মেয়েটিকে এভাবে কারো মালিকানায় দেয়া হয়, যতক্ষণ না তার একবার মাসিক ঋতুস্রাব হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, সে গর্ভবতী নয় ততক্ষণ তার সাথে সংগম করা যেতে পারে না। এর আগে তার সাথে সংগম করা হারাম। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেও তার সাথে সংগম করা অবৈধ।

৩. যুদ্ধ বন্দিনীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে তাদের অবশ্যই আহলি কিতাব হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, যাদের মধ্যে তাদেরকে ভাগ করে দেয়া হবে তারা তাদের সাথে সংগম করতে পারবে।

৪. যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে একমাত্র সেই তার সাথে সংগম করতে পারবে। অন্য কারো গায়ে হাত তার দেবার অধিকার নেই। সেই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সে তার মালিকের বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। শরীয়াতে আপন ঔরসজাত সন্তানের যে অধিকার নির্ধারিত হয়েছে এই সন্তানের আইনগত অধিকারও তাই হবে। সন্তানের জননী হয়ে যাবার পর এই মেয়েকে আর বিক্রি করা যাবে না এবং মালিক মরে যাওয়ার সাথে সাথেই সে মুক্ত হয়ে যাবে।

৫. যে মেয়েটি এভাবে কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, তাকে তার মালিক যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে অন্য সমস্ত খেদমত নিতে পারবে কিন্তু তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার অধিকার তার থাকবে না।

৬. শরীয়াত স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে যেমন চারজনের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, দাসীদের ব্যাপারে তেমন কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়নি। ধনী লোকেরা বেশুমার বাদী কিনে কিনে মহল ভরে ফেলবে এবং বিলাসিতার সাগরে গা ভাসিয়ে দেবে, এটা শরীয়াতের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং আসলে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থাই ছিল এ ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ না করার মূল কারন।

৭. সরকার আইনগতভাবে কোনো ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দীদের ওপর যে মালিকানা অধিকার দান করেছে মালিকানার অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এটিও স্থানান্তর যোগ্য।

৮. বিয়ে এমন একটি আইনসংগত কাজ তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে যথারীতি মালিকানা অধিকার দান করাও একটি আইনসংগত কাজ। কাজেই যে ব্যক্তি বিয়ের মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় ও অপ্রীতির ব্যাপার দেখে না, তার ক্রীতদাসীর সাথে সংগম করার মধ্যে খামাখা কোনো অন্যায় ও অপ্রীতিকর বিষয় অনুভব করার পেছনে কোনো ন্যায়সংগত কারণ নেই।

৯. যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে কোনো মেয়েকে কারো মালিকানায় দিয়ে দেবার পর পুনর্বার সরকার তাকে ফেরতে নেবার অধিকার রাখে না, ঠিক যেমন কোনো মেয়ের অভিভাবক তাকে কারো সাথে বিয়ে দেবার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার হারিয়ে ফেলে।

১০. কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মিটাবার অনুমতি দেয় এবং তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়, তাহলে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এটা হবে সম্পূর্ণ একটি অবৈধ কাজ। যিনার সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। আর যিনা ইসলামী আইন অনুযায়ী একটি অপরাধ।

বিবাহে মোহরানা ধার্য অপরিহার্য

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : এদের ছাড়া অন্যান্য নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল, এ শর্তে যে, অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করার জন্য তোমরা তাদের কামনা করবে, ব্যভিচারের জন্য নয়। বিয়ের মাধ্যমে যে নারীদের তোমরা উপভোগ করেছ তাদের ধার্যকৃত মোহর তাদেরকে দিয়ে দিবে। আর তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি মোহর ধার্য করার পর কোনো বিষয়ে উভয়ে একমত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমাতওয়ালা।

(সূরা : আন নিসা : আয়াত-২৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত নির্দিষ্ট মহিলাদের ছাড়া বাকি মহিলাদের মধ্য হতে মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করার হুকুম এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঐসব নারীগণ ছাড়া বাকিসব নারী তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। যেমন চাচার কন্যা, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী তাদের মৃত্যুর পর– যদি তারা অন্য কোনো সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। আর পালক পুত্রের স্ত্রী– যদি সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, কিংবা সে মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের মহিলাই مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে কুরআনের অন্য আয়াতে চারজনের অধিক সংখ্যক নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ চারজনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যেতে পারে। আয়াত থেকে বুঝা গেল মোহরানা ছাড়া বিবাহ হতে পারে না। এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি মোহরানা ছাড়া বিবাহে সম্মত হয়, তবুও মোহরানা আবশ্যই আদায় করতে হবে। তবে বিবাহের আকদ হওয়ার সময় যদি মোহরানার পরিমাণ উল্লেখ্য না করা হয়ে থাকে তবুও বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে। আর সে অবস্থায় মোহরে মেছেল' ওয়াজিব হবে। কোনো অবস্থাতেই বিবাহ মোহরানা ছাড়া জায়েয হবে না। অবশ্য মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্ত্রীর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে কোনো প্রকার চাপ ছাড়া স্বেচ্ছায় মোহরানা আংশিক বা সম্পূর্ণ মাফ করে দিতে পারে। 'মোহরে মেছেল' বলতে মেয়ের অন্যান্য বোন, ফুফু, চাচাত, জেঠাতো বোনদের মোহরের সমপরিমাণ মোহরানা বুঝায়। এ আয়াতে اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ (তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে) বলে বুঝানো হয়েছে যে, বিবাহের উদ্দেশ্য মহিলাদের সন্ধান কর তোমাদের সম্পদ তাদের মোহরানা হিসেবে দিয়ে (বায়যাবী)। অর্থাৎ মোহরানা প্রদান করে বিবাহ কর। ফকীহগণ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ' মোহরানা' বিবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ বা উপাদান, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা না-ই হোক।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় 'মোহরানা' ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তা অপরিহার্য, চাই তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা না-ই হোক। (মাদারিক)

মোহরানার উপর্যুপরি তাকীদ থেকে প্রতিভাত হয় যে, নারীদের অধিকার সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া ইসলামী আইনে কতটা বাঞ্ছনীয়। মূল আর্থিক ব্যয় বিবাহ এবং যিনা উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। পার্থক্য এই যে, বিবাহের দ্বারা জীবনটা মানুষের মত সুশৃংখল ও অনুগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যিনার দ্বারা মানুষ পশুর মতো হীন পর্যায়ে উপনীত হয়।

আয়াতে বিবাহের জুড়ি তালাসের জন্য পুরুষকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন বিবাহের প্রস্তাবটা হবে পুরুষের কাজ আর গ্রহণ বা অনুমোদন করা হবে নারীর কাজ।-(তাফসীরে মাজেদী)

স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করবে

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্বাধীন মুসলমান নারী বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখে, তবে সে তোমাদের স্বত্বাধীন ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভাল জানেন। তোমরা পরস্পর সমান। সুতরাং তোমরা তাদের বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদের মোহর দিয়ে দিবে এ হিসেবে যে, তারা বিবাহিতা স্ত্রী; এ হিসেবে নয় যে, তারা ব্যভিচারিণী ও উপপতি গ্রহণকারিণী। যদি বিবাহিতা হওয়ার পর তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক। এ ব্যবস্থা (দাসীকে বিয়ে করা) তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় করে। তবে ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন নিসা : আয়াত-২৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : একজন মুসলিম বিয়ে করবে একজন স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাকে। কিন্তু কেউ যদি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রী (মুহসানাত)-কে বিয়ে করার পুরো সামর্থ না রাখে, তবে সে নিজেদের মধ্যকার শরীয়তসম্মত মালিকানাধীন দাসীদের বিয়ে করবে। কেননা অধিকাংশ দাসীর মোহরানা ও খরচাদি কম হয়ে থাকে এাবং তাদের গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে সংকোচ করা হয় না। আর দাসীকে বিয়ে করতে কোনো পুরুষের সংকোচ করাও উচিত নয়। কেননা ধার্মিকতা ও ঈমানদারীর দিক থেকে একজন দাসী একজন স্বাধীন নারীর চেয়েও উত্তম হতে পারে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিই হলো ঈমান ও তাকওয়া। তোমাদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ আর কে নিকৃষ্ট, তা কেবল আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ এটা তো অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত, আর অন্তরের পূর্ণ খবর তো আল্লাহর ভাল জানা আছে। পার্থিব দিক থেকে সংকোচের বড় কারণ হচ্ছে বংশগত পার্থক্য থাকা অথচ বংশের মূল উৎস হলেন আদম ও হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উৎসের অভিন্নতার কারণে তোমরা সবাই পরস্পর সমান, সবাই একই বংশোদ্ভূত। সুতরাং সংকোচের কোনো কারণ থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

অবশ্য আয়াতে ভাষ্যে বলা হয়েছে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অর্থ সামর্থ না থাকলে ঈমানদার দাসীদের বিয়ে করা যায়। সুতরাং যথাসম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করার

চেষ্টা করতে হবে। আর যদি দাসীদেরই বিয়ে করতে হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মত এটাই। তাঁর মতে স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দাসী কিংবা ইয়াহুদী খ্রিস্টান দাসীকে বিয়ে করা মাকরূহ। ইমাম শাফেঈ (র) ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইয়াহুদী খ্রিস্টান দাসীকে বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ। চিন্তাশীল উলামায়ে কিরামের মতে স্বাধীন ইয়াহুদী-খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা বৈধ হলেও তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যাধিক।

(মাআরেফুল কুরআন)

আয়াতে বলা হয়েছে, "স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে দাসী ঈমানদার মহিলাকে বিয়ে করবে।" সুতরাং মুতাআ বৈধ নয়। কারণ, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য মুতাআ ছিল সহজতম পথ। এতে যৌন বাসনারও পরিতৃপ্তি হতো এবং আর্থিক বোঝাও বিয়ের তুলনায় অনেক কম হতো। অথচ আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে অসমর্থ হলেও মুতাআর অনুমতি দেননি। কাজেই মুতাআ সর্বাবস্থায় হারাম।

নারী-পুরুষ উভয়ই তাদের অর্জিত অংশ পাবে

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ اسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا.

অর্থ : যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আন নিসা : আয়াত-৩২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। এটি সংরক্ষিত এবং যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে সমাজ জীবনে মানুষ বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে সক্ষম হবে। আল্লাহ সমস্ত মানুষকে সমান করে তৈরি করেননি; বরং তাদের মধ্যে অসংখ্য দিক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেউ সুশ্রী, কেউ কুশ্রী। কেউ সুকণ্ঠ, কেউ কর্কশ ভাষী। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। কেউ পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত অংগ-প্রত্যংগের অধিকারী, আবার কেউ জন্মগতভাবে পঙ্গু। কাউকে শারীরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে কোনো একটির শক্তি বেশি দেয়া হয়েছে আবার কাউকে দেয়া হয়েছে অন্য কোনো শক্তি। কাউকে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় পয়দা করা হয়েছে আর কাউকে খারাপ অবস্থায়। কাউকে বেশি উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে, কাউকে দেয়া হয়েছে কম। এ তারতম্য ও পার্থক্যের ভিত্তিতেই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি

বৈচিত্রমণ্ডিত হয়েছে। আর এটিই বুদ্ধি ও যুক্তিসম্মত। কিন্তু যেখানেই এই পার্থক্যের স্বাভাবিক সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ তার ওপর নিজের কৃত্রিম পার্থক্যের বোঝা চাপিয়ে দেয় সেখানেই এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। আর যেখানে আদতে এই পার্থক্যকেই বিলুপ্ত করে দেবার জন্য প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে আর এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ মানসিকতা দেখা যায়। নিজের চাইতে কাউকে অগ্রসর দেখতে পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ে। মানুষের এই মানসিকতা তাই সমাজ জীবনে হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি, শত্রুতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদি সৃষ্টির মূল। এরই ফলে যে অনুগ্রহ সে বৈধ পথে অর্জন করতে পারে না তাকে অবৈধ পথে লাভ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এই মানসিকতা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহর এই আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যদের প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন তুমি তার আকাঙ্ক্ষা করো না। তবে আল্লাহর কাছে অনুগ্রহের জন্য দোয়া করো। তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তোমার জন্য যে অনুগ্রহটি উপযোগী মনে করবেন সেটিই তোমাকে দান করবেন। আর তিনি যে বলেছেন, "যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী" এর অর্থ যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, পুরুষদের ও মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ যাই কিছু দিয়েছেন তাকে ব্যবহার করে যে যেমন কিছু নেকী বা গোনাহ অর্জন করবে সেই অনুযায়ী অথবা অন্য কথায় সেই জাতীয় জিনিসের মধ্য থেকেই আল্লাহর কাছে সে অংশ পাবে।

পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এবং অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার নির্দেশ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

অর্থ : পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষণ করতে বলেছেন, তা হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানা ত্যাগ কর এবং তাদের প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

(সূরা : আন নিসা : আয়াত-৩৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, 'কাওয়াম'। এমন এক ব্যক্তিকে 'কাওয়াম' বা 'কাইয়েম' বলা হয়, যে কোনো ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা, তার হেফাজত ও তত্ত্বাবধান এবং তার প্রয়োজন সরবরাহ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়।

এখানে সম্মান ও মর্যাদা অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি যেমন সাধারণত আমাদের ভাষায় হয়ে থাকে এবং এক ব্যক্তি এ শব্দটি বলার সাথে সাথেই এর এই অর্থ গ্রহণ করে; বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে (অর্থাৎ পুরুষ) প্রকৃতিগতভাবে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দান করেছেন যা অন্য পক্ষটিকে (অর্থাৎ নারী) দেননি অথবা দিলেও প্রথম পক্ষের চেয়ে কম দিয়েছেন। এর জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পুরুষই 'কাওয়াম' বা কর্তা হবার যোগ্যতা রাখে। আর নারীকে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের হেফাযত ও তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন, "সেই স্ত্রীই সর্বোত্তম, যাকে দেখলে তোমার মন আনন্দে ভরে যায়। তুমি তাকে কোনো আদেশ করলে সে তোমার আনুগত্য করে। আর তুমি ঘরে না থাকলে সে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার ধন-সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করে"। এ হাদীসটি এই আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা পেশ করে। কিন্তু এখানে ভালোভাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে, স্ত্রীর জন্য নিজের স্বামীর আনুগত্যের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগণ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কাজেই কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানি করার হুকুম দেয় অথবা আল্লাহর অর্পিত কোনো ফরয থেকে তাকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালায়,তাহলে এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। বিপরীত পক্ষে স্বামী যদি স্ত্রীকে নফল নামায পড়তে বা নফল রোয়া রাখতে নিষেধ করে তাহলে স্বামীর কথা মেনে চলা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নফল ইবাদাত করলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য তিনটি কাজ একই সঙ্গে করার কথা এখানে বলা হয়নি; বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, অবাধ্যতা দেখা দিলে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। এখন এগুলো বাস্তবায়নের প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দোষ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যেখানে হালকা ব্যবস্থায় কাজ হয়ে যায়, সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যেখানেই স্ত্রীদের মারার অনুমতি দিয়েছেন। সেখানেই তা দিয়েছেন একান্ত অনিচ্ছায় ও বাধ্য হয়েই। আবার তারপরও একে অপছন্দ করেছেন। তবুও কোনো কোনো স্ত্রী এমন হয়ে থাকে যাদেরকে মারধর না করলে সোজা থাকে না। এ অবস্থায় নবী ﷺ-এর নির্দেশ হচ্ছে, তাদের মুখে বা চেহারায় মেরো না, নির্দয়ভাবে মেরো না এবং এমন জিনিস দিয়ে মেরো না, যা শরীরে দাগ রেখে যায়।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি হলে সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার নির্দেশ

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

অর্থ : তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। (সূরা আন নিসা : আয়াত-৩৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : দু'জন বলতে এখানে দু'জন সালিশকে বুঝানো হয়েছে। আবার স্বামী-স্ত্রীকেও বুঝানো হয়েছে। যে কোনো ঝগড়া বিবাদের অবশ্যই মীমাংসা হতে পারে। তবে বিবাদমান পক্ষ দু'টি মীমাংসা চায় কিনা এবং যারা মাঝখানে থেকে সালিশ করেন তাঁরা আন্তরিকতার সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে মিলমিশ করে দিতে চান কিনা, এরই ওপর মীমাংসার সবটুকু নির্ভর করে।

এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌঁছাবার বা ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়াবার আগেই ঘরেই তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য এ পদ্ধিত বাতলানো হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সামাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। এই সালিশ কে নিযুক্ত করবে? এ প্রশ্নটি আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে লোক বাছাই করে আনতে পারে। তারাই তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করবে। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স্ক লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। আর ব্যাপারটি যদি আদালতে চলে যায়, তাহলে আদালত নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত দেবার আগে পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে এর মীমাংসা করে দিতে পারে।

সালিশদের ক্ষমতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এই সালিশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মীমাংসা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তবে তাদের মতে, ঝগড়া মিটমাট করার যে সংগত ও সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে সেজন্য তারা সুপারিশ করতে পারে। এই সুপারিশ মেনে নেয়া না নেয়ার ইখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর আছে। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি তাদেরকে তালাক বা খুলা তালাক অথবা অন্য কোনো ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবার জন্য দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া স্বামী-স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমগণ এই মত পোষণ করেন। অন্য দলের মতে, উভয় সালিশের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেবার এবং ঝগড়া মিটমাট করে আবার একসাথে

মিলেমিশে চলার ফায়সালা করার ইখতিয়ার আছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার অধিকার তাদের নেই। হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এই মত পোষণ করেন। তৃতীয় একটি দলের মত, এই সালিশদ্বয় স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ, সা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এই মতের প্রবক্তা।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফায়সালার যেসব নজীর আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা থেকে জানা যায়, তারা উভয়েই সালিশ নিযুক্ত করার সাথে সাথেই আদালতের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের ফায়সালা কার্যকর করার প্রশাসনিক ক্ষমতা দান করতেন। তাই আকীল ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআর মামলা যখন উসমানের আদালতে দায়ের করা হলো তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে ইবনে আব্বাসকে এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সালিশ নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা দু'জন যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে তাহলে তা করে দেবেন। অনুরূপভাবে একটি মামলায় আলী সালিশ নিযুক্ত করেন। তাদেরকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করে দেবার ইখতিয়ার দান করেন। এ থেকে জানা যায়, সালিশের নিজস্ব কোনো আদালতী ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই। তবে তাদের নিযুক্তির সময় আদালত যদি তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেয়,তাহলে তাদের ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায় প্রবর্তিত হবে।

সৎ কাজের পুরস্কার প্রাপ্তিতে নারী পুরুষের ভেদাভেদ নেই

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

অর্থ : পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। (আন নিসা-আয়াত-১২৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ঈমান রাখে আর কুরআন নির্দেশিত পথে থেকে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, সে জান্নাত লাভ করবে। তার ঈমান ও আমলের প্রতিদান প্রদানে তিল পরিমাণও যুলুম করা হবে না। চাই সে ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক। সে কুরআন ছাড়া অন্য কোনো আসমানী কিতাবের আহল হলেও। অর্থাৎ যে যাই থাকুক না কেন যদি সে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর ঈমান রাখে আর ঈমান রাখে যাবতীয় বিশ্বাস্য বিষয়ের প্রতি এবং আমল করে তদানুযায়ী। তবে তো সে হলো মুসলিম, আর তার ঈমানের ও আমলের পুরস্কারও সে পাবে পুরোপুরি। পূর্বে অন্য কিতাবধারী বা ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে অথবা বর্তমানে নর বা নারী হওয়ার কারণে কারো ঈমান ও আমলের পুরস্কার কোনো প্রকার তারতম্য করা

হবে না। দুনিয়ার নিযাম বা শৃংখলা রক্ষার জন্য মানুষ নারী-পুরুষে বিভক্ত হলেও ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করা হবে না।

মানুষ নারী পুরুষ হওয়ার কারণে দৈহিক-মানসিক শক্তিতেও তারতম্যের অধিকারী হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবেই নর-নারীর এ পার্থক্য রয়েছে, আর সেভাবেই তাদের মধ্যে ইসলামী জীবন বিধানে দায়িত্ব বন্টন ও কর্তব্য কাজের সীমারেখা সূচিত হয়েছে। মূলত এ তারতম্য তাদের কাউকেও অধিক সম্মানী আর কাউকেও স্বল্প সম্মানী হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য নিরূপণ করে না।

ইয়াতিমদের অধিকার সংরক্ষণের গুরুত্ব

وَ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا.

অর্থ : আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শোনানো হয় তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। আর যে কোনো সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ তো তা সবিশেষ অবহিত। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১২৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, মেয়েদের ব্যাপারে লোকেরা কী জিজ্ঞেস করে। তবে পরে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এটা আসল প্রশ্নের জবাব নয়। তবে লোকদের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পূর্বে আল্লাহ এই সূরার শুরুতে বিশেষ করে এতিম মেয়েদের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে এতিম শিশুদের ব্যাপারে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এতিমদের অধিকারের গুরুত্ব যে কত বেশি এ থেকে তা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দুই রুকূ'তে তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। কাজেই এখন সামাজিক প্রসঙ্গে আলোচনা আসতেই লোকদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ নিজেই এতিমদের স্বার্থের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এর এ অর্থও হতে পারে, "তোমরা তাদেরকে বিয়ে করার আগ্রহ পোষণ করো।" আবার এ অর্থও হতে পারে, "তোমরা তাদেরকে বিয়ে করা

পছন্দ কর না।" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিছু লোকের অভিভাবকত্বে এমন কিছু এতিম মেয়ে ছিল, যাদের কাছে কিছু পৈতৃক ধন-সম্পত্তি ছিল। তারা এই মেয়েগুলোর ওপর নানাভাবে জুলুম করতো। মেয়েরা সম্পদশালিনী হবার সাথে সাথে সুন্দরী হলে তারা তাদের বিয়ে করতে চাইতো এবং মোহরানা ও খোরপোষ আদায় না করেই তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য উভয়টিই ভোগ করতে চাইতো। আর তারা অসুন্দর বা কুৎসিত হলে নিজেরা তাদের বিয়ে করতো না এবং অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে দিতেও চাইতো না। কারণ অন্য কারো সাথে বিয়ে দিলে এমন কোনো শক্ত মালিক পক্ষ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল, যে তাদের থেকে এতিমদের হক বুঝে নেয়ার দাবী করতো।

বিচ্ছিন্নতার চেয়ে মীমাংসা উত্তম

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

অর্থ : কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো গুনাহ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভহেতু স্বভাবত সংকীর্ণমনা এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(সূরা আন নিসা : আয়াত-১২৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আসল প্রশ্নের জবাব এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এ জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে প্রশ্নটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অসংখ্য বিয়ে করতে পারতো। এ ব্যাপারে তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। আর এই অসংখ্য স্ত্রীদের জন্য কোনো অধিকারও সংরক্ষিত ছিল না। সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হবার পর এই স্বাধীনতার ওপর দু'ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। যেমন-

১. স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বাধিক চারের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়।

২. একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য 'আদল' (অর্থাৎ সবদিক দিয়ে সমান ব্যবহার) এর শর্ত আরোপ করা হয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বন্ধা হয় বা চিররুগ্না হয় অথবা কোনো ক্রমেই তার স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক বজায় রাখার যোগ্যতা না থাকে এবং এ অবস্থায় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে কি উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করা, সমান ভালোবাসা পোষণ করা এবং উভয়ের সাথে সমান দৈহিক সম্পর্ক রাখা তার জন্য অপরিহার্য গণ্য হবে? আর যদি সে এমনটি না করে, তাহলে আদলের শর্ত কি এটাই দাবী করে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে সে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবে? এছাড়াও প্রথম স্ত্রী নিজেই যদি বিচ্ছিন্ন হতে না চায় তাহলে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা

বোঝাপড়ার মাধ্যমে যে স্ত্রী আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে সে স্বেচ্ছায় নিজের কিছু অধিকার ত্যাগ করে তাকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য স্বামীকে রাজী করতে পারে? এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি আদলের বিরোধী হবে? সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

তালাক ও বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে যে স্ত্রী তার জীবনের একটি অংশ এক স্বামীর সাথে অতিবাহিত করেছে এভাবে পারস্পারিক বোঝাপড়া ও চুক্তির মাধ্যমে বাকি জীবনটা তারই সাথে অবস্থান করাটাই উত্তম।

স্ত্রী যদি নিজের মধ্যে স্বামীর জন্য আকর্ষণহীনতার কারণ অনুভব করতে থাকে এবং এরপরও সে স্বামীর কাছে থেকে একজন আকর্ষণীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার প্রত্যাশা করে তাহলে এটিই হবে সেই স্ত্রীর মনের সংকীর্ণতা। আর স্বামী যদি এমন কোনো স্ত্রীকে সীমাতিরিক্তভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তার অধিকার অসহনীয় পর্যায়ে ছিনিয়ে নিতে চায়, যে স্ত্রী স্বামীর মনরাজ্যে সকল প্রকার আকর্ষণ হারিয়ে বসার পরও তার সাথে অবস্থান করতে চায়, তাহলে এটি হবে স্বামীর পক্ষ থেকে মনের সংকীর্ণতার পরিচয়।

এখানে আল্লাহ আবার পুরুষেরই উদার মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপারে এটিই আল্লাহর রীতি। তিনি সকল প্রকার আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও মেয়েটির সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য পুরুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কেননা মেয়েটি বছরের পর বছর ধরে তার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে। সেই সঙ্গে আল্লাহকে ভয় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা কোনো মানুষের ভুল-ত্রুটির কারণে তিনি তার দিক থেকে যদি নিজের কৃপাদৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং তার ভাগ্যের অংশ হ্রাস করে দেন, তাহলে দুনিয়ায় তার আশ্রয় লাভ করার আর কোনো স্থানই থাকে না।

এক স্ত্রীর প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়া এবং অন্যদের ঝুলন্ত রাখা বৈধ নয়

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না; তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১২৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে একাধিক স্ত্রীর সাথে বৈষম্যহীন আচরণ সম্পর্কিত অবস্থা ও পরিস্থিতির কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

মানুষ সব অবস্থায় একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সব দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্য কায়েম করতে পারে না। একটি স্ত্রী সুন্দরী রূপসী এবং অন্যটি কুৎসিত। একজন যুবতী এবং অন্যজন

বিগত যৌবনা। একজন চির রুগ্ন ও অন্যজন সবল স্বাস্থ্যবতী। একজন কর্কশ স্বভাবের ও কটূভাষিণী এবং অন্যজন মধুর প্রকৃতির ও মিষ্টভাষিণী। স্ত্রীদের মধ্যে এ ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকতে পারে। এর ফলে স্বভাবতই এক স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বেশি ও অন্য স্ত্রীর প্রতি কম হতে পারে। এহেন অবস্থায় আইন এ দাবী করে না যে, ভালোবাসা, আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা কায়েম রাখা অপরিহার্য; বরং আইন কেবল এতটুকু দাবী করে, যখন তুমি আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও একটি মেয়েকে তালাক দিচ্ছো না এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বা তার কামনা অনুযায়ী তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখছো, তখন তার সাথে অবশ্যই এতটুকু সম্পর্ক রাখো যার ফলে সে কার্যত স্বামীহীনা হয়ে না পড়ে। এ অবস্থায় এক স্ত্রীর তুলনায় অন্য স্ত্রীর প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়া ও তার প্রতি বেশি অনুরক্ত হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অন্য স্ত্রীর প্রতি যেন এমনভাবে অবহেলা ও অনীহা প্রদর্শিত না হয় যার ফলে মনে হতে থাকে যে, তার কোনো স্বামীই নেই।

মারইয়ামকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার পরিণতি

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.

অর্থ : এবং তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১৫৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আল কুরআনের আলোচ্য আয়াত এর পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহুদী জাতির কতগুলো জঘন্যতম গুনাহর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এসব গুনাহ তাদের উপর আল্লাহর গযব ডেকে এনেছিল আর তাদের আল্লাহর হেদায়াত ও সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল ও বহুদূরে নিক্ষেপ করেছিল। উপরিউক্ত আয়াতাংশে ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর গযব আসার দু'টো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তাদের নবী কর্তৃক আনীত আল্লাহর সত্যদীনকে অস্বীকার করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মারইয়ামের উপর জঘন্য তোহমত আরোপ করা।

মারইয়াম ছিলেন বনী ইসরাঈলের অতীব শরীফ, খ্যাতিমান ও প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পরিবারের এক অবিবাহিতা কন্যা। আল্লাহর কুদরত প্রকাশে পুরুষের মিলন ছাড়াও যে আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন, তারই একমাত্র নযীর হিসেবে ঈসা (আ) পিতা ছাড়া বিবি মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ব্যাপারটি ইয়াহুদী জাতির নিকট প্রকৃতপক্ষে মোটেই সন্দেহের বিষয় ছিলো না। যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেদিনই আল্লাহ তায়ালা সমস্ত ইয়াহুদী জাতিকে সাক্ষী রেখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এতো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু, এর জন্যই একটি মুযিজা, এর সাথে নৈতিক অপরাধের কোনো সম্পর্কে নেই। অবিবাহিতা কন্যা মারইয়াম যখন কোলে বাচ্চা নিয়ে আসল, তখন জাতির ছোট-বড় হাজার হাজার লোক এসে সে ঘরে ভিড় জমায়। তারা বাচ্চা সম্পর্কে

মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করলে সে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেনি। সে চুপচাপ থেকে হাতের ইশারায় বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতে বললো। উপস্থিত জনতা সবিস্ময়ে বললো দোলনায় শায়িত এ শিশুকে আমরা কী জিজ্ঞেস করতে পারি? আল্লাহর কুদরতে সে শিশুই কথা বলে তাদের জবাব দিল। সদ্যজাত শিশুটি স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাষায় বলে দিল :

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ۖ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا.

অর্থ : "আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আর আমাকে নবী বানিয়েছেন।" (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩০)

এভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার সন্দেহ-শোবাহর মূলোৎপাটন করে দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তাই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর যৌবন কাল পর্যন্ত কেউ না মারইয়ামের প্রতি ব্যভিচারের দোষ চাপিয়েছে, না ঈসা আলাইহিস সালাম-কে অবৈধ সন্তান বলে কোনো খোঁচা দিয়েছে। কিন্তু যখন ঈসা ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর নবুয়াতের দায়িত্ব পালন শুরু করলেন, ইয়াহুদীদের যাবতীয় বদ কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন, তাদের নৈতিক পতনের বিষয়ে সাবধান করতে লাগলেন , আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়ার আহ্বান জানালেন, তখন ইয়াহুদীরা এ নির্ভিক ও সততার আওয়ায স্তব্ধ করে দেয়ার সকল অসদুপায় অবলম্বন করতে লাগলো। বিগত ত্রিশ বছর পর্যন্ত তারা যা বলেনি এখন তাই বলতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো (নাউযুবিল্লাহ) "মারইয়াম ব্যভিচারিণী ছিলেন, ঈসা অবৈধ সন্তান।" অথচ তারা নিঃসন্দেহে জানতো এ মা ও সন্তান উভয়ই ওসব মলিনতা ও কদর্য থেকে পূত-পবিত্র। তাই তাদের এ দোষারোপ আসলে কোনো সন্দেহের কারণে ছিলো না; বরং তা ছিল একেবারেই মিথ্যা। তারা তো জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতার জন্যই এরূপ বলছিলো, এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ আচরণকে যুলুম ও মিথ্যা না বলে তাকে 'কুফর' বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, এতে করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা মাত্র।

মীরাসের সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۖ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۖ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۖ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

লোকেরা তোমার নিকট 'কালাল' সম্পর্কে জানতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন : কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের

অর্ধেক। আর বোন যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।' তোমরা পথভ্রষ্ট হবে- এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা : আন নিসা : আয়াত-১৭৬)

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার অনেক পরে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনাটি সঠিক না হলেও কমপক্ষে এতটুকু প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়। এর অনেক পূর্বে সূরা নিসা নাযিল হয় এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র সূরা হিসেবে তখন পাঠ করা হচ্ছিল। এ জন্যই মীরাসের বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে সূরার শুরুতে যে আয়াতগুলো বর্ণনা করা হয় তার সাথে এ আয়াতটি বর্ণিত হয়নি; বরং পরিশিষ্ট হিসেবে সূরার শেষে একে রাখা হয়েছে।

এই আয়াতে 'কালালা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কালালা' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে কালালা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার সন্তান নেই এবং যার বাপ-দাদাও বেঁচে নেই। আবার অন্যদের মতে যে ব্যক্তি নিছক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাকে কালালা বলা হয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে প্রথমোক্ত লোকটিকেই কালালা বলা হয়। সাধারণ ফকীহগণ তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কুরআন থেকেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কুরআন কালালার বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বানানো হয়েছে। অথচ কালালার বাপ বেঁচে থাকলে বোন সম্পত্তির কিছুই পায় না।

এখানে এমন সব ভাইবোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃতের সাথে মা ও বাপ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে শীরক। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোনো সাহাবা তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে।

ভাই তার সমস্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবে, যদি কোনো নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোনো অধিকারী না থেকে থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোনো অধিকারী থাকে- যেমন স্বামী তাহলে প্রথমে তার অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাই পাবে।

দু'য়ের বেশি বোন হলে তাদের সম্পর্কেও এই একই বিধান কার্যকর হবে।

৪. সূরা আল মায়েদাহ (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ)

আয়াত : ১২০ রুকূ : ১৬ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

এ সূরার ১১২ নং আয়াতের 'মায়িদা' শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামের মতো এ সূরার নামের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। চৌদ্দশত মুসলমানকে সাথে নিয়ে নবী ﷺ উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আরবের প্রাচীনতম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে উমরাহ করতে দিল না। অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর তারা এতটুকু মেনে নিল যে, আগামী বছর আপনারা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার জন্য্য আসতে পারেন। এ সময় একদিকে মুসলমানদেরকে কাবাঘর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার নিয়ম কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন ছিল, যাতে পরবর্তী বছর পূর্ণ ইসলামী শান শওকতের সাথে উমরাহর সফর করা যায় এবং অন্য দিকে তাদেরকে এ মর্মে ভালভাবে তাকীদ করারও প্রয়োজন ছিল যে, কাফের শত্রু দল তাদের উমরাহ করতে না দিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে তার জবাবে তারা নিজেরা অগ্রবর্তী হয়ে যেন আবার কাফেরদের ওপর কোনো অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম না করে বসে। কারণ অনেক কাফের গোত্রকে হজ্জ সফরের জন্য মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে হতো। মুসলমানদেরকে যেভাবে কাবা যিয়ারত করতে দেয়া হয়নি সেভাবে তারাও এ ক্ষেত্রে জোর পূর্বক এসব কাফের গোত্রের কাবা যিয়ারতের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো। এ সূরার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ যে ভাষণটির অবতারণা করা হয়েছে সেখানে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। সামনের দিকে তের রুকূতে আবার এ প্রসংগটি উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রথম রুকূ থেকে নিয়ে চৌদ্দ রুকূ পর্যন্ত একই ভাষণের ধারাবাহিকতা চলছে। এ ছাড়াও এ সূরার মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু আমরা পাই তা সবই একই সময়কার বলে মনে হয়।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা দেখে মনে হয় এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্ভবত এটি একই সঙ্গে নাযিল হয়েছে। আবার এর কোন কোন আয়াত পরবর্তীকালে

পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হতেও পারে এবং বিষয়বস্তুর একাত্মতার কারণে সেগুলোকে এ সূরার বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সামান্যতম শূন্যতাও অনুভূত হয় না। ফলে একে দুটি বা তিনটি ভাষণের সমষ্টি মনে করার কোনো অবকাশ নেই।

নাযিলের উপলক্ষ

আল ইমরান ও আন্ নিসা সূরা দুটি যে যুগে নাযিল হয় সে যুগ থেকে এ সূরাটির নাযিলের যুগে পৌঁছতে বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় যেখানে মদীনার নিকটতম পরিবেশও মুসলমানদের জন্য বিপদসংকুল করে তুলেছিল। সেখানে এখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আরবে ইসলাম এখন একটি অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নজ্দ থেকে সিরিয়া সীমান্ত এবং অন্যদিকে লোহিত সাগর থেকে মক্কার নিকট এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। উহুদে মুসলমানরা যে আঘাত পেয়েছিল তা তাদের হিম্মত ও সাহসকে দমিত এবং মনোবলকে নিস্তেজ করার পরিবর্তে তাদের সংকল্প ও কর্মোন্মাদনার জন্য চাবুকের কাজ করেছিল। তারা আহত সিংহের মতো গর্জে ওঠে এবং তিন বছরের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। তাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মদানের ফলে মদীনার চারদিকে দেড়শ, দুশ, মাইলের মধ্যে সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তির দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মদীনার ওপর সবসময় যে ইহুদী বিপদ শকুনির মতো ডানা বিস্তার করে রেখেছিল তার অশুভ পাঁয়তারার অবসান ঘটেছিল চিরকালের জন্য। আর হিজাযের অন্যান্য যেসব জায়গায় ইহুদী জনবসতি ছিল সেসব এলাকা মদীনার ইসলামী শাসনের অধীনে এসে গিয়েছিল। ইসলামের শক্তিকে দমন করার জন্য কুরাইশরা সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল খন্দকের যুদ্ধে। এতেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এরপর আরববাসীদের মনে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহই রইলো না যে, ইসলামের এ আন্দোলনকে খতম করার সাধ্য দুনিয়ার আর কোনো শক্তির নেই। ইসলাম এখন আর নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের পর্যায় সীমিত নয়। নিছক মন ও মস্তিষ্কের ওপরই তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং ইসলাম এখন একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সমস্ত অধিবাসীর জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন মুসলমানরা এতটা শক্তির অধিকারী যে, যে চিন্তা ও ভাবধারার ওপর তারা ঈমান এনেছিল সে অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার এবং সে চিন্তা ও ভাবধারা ছাড়া অন্য কোনো আকীদা-বিশ্বাস, ভাবধারা, কর্মনীতি অথবা আইন-বিধানকে নিজেদের জীবন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে না দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার তারা লাভ করেছিল।

তাছাড়া এ কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামী মূলনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল। এ সংস্কৃতি জীবনের যাবতীয় বিস্তারিত

বিষয়ে অন্যদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির অধিকারী ছিল। নৈতিকতা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, জীবন যাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখন অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধ্যুসিত জনপদে মসজিদ ও জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জনবসতিতে ও প্রত্যেক গোত্রে একজন ইমাম নিযুক্ত রয়েছে। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুন অনেকটা বিস্তারিত আকারে প্রণীত হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের নিজস্ব আদালতের মাধ্যমে সর্বত্র গেগুলো প্রবর্তিত হচ্ছে। লেনদেন ও কেনা -বেচা, ব্যবসায় বাণিজ্যের পুরাতন রীতি ও নিয়ম রহিত হয়ে গেছে। বিয়ে ও তালাকের আইন, শরয়ী পর্দা ও অনুমতি নিয়ে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান এবং যিনা ও মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিধান জারি হয়ে গেছে। এর ফলে মুসলমানদের সমাজ জীবন একটি বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মুসলমানদের ওঠা, বসা, কথাবার্তা, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবন যাপন ও বসবাস করার পদ্ধতিও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। এভাবে ইসলামী জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন গড়ে ওঠার পর, তারা যে আবার কোনো দিন অমুসলিম সমাজের সাথে মিলে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনটি আশা করা তৎকালীন অমুসলিম বিশ্বের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল এই যে, কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত লেগেই ছিল। নিজেদের ইসলামী দাওয়াতে সীমানা বৃদ্ধি ও এর পরিসর প্রশস্ত করার জন্য অবকাশই তারা পায়নি। হুদাইবিয়ার বাহ্যিক পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ বাধা দূর করে দিয়েছিল। এর ফলে কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় সীমায়ই তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে পায়নি এবং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তৃত করার সুযোগ এবং অবকাশও লাভ করেছিল। নবী ﷺ এ কাজটিরই উদ্বোধন করলেন ইরান, রোম, মিসর ও আরবের বাদশাহ ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্র লেখার মাধ্যমে। এ সাথে ইসলাম প্রচারকবৃন্দ মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাবার জন্য বিভিন্ন গোত্র এ কওমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

এ ছিল সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। নিম্নলিখিত তিনটি বড় বড় বিষয় এ সূরাটির অন্তর্ভুক্ত-

১. **মুসলমানদের ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বিধি নিষেধ :** এ প্রসঙ্গে হজ্জ সফরের রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কাবা যিয়ারতকারীদেরকে কোনো প্রকার বাধা না দেবার হুকুম দেয়া হয়। পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল ও হারামের চূড়ান্ত সীমা প্রবর্তিত হয়। জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা নিষেধগুলো

উঠিয়ে দেয়া হয়। আহলী কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। অযু, গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তিত হয়। মদ ও জুয়াকে চূড়ান্তভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়। কসম ভাঙার কাফ্‌ফারা নির্ধারিত হয়। সাক্ষ প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা প্রবর্তন করা হয়।

২. **মুসলমানদেরকে উপদেশ প্রদান :** এখন মুসলমানরা একটি শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যাওয়ায় তাদের হাতে ছিল শাসন ক্ষমতা। এর নেশায় বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়। মজলুমীর যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছিল এবং তার চাইতে অনেক বেশি কঠিন পরীক্ষার যুগে মুসলমানরা পদার্পণ করেছিল। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বারবার উপদেশ দয়া হয়েছে, ন্যায়, ইনসাফ ও ভারসাম্যের নীতি অবলম্বন করো। তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লী কিতাবদের মনোভাব ও নীতি পরিহার করো। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর হুকুম ও আইন কানুন মেনে চলার যে অংগীকার তোমরা করেছো তার ওপর অবিচল থাকো। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো সীমালংঘন করে তাদের মতো একই পরিণতির শিকার হয়ো না। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কিতাবের অনুসরণ করো। মুনাফিকী নীতি পরিহার করো।

৩. **ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে উপদেশ প্রদান :** এ সময় ইহুদীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেছে। উত্তর আরবের প্রায় সমস্ত ইহুদী জনপদ মুসলমানদের পদানত। এ অবস্থায় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সর্তক করে দেয়া হয়। তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়। এ ছাড়া যেহেতু হুদায়বিয়ার চুক্তির কারণে সমগ্র আরবে ও আশপাশের দেশগুলোয় ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তাই খ্রিস্টানদেরকেও ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেয়া হয় এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহ্‌বান জানানো হয়। যেসব প্রতি বেশি দেশে মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসক জাতির বসবাস ছিল সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সমমনা আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কায় যে হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

মুমিনগণ কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারে কী-না?

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ : আর সংরক্ষতি মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্য থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎ কার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া। (সূরা আল মায়িদা : আয়াত-৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দের দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, স্বাধীন ও মুক্ত, যার বিপরীত শব্দ ক্রীতদাসী। দুই, সচ্চরিত্রা ও সতী-সাধ্বী। অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ আলিমের মতে এখানে দ্বিতীয় অর্থই প্রযোজ্য। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, যারা সচ্চরিত্রা বা সতী-সাধ্বী নয় তাদের বিয়ে করা হারাম; বরং আয়াতের মর্মার্থ হলো মুমিনদের উত্তম ও চরিত্রবানদের বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বা পাপাচারিণী মহিলাদের বিবাহ করা কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলিমের কাজ নয়।

এখানে الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ দ্বারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেবলমাত্র তাদের মেয়েদেরকেই বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে আর এ সঙ্গে শর্তও আরোপিত হয়েছে যে, তাদের 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত মহিলা) হতে হবে। এ নির্দেশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিরূপণের ব্যাপারে ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু আনহু মতে এখানে আহ্লি কিতাব বলতে সে সব আহ্লি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা। অন্যদিকে দারুল হর্ব ও কুফ্রের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয নয়। হানাফী ফকীহগণ এর থেকে সামান্য একটু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে বহির্দেশের আহ্লি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হারাম না হলেও মকরূহ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ও হাসান বসরীর মতে, আয়াতটির হুকুম সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কাজেই এখানে যিম্মী ও অযিম্মীর মধ্যে পার্থক্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর 'মুহসানাত' শব্দের ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু মতে, এর অর্থ পবিত্র ও নিষ্কলূষ চরিত্রের অধিকারী মেয়েরা। 'মুহসানাত' শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করার কারণে তিনি আহ্লি কিতাবদের স্বেচ্ছাচারী মেয়েদের বিয়ে করাকে এ অনুমতির আওতার বাইরে রেখেছেন। হাসান, শা'বী ও ইব্রাহীম নাখ্ঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ একই মত পোষণ করেন।

হানাফী ফকীহগণও এ মত অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর মতে, এখানে এ শব্দটি ক্রীতদাসীদের মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আহলি কিতাবদের এমন সব মেয়ে যারা ক্রীতদাসী নয়।

আহলি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেবার পর এখানে সতর্কবাণী হিসেবে এ বাক্যটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ অনুমতি থেকে লাভবান হতে চাইবে সে যেন নিজের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এমন যেন না হয়, কাফের স্ত্রীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে অথবা তার আকীদা ও কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজের ঈমানের মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে বসেন বা সামাজিক জীবন যাপন ও আচরণের ক্ষেত্রে ঈমান বিরোধী পথে এগিয়ে চলেন।

অপরাধী নারী-পুরুষ উভয়েই সমান শাস্তি পাবে

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : চোর-পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহর শক্তি সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। (সূরা : আল মায়িদা : আয়াত-৩৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত আয়াতটি চুরি কর্মের দণ্ডবিধি সম্পর্কিত। এখানে বলা হয়েছে চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনী বিধি-বিধানে কোনো বিষয়ে হুকুম করা হলে পুরুষদের সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয় আর নারীরা পুরুষদের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিধি-বিধানে কুরআন-সুন্নাহর রীতি তাই। কিন্তু চুরি ও যিনার শাস্তির বেলায় পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, এই বিধানটি হচ্ছে হুদূদ বা দণ্ডবিধি সম্পর্কিত। আর কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা দিলে হুদূদ রহিত হয়ে যায়। এজন্যে এখানে পুরুষদের অধীনস্থ করে নারীদের সম্বোধন করা হয়নি, বরং নারীর কথা পৃথক করে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

দু'হাত নয়; বরং এক হাত। আর সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কাটতে হবে। নবী ﷺ বলেছেন, "খেয়ানতকারীর হাত কাটা হবে না," এ থেকে জানা যায়, খেয়ানত বা আত্মসাৎ ইত্যাদি চুরির পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং চুরি বলতে এমন কাজ বুঝায় যার মাধ্যমে মানুষ একজনের ধন সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

নবী ﷺ এই সাথে এরূপ নির্দেশও দিয়েছেন যে, একটি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী ﷺ-এর যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম, ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী

তার মূল্য ছিল তিন দিরহাম, আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচ দিরহাম এবং আয়েশার বর্ণনা অনুযায়ী ছিল অর্ধ দিনার। সাহাবীদের এ মতবিরোধের কারণে চুরির সর্বনিম্ন নিসাব অর্থাৎ কমপক্ষে কী পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে এবং ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক-চতুর্থাংশ দীনার। (সে যুগের দিরহামে থাকতো ৩ মাসা ১ রতি পরিমাণ রূপা এবং এক-চতুর্থাংশ দীনার হতো ৩ দিরহামের সমান।) আবার এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন নবী ﷺ-এর নির্দেশ "ফল ও সবজী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" "খাদ্যবস্তু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না"। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, "তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু চুরির অপরাধে নবী ﷺ-এর আমলে হাত কাটা হতো না।"

আলী ও উসমানের ফায়সালা ছিল "পাখি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না" এবং সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেননি। তাছাড়া উমর ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বাইতুলমাল থেকে কেউ কোনো বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটেননি। এ বাপারেও কোথাও সাহাবায়ে কেরামের কোন মতবিরোধের উল্লেখ নেই। এসব মৌল উৎসের ভিত্তিতে ফিকাহর বিভিন্ন ইমাম কিছু নির্দিষ্ট বস্তু চুরি করার অপরাধে হাত কাটার দণ্ড না দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে শাক-শবজি, ফল, গোশত রান্না করা খাবার, যে শস্য এখনো স্তূপীকৃত করা হয়নি এবং খেলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে না। এ ছাড়াও তিনি বনে বিচরণকারী পশু ও বাইতুল-মালের জিনিস চুরি করলে তাতে হাত কাটার শাস্তি নেই বলে ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইমামগণও কোন কোন জিনিস চুরির ক্ষেত্রে এ শাস্তি কার্যকর নয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ চুরিগুলোর অপরাধে আদতে কোনো শাস্তিই দেয়া হবে না; বরং এর অর্থ হচ্ছে, এ অপরাধগুলোর কারণে হাত কাটা হবে না।

৫. সূরা আল আরাফ (سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ)

আয়াত : ২০৬ রুকূ : ২৪ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

এ সূরার ৪৬ ও ৪৭নং আয়াতে আসহাবে আরাফ বা আরাফবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই জন্যে এর নামকরণ করা হয়েছে আল আরাফ। অন্য কথায় বলা যায়, এ সূরাকে সূরা আল আরাফ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সূরার মধ্যে আ'রাফের কথা বলা হয়েছে ,এটা সেই সূরা।

নাযিলের সময়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সূরাটি সূরা আন'আমের প্রায় সমসময়ে নাযিল হয়। অবশ্য এটা আগে না আন'আম আগে নাযিল হয় তা নিশ্চয়তার সাথে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এ সূরায় প্রদত্ত ভাষণের বাচনভংগী থেকে এটি যে ঐ সময়ের সাথে সম্পর্কিত তা পরিষ্কার বুঝা যায়। কাজেই এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্যে সূরা আন'আমের শুরুতে যে ভূমিকা লেখা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার ভাষণের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য করার জন্যে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করাই এর সমগ্র আলোচনার মৌল উদ্দশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এ দাওয়াত সতর্ক করার ও ভয় দেখানোর ভাবধারাই ফুটে উঠেছে বেশি করে। কারণ এখানে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী) তাদেরকে বুঝাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্থুল শ্রবণ ও অনুধাবন শক্তি, হঠকারিতা, গোয়ার্তুমী ও একগুয়েমী মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। যার ফলে রাসূলের প্রতি তাদেরকে সম্বোধন করা বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেরকে সম্বোধন করার হুকুম অচিরেই নাযিল হতে যাচ্ছিল। তাই বুঝাবার ভংগীতে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, নবীর মোকাবিলায় তোমরা যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছো তোমাদের আগের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ও নিজেদের নবীদের সাথে অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করে অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর বর্তমানে যেহেতু তাদেরকে যুক্তি প্রমাণ সহকারে দাওয়াত দেবার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। তাই ভাষণের শেষ অংশে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আহলি কিতাবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এক জায়গায় সারা দুনিয়ার মানুষকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা

হয়েছে। এ থেকে এরূপ আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এখন হিজরত নিকটবর্তী এবং নবীর জন্যে তার নিটকতর লোকদেরকে সম্বোধন করার যুগ শেষ হয়ে আসছে।

এ ভাষণের এক পর্যায়ে ইহুদিদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এই সাথে রিসালাত ও নবুওয়াতের দাওয়াতের আর একটি দিকও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সাথে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করার, আনুগত্য ও অনুসৃতির অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করার এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়ার পর মিথ্যার প্রতি সাহায্য সহযোগিতা দানের কাজে আপাদমস্তক ডুবে থাকার পরিণাম কী, তাও এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে

وَيَآ اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী তোমরা দু'জনাই এ জান্নাতে থাকো। যেখানে যা তোমাদের ইচ্ছা হয় খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছে যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে"। (সূরা আল আরাফ: আয়াত-১৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোতে আদম সৃষ্টি ও শয়তানের অবাধ্যতা এবং বনী আদমের সাথে শয়তানের শত্রুতার সূচনা সম্পর্কে উপরিউক্ত কথাগুলো বলা হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আদম ﷺ-কে লক্ষ্য করে তার চির শত্রু শয়তানের চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাবধানতা অবলম্বনের পথ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদমের সাথী হিসেবে হাওয়া ﷺ-কে সৃষ্টি করে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জান্নাতে বসবাস করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "ও আদম! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস কর। আর জান্নাতের যেখান থেকে ইচ্ছা পানাহার কর। কিন্তু এ গাছটির ধারেও যেয়ো না- তাহলে তোমরা উভয়ে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"

সূরা আল বাকারার ৪র্থ রুকু'তেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সেখানে আলোচ্য আয়াতটির সাথে এ আয়াতের হুবহু মিল রয়েছে। সূরা আল বাকারার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

وَ قُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"আর আমি বললাম, "ও আদম! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস করো, আর দু'জন এ থেকে স্বাচ্ছন্দে পানাহার করো। তবে এ গাছটির ধারেও যেয়ো না– তাহলে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।" একই বিষয়ের বর্ণনায় উপরিউক্ত

সূরা আল বাকারা, সূরা আল আরাফের দু'টো আয়াতই জান্নাতে বসবাসের নির্দেশনায় আল্লাহ্ তায়ালা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন আদম ﷺ-কে; আর এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তার স্ত্রীকে। বলেছেন,

اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

"তুমি বসবাস করো তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে" লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বসবাসের ব্যাপারে কেবল আদম ﷺ-কেই সম্বোধন করেছেন। এ ব্যাপারে উভয়কে সম্বোধন করা হয়নি। আয়াতে বসবাসের ও জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আদমকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কারণ হাওয়া ﷺ ছিলেন আদম ﷺ-এর অধীন। আয়াতে পরবর্তী অংশে খানা-পিনার বিষয়ে উভকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্ত্রীগণের থাকার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্বামীর উপর, কিন্তু আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে দায়ী। স্ত্রীর অবস্থান সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত হলেও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী– (তাফসীরে মাযহারী)

আল্লাহ তায়ালা আদম-হাওয়ার বাসস্থান ব্যবস্থার সমাধান স্বরূপ এ নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও এতে বলে দেয়া হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে এসবের সীমারেখাও। আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করা হলে তার পরিণতি সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

তারপর শয়তান তাদের উভয়কে (আদম-হাওয়া) ওয়াসওয়াসা দিল, যাতে তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় (তাদের লজ্জাস্থান) যা তাদের কাছে গোপন ছিল। অর্থাৎ এমন ওয়াসওয়াসা দিল যাতে করে আদম-হাওয়ার বেহেশতী লেবাস থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তারা বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। সে বললো, "তোমাদের রব এ গাছ থেকে নিষেধ করার কারণ একমাত্র এই যে, এতে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরন্তন জীবন লাভ করে বসবে। সে তাদের উভয়কে কসম করে বললো, "আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকামী" এভাবে সে তাদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা উভয়ে ঐ গাছের স্বাদ আস্বাদন করলো, তাদের গোপন অঙ্গসমূহ তাদের সামনে খুলে গেল।

তারা নিজেদের অঙ্গ জান্নাতের পাতা দিয়ে ঢাকতে লাগলো। তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললো, আমি কি তোমাদের ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি? আর তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?"

মানুষের চির শত্রু শয়তান আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করে বিপদে ফেলার জন্য তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে কসম করে তাদেরকে আল্লাহর কথা অমান্য করাতে সক্ষম হলো। তারা উভয়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন। অমনি তাঁদের

বেহেশতী লেবাস খুলে গেলে তাঁরা লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য জান্নাতী গাছের পাতা শরীরে ধারণ করলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণত একথা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত যে, শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়াকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে তাকে দিয়ে আদম আলাইহিস সালাম-কে প্রতারিত করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআন থেকে জানা যায় যে, আদম-হাওয়া উভয়কেই একই সময়ে শয়তান প্রতারিত করেছিল। কুরআন বলে,

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

অর্থ : "সে দু'জনকেই প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেললো, আর যখন দু'জনেই গাছটির স্বাদ আস্বাদন করলো তখন তাদের উভয়ের সামনে উভয়ের লজ্জাস্থান খুলে গেল।" (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-২২)

শয়তান কর্তৃক আদম-হাওয়ার প্রতারিত হওয়ার ইতিহাসের একথাটি কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়াকে প্রতারিত করেছে, অতঃপর তারই মাধ্যমে আদম আলাইহিস সালাম-কে প্রতারিত করা হয়েছে। একথাটি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ এতে করে নারী জাতির নৈতিক, আইনগত ও সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার ব্যাপারে সাংঘাতিক কাজ করেছে। আর এতে করে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষের যাবতীয় বিপর্যয়ের দ্বার উম্মুক্ত হওয়ার পেছনে নারীরা দায়ী। আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে মূলতঃ এ ধরনের কাল্পনিক কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর নাফরমানী করলে নারী-পুরুষ উভয়কেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।"

লূত জাতির জঘন্য অশ্লীলতার জন্য আল্লাহর গযব

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ.

অর্থ : আর লূতকে আমি পয়গম্বর করে পাঠাই। তারপর স্মরণ করো, যখন সে নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, "তোমরা কি এতই নির্লজ্জ হয়ে গেলে যে, দুনিয়ার ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করে চলেছো? তোমরা মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছো? প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী।"। (সূরা আল আরাফ: আয়াত-১৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : অন্যান্য স্থানে এ জাতির আরো কয়েকটি নৈতিক অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধটির উল্লেখ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ অপরাধটির ফলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়।

এ ঘৃণ্য অপকর্মটির বদৌলতে এ জাতি যদিও দুনিয়ার বুকে চিরদিনই ধিক্কার ও কুখ্যাতি কুড়িয়েছে। কিন্তু অসৎ ও দুষ্কর্মশীল লোকেরা এ অপকর্মটি থেকে কখনো বিরত থাকেনি। তবে একমাত্র গ্রীকরাই এ একক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে যে, তাদের দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধটিকে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণের পর্যায়ে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে। এরপর আর যেটুকু বাকি ছিল, আধুনিক ইউরোপ তা পূর্ণ করে দিয়েছে। ইউরোপে এর স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি পার্লামেন্ট একে রীতিমতো বৈধ গণ্য করেছে। অথচ সমকামিতা যে সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী একথাটি অকাট্য সত্য। মহান আল্লাহ্ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই সকল প্রাণির মধ্যে নর-নারীর পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর মানব জাতির মধ্যে এ বিভিন্নতার আর একটি বাড়তি উদ্দেশ্য হচ্ছে নর ও নারী মিলে এক একটি পরিবারের জন্ম দেবে এবং তার মাধ্যমে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত গড়ে উঠবে। এ উদ্দেশ্যেই নারী ও পুরুষের দুটি পৃথক লিঙ্গের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। পারস্পরিক দাম্পত্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করার উপযোগী করে তাদের শারীরিক ও মানসিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনের মধ্যে এমন একটি আনন্দ মধুর স্বাদ রাখা হয়েছে যা প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে একই সঙ্গে আকর্ষণকারী ও আহ্বায়কের কাজ করে এবং এ সঙ্গে তাদেরকে দান করে এ কাজের প্রতিদানও। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচারণ করে সমমৈথুনের মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করে সে একই সঙ্গে কয়েকটি অপরাধ করে। প্রথমত সে নিজের এবং নিজের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর সাথে যুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের উভয়ের দেহ, মন ও নৈতিক বৃত্তির ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়ত, সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ প্রকৃতি তাকে যে আনন্দ স্বাদ মানব জাতির ও মানসিক সংস্কৃতির সেবায় প্রতিদান হিসেবে দিয়েছিল এবং যা অর্জন করাকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল, সেই স্বাদ ও আনন্দ সে কোনো প্রকার সেবামূলক কার্যক্রম, কর্তব্য পালন, অধিকার আদায় ও দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়াই ভোগ করে। তৃতীয়ত সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকা করে। কারণ সমাজে যে সমস্ত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে সেগুলোকে সে ব্যবহার করে এবং তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু যখন তার নিজের দেবার পালা আসে তখন অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করার পরিবর্তে সে নিজের সমগ্র শক্তিকে নিরেট স্বার্থপরতার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করে, যা সামাজিক সংস্কৃত ও নৈতিকতার জন্যে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনকই হয় না; বরং নিদারুনভাবে ক্ষতিকরও হয়। সে নিজেকে বংশ ও পরিবারের সেবার অযোগ্য করে তোলে। নিজের সাথে অন্ততপক্ষে একজন পুরুষকে নারী সুলভ আচরণে লিপ্ত করে। আর সেই সঙ্গে কমপক্ষে দুটি মেয়ের জন্যে যৌন ভ্রষ্টতা ও নৈতিক অধঃপতনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

অসৎ নারী সৎ পুরুষের স্ত্রী হলেও মুক্তি নেই

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থ : শেষ পর্যন্ত আমি লূতের স্ত্রীকে ছাড়া- যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি এবং এ সম্প্রদায়ের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল দেখো।

(সূরা আল আরাফ : আয়াত : ৮৩-৮৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ তায়ালা উপরিউক্ত আযাব (পূর্বোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত) দিয়ে লূত -এর পুরো অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। লূত -এর জাতির লোকেরা যখন তাঁর অবাধ্য হয়ে কেবল সেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় ডুবেই রইলো না, অধিকন্তু তারা এহেন মারাত্মক নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজের বাধা সৃষ্টিকারী লূত ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলো; তখন তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব অবধারিত হয়ে গেল। তাদের আযাব থেকে লূত তাঁর অল্প কতক অনুসারীকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা লূত -কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন শেষ রাতে তাঁর এক স্ত্রী ছাড়া সকল আহল ও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করেন। আর তারা যেন পেছনের দিকে ফিরে না তাকান। কারণ লূত সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মুহূর্ত বিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

লূত -এর স্ত্রী নবী স্বামীর অবাধ্য ও আল্লাহ্র নাফরমানদের আদর্শে বিশ্বাসী- তথা আল্লাহদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় নবীর স্ত্রী হয়েও আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পায়নি। আল্লাহ্র সামগ্রিক আযাব তাকেও গ্রাস করে নিয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে এমনি বহু নযীর রয়েছে। যেমন নূহ -এর ছেলে 'কেনআন' নবী পিতার অবাধ্য ছিল বিধায় সর্বগ্রাসী প্লাবন তকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। অবাধ্য হলেও তো আপন ছেলে। তাই নবী নূহ তার নাজাতের জন্য আল্লাহ্র কাছে আরয করে বলেছিলেন, "আমার ছেলে তো আমার আহল।" উত্তরে আল্লাহ্ বলেন, "সে তোমার আহল নয়।" এতে বুঝা যায় আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে নবী-রাসূলের একান্ত আপনজন হলেও নিস্তার নেই। পক্ষান্তরে ইবরাহীম অগ্নি পূজক আযরের ছেলে হয়েও মুসলিম মিল্লাতের পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সুতরাং কোনো মানুষের সম্পর্ক নয়; বরং আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ক তাদের হুকুম ও আদর্শ মেনে চলার মধ্যে নাজাত এবং অমান্য করার মধ্যে আযাব ও শাস্তি অবধারিত পরিণতি

৬. সূরা আত তওবা (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ اَوِ الْبَرَاءَةِ)

আয়াত : ১২৯ রুকূ : ১৬ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

এ সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত- আত্ তাওবাহ্ ও আল বারাআতু। তাওবা নামকরণের কারণ, এ সূরার এক জায়গায় কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ্ মাফ করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লেখা হয় না। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযীর বক্তব্যই সঠিক। তিনি লিখেছেন, নবী ﷺ নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখাননি, কাজেই সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি এবং পরবর্তী লোকেরাও এ রীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র কুরআন যে নবী ﷺ থেকে হুবহু ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রুকূর শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী ﷺ সে বছর আবু বকরকে رضي الله عنه আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আলীকে رضي الله عنه তার পিছে পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকূর শুরু থেকে ৯ রুকূর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবী ﷺ তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুকূ' থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাযিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ

রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাযিল হয় এবং পরে নবী ﷺ আল্লাহর ইংগিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর যে সাচ্চা ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন তিরস্কার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এ জন্য কিতাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবী ﷺ তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দুটিকে তার পরে রাখেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিলের সময়-কাল নির্ধারিত হবার পর এ সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে যে ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হুদাইবিয়া পর্যন্ত ছ'বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে আরবের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংঘটিত ও সংঘবদ্ধ সমাজের ধর্ম, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এ ধর্ম বা দীন আরো বেশি নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়। এরপর ঘটনার গতিধারা দু'টি বড় বড় খাতে প্রবাহিত হয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ দু'টি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটির সম্পর্ক ছিল আরবের সাথে এবং অন্যটির রোম সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামী শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মোকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন্ন দেখে আর সংযত থাকতে পারেনি। তারা হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ চুক্তি ভংগের পর নবী ﷺ তাদেরকে আর গুছিয়ে নেবার কোনো সুযোগ দেননি। তিনি ৮ম হিজরীর রমযান মাসে আকস্মিকভাবে মক্কা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এরপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি, হোনায়েনের ময়দানে তাদের শেষ

মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নদর, জুসাম এবং অন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপন্থী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এভাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংস্কারমূলক বিপ্লবটি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তার পথ রোধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা ও ব্যর্থ হয়। হোনায়েন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। আর এ ফায়সালা হচ্ছে, আরবকে এখন দারুল ইসলাম হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশির ভাগ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলী ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সে সময় যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায় পৌঁছুতে আরো বেশি করে সাহায্য করে। সেখানে নবী ﷺ যে দুঃসাহসিকতার সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তাঁর মুখোমুখি হবার ঝুকি না নিয়ে পিঠটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা আরবে তাঁর ও তাঁর দীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তার কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে। এ অবস্থাটিকেই কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেলো ও বিজয় লাভ হলো এবং তুমি দেখলে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।"

তাবুক অভিযান

মক্কা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী ﷺ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উত্তর দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্য। তাদের বেশির ভাগ ছিল খ্রিস্টান এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা "যাতুত তালাহ" (অথবা যাতু-আতলাহ) নামক স্থানে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা কাব ইবনে উমাইর গিফারী প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবী ﷺ বুসরার গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমরের নামেও দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তাঁর দূত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খ্রিস্টান। এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হুকুমের আনুগত। এসব কারণে নবী ﷺ ৮ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদদের একটি সেইাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। ভবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায় এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মা'আন নামক স্থানের কাছে পৌঁছার পর জানা যায় শুরাহবীল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের

মোকাবিলায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিমস নামক স্থানে সশরীরে উপস্থিত। তিনি নিজের ভাই থিয়েডরের নেতৃত্বে আরো এক লাখের একটি সেনাবাহিনী রওয়ানা করে দেন। কিন্তু এসব আতংকজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিন হাজারের এ প্রাণোৎসর্গী ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশেষে তারা মুতা নামক স্থানে শুরাহবিলের এক লাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর ফলে মুসলিম মুজাহিদদের পিষ্ট হয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারা আরব দেশ এবং সমগ্র মধ্য প্রাচ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো যে, এক ও তেত্রিশের এ মোকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ জিনিসটিই সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী আধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধিন নজদী গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বনী সুলাইম (আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামী ছিলেন তাদের সরদার) আশজা, গাতফান, যুবইয়ান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সাম্রাজ্যের আরবীয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফারওয়া ইবনে আমর আলজুযামী মুসলমান হন। তিনি নিজের ঈমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে আশেপাশের সব এলাকার লোকেরা বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাকে গ্রেফতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তাকে বলেন ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না; বরং আগের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থাকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদ- দেয়া হবে। তিনি ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করে ইসালামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাইসার তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক ভয়াবহ হুমকির স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যা আরবের মাটিতে সৃষ্ট হয়ে তার সাম্রাজ্যের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

পরের বছর কাইসার মুসলমানদের মুতা যুদ্ধের শাস্তি দেবার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তার অধীনে গাসসানী ও অন্যান্য আরব সরদাররা সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। নবী ﷺ এ ব্যাপারে বেখবর ছিলেন না। একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ যেসব ব্যাপার ইসলামী আন্দোলনের ওপর সামন্যমতও অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রত্যেকেটি সম্পর্কে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। এ প্রস্তুতিগুলোর অর্থ তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলেন। কোনো প্রকার ইতঃস্তত না করেই কাইসারের বিশাল বিপুল শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফায়সালা করে ফেলেন। এ সময় সামান্যতমও দুর্বলতা দেখানো হলে এতদিনকার সমস্ত মেহনত ও কাজ বরবাদ হয়ে যেতো। একদিকে হোনায়েনে আরবের যে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু জাহেলিয়াতের বুকে সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো

এবং অন্যদিকে মদীনার যে মুনাফীকরা আবূ আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খ্রিস্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইসারের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছিল। উপরন্তু যারা নিজেদের দুষ্কর্মের ওপর দীনদারীর প্রলেপ লাগাবার জন্য মদীনার সংলগ্ন এলাকায় "মসজিদে দ্বিরার" (ইসলামী মিল্লাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে তৈরি মসজিদ) নির্মাণ করেছিল, তারা পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতো। সামনের দিক থেকে কাইসার আক্রমণ করতে আসছিল। ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এলাকায় তার দোর্দ- প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিনটি ভয়ংকর বিপদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অকস্মাত পরাজয়ে রূপান্তিত হয়ে যেতে পারতো। তাই, যদিও দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল, সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তবুও আল্লাহর নবী এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা করার সময় মনে করে এ অবস্থায়ই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন। এর আগের সমস্ত যুদ্ধে নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোন দিকে যাবেন এবং কার সাথে মোকাবিলা করতে হবে; বরং তিনি মদীনা থেকে বের হবার পরও অভীষ্ট মনযিলের দিকে যাবার সোজা পথ না ধরে তিনি অন্য বাঁকা পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তিনি এ আবরণটুকু ও রাখলেন না। এবার পরিস্কার বলে দিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাজুক ছিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসলামের এ সংঘাতের ফলাফল কী দাঁড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও জানতো, এরপর আর কোথাও কোনো দিক থেকেই আশার সমান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোনো সম্ভবনা নেই। মুনাফিকেরাও এরই পেছনে তাদের শেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিল। তারা নিজেদের মসজিদে দ্বিরার বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহী ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়; বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২বছর ধরে তারা প্রাণপাত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের দরজা খুলে যাবে অন্যদিকে এ সময় দুবর্লতা দেখাবার অর্থ দাড়ায় খোদ আরব দেশেও একে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম

যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। উসমান ﷺ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ ﷺ বিপুল অর্থ দান করেন। উমর ﷺ তার সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। আবু বকর ﷺ তার সঞ্চিত সম্পদের সবটাই নবী ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে নযরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জানান, বাহন ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো,এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিতকরার একটি মানদ- পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোনো ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইসলামের সাথে তার সম্পর্কের দাবী সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাবুকের পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ-এর নিকট তাদের খবর পৌছিয়ে দিতেন। এর জবাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলতেন, "যেতে দাও, যদি তার মধ্যে ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি অন্য কোনো ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে শোকর করো যে, আল্লাহ তার ভ-ামীপূর্ণ সাহচর্য থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন"।

৯ম হিজরীর রজব মাসে নবী ﷺ ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীষ্মের প্রচ-তা। পানির স্বল্পতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়তি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সাচ্চা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাবুকে পৌছে পেয়ে যান। সেখানে পৌছে তারা জানতে পারেন, কাইসার ও তার অধিনস্থ সম্মুখ যুদ্ধ অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনা বাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোনো দুশমন নেই। কাজেই এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সীরাত রচয়িতারা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছে তা আদতে ভুলই ছিল। অথচ আসল ঘটনা এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মোকাবিলা করার জন্য পৌছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখেনি। মুতার যুদ্ধে এক লাখের সাথে ৩ হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবী করীমের ﷺ নেতৃত্বে ৩০

হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিম্মত তার ছিল না।

কাইসারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে যে নৈতিক বিজয় লাভ হলো, এ পর্যায়ে নবী ﷺ তাকে যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন। সে জন্যেই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারুল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাতুল জানদালের খ্রিস্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিনদী, আইলার খ্রিস্টান শাসক ইউহান্না ইবনে রুবাহ্ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা, ও আযরূহের খ্রিস্টান শাসকরাও জিযিয়া দিয়ে মদীনার বশ্যতা স্বীকার করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটরা যেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন বেশির ভাগই রোমানদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দলভুক্ত থেকে অথবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পর্দার অন্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলিয়াতের পুনর্বহালের আশায় দিন গুণছিল। তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেঙে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাংশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামতলাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলী কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এত বেশি হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য আল্লাহ্ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলি

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওবায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে-

১. এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরবদেশকে পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলম্বন

করা অপরিহার্য ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই নিম্নোক্ত আকারে তা পেশ করা হয়-

- আরব থেকে শিরককে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খতম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোনো অনৈসলামী উপাদান যেন সেখানকার ইসলামী মেজায ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোনো বিপদের সময় আভ্যন্তরীণ ফিতনার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।
- কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একান্তভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য উৎসর্গীত সেই ঘরটিতে আবারো আগের মত মূর্তিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে এটা কোনোক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হুকুম দেয়া হয়, আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বেও তাওহীদবাদীদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সঙ্গে বায়তুল্লাহর চতুর্সীমানার মধ্যে শিরক ও জাহেলিয়াতের যাবতীয় রসম রেওয়াজ বল প্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে; বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। তাওহীদবাদীদের মহান অগ্রণী পুরুষ ইবরাহীমের হাতে গড়া এ গৃহটি আর শিরক দ্বারা কলুষিত হতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
- আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী রসম-রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অক্ষুণ্ন ছিল নতুন ইসলামী যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনোক্রমেই সমীচীন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। নাসী (ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেয়া)-এর নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপরে সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. আরবের ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌছে যাবার পর সামনে যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, আরবের বাইরে আল্লাহর সত্য দীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের সংঘাত ও

সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, আরবের বাইরে যারা সত্য দীনের অনুসারী নয়, তারা ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব খতম করে দাও। অবশ্য আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপরটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ঈমান আনতে পারে, চাইলে নাও আনতে পারে। কিন্তু আল্লাহর যমীনে নিজেদের হুকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীসমূহ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবার কোনো অধিকার তাদের নেই। বড় জোর তাদেরকে একটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সে জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিযিয়া আদায় করে ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

৩. মুনাফিক সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাময়িক বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষা ও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এখন যেহেতু বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল; বরং একেবারে ছিলই না বললে চলে, তাই হুকুম দেয়া হয়, আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবী ﷺ তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন লাগান। সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জামায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবী ﷺ তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম মসজিদে দ্বিরার ভেঙে ফেলার ও জ্বালীয়ে দেবার হুকুম দেন।

৪. নিষ্ঠাবান মুমিনদের কতকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকল্পের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে একাকী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সংগঠনের জন্য ঈমানের দুর্বলতার চাইতে বড় কোনো আভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাবুক যুদ্ধের সময় যারা অলসতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সংগত ওযর ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফেকসূলভ আচরণ এবং সাচ্চা ঈমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে

জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনদের ঈমানের দাবী যাচাইয়ের আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন-প্রাণ সময় ও শ্রম ব্যয় করতে ইতস্তত করবে তার ঈমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোনো ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোনো অভাব পূরণ করা যাবে না।

এসব বিষয়ের প্রতি নজর রেখে সূরা তওবা অধ্যয়ন করলে এর যাবতীয় বিষয় সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

মুনাফিক নারী-পুরুষ উভয়ই সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوااللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ : মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভাল কাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন, মুনাফিকরাইতো ফাসেক।

(সূরা আত তাওবা : আয়াত-৬৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচ- অনিহা ও শত্রুতা। কোনো ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাকে পরামর্শ দেয়। তার মনে সাহস যোগায়। তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করে। তার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তার প্রশংসা করে। মোটকথা তার জন্য নিজেদের সব কিছুই তারা ওয়াকফ করে দেয়। মনেপ্রাণে তারা তার ঐ খারাপ কাজে শরীক হয়। অন্যদেরকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে এরা তার সাহস বাড়াতে থাকে। তাদের প্রতিটি অঙ্গ ভঙ্গী ও নড়াচড়া থেকে একথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎকাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি অনুভূত হতে থাকে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্যদিকে কোনো ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তারা মনে ব্যাথা অনুভব করতে থাকে। একথার কল্পনা করতেই তাদের মন বিষিয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোনো প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। এর দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের হাত কখনো

এগিয়ে আসে না, এটাও তাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা কৃপণ হোক বা দানশীল সর্বাবস্থায় এটা দেখা যায়। তাদের অর্থ সিন্দুকে জমা থাকে, আর নয়তো হারাম পথে আসে হারাম পথে ব্যয় হয়। অসৎকাজের ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের যুগের কারূন (অর্থাৎ দেদারসে অর্থ ব্যয় করতে পারংগম) সৎকাজের ব্যাপারে তারা চরম দরিদ্র।

মুনাফিক নারী পুরুষ ও কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থ : এ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

(সূরা আত তাওবা : আয়াত-৬৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীর জন্য আখিরাতের জীবনে কী পরিণতি হবে, সেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। মুনাফিক নর-নারী এবং কাফিরদের পরকালীন জীবনের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তারা মূলত: এমনি ধরনের শাস্তির যোগ্য। বাস্তবে ইসলামের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকরা কোনোভাবে বাহ্যিক দাবীর কারণে রেহাই পাবে না; বরং প্রকাশ্য কুফরীর কারণে কাফিররা যেমন চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের দাবীদার এসব গাদ্দারদেরও চিরদিনের তরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

মুনাফিকরা প্রধানত: দু'ধরনের। যেমন-

১. যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরোধী হলেও কোনো দুনিয়াবী স্বার্থে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো আর নতুন নতুন অপবাদ রটাতো।

২. দ্বিধা-সংকোচকারী, এরা ইসলামকে তো সত্য দ্বীন মনে করতো বটে কিন্তু প্রথম প্রকারের মুনাফিকদের সাথে মেলামেশা করতো আর তাদের কথা বার্তায়ও অংশগ্রহণ করতো। অতঃপর তাদের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা নানারূপ অসীলা- বাহনা করে ওযর পেশ করতো; বলতো এটা এ কারণে ওটা এভাবে হয়ে গেছে। তাদের জবাবে বলা হতো- আচ্ছা যদি তোমাদের এসব ওযর গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও তো কেবল তারাই রেহাই পেতে পারে যারা অন্যদের কথায় এমনটি করতো। কিন্তু যারা এসব বিশৃঙ্খলা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং অন্তরে ইসলামের শত্রুতা পোষণ করে তারা তো অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। (তাফসীরে হাককানী) সর্বাবস্থায় মুনাফিকীর মাধ্যমে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলাদের

সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ওরা যেন একই নীতি-আদর্শের রঙ্গে রঞ্জিত। ওদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কাফির ও মুনাফিকদের মধ্যে কার্যত: কেনো পার্থক্য নেই বিধায় ওরা উভয় শ্রেণিই চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ: মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না। (সূরা নিসা : আয়াত-১৪৫)

মুমিন নারী-পুরুষ সমাজে কল্যাণমূলক কাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ করে

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যই আল্লাহ্ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। (সূরা আত তাওবা : আয়াত-৭১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা যেমন একটি জাতি বা দল তেমনি মুমিনরাও একটি স্বতন্ত্র দল। যদিও উভয় দলই প্রকাশ্যে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া এবং বাহ্যত ইসলামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয়। কিন্তু তবুও উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মধারা পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে কেবল মুখে ঈমানের দাবী কিন্তু অন্তরে সত্যিকার ঈমানের ছিঁটেফোটাও নেই সেখানে জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বাইরে লেবেল আটা রয়েছে, মিশক(মৃগনাভি)বলে। কিন্তু লেবেলের নীচে যা কিছু আছে তা তার নিজের সমগ্র অস্তিত্বের সাহায্যে প্রমাণ করছে যে, সে ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে ঈমান যেখানে তার মূল তাৎপর্য সহকারে বিরাজিত সেখানে মিশক, তার নিজের চেহারা আকৃতিতে নিজের খোশবু-সুরভিতে এবং নিজের বৈশিষ্ট্য-গুণাবলিতে সব ব্যাপারেই ও সব পরীক্ষাতেই নিজের মিশক, হবার কথা সাড়ম্বরে প্রকাশ করে যাচ্ছে। ইসলাম ও ঈমানের পরিচিত নামই বাহ্যত উভয় দলকে এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। নয়তো আসলে মুনাফিক মুসলমানের নৈতিক বৃত্তি ও স্বভাব প্রকৃতি সত্যিকার ও সাচ্চা

ঈমানদার মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে মুনাফিকী স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীরা একটা পৃথক দলে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া, অসৎকাজে আগ্রহী হওয়া, নেকীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং সৎকাজের সাথে অসহযোগিতা করার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুথিবদ্ধ করেছে এবং মুমিনদের সাথে কার্যত সম্পর্কহীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে সাচ্চা মুমিন পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য তাদের জীবনাচরণের অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং মুনাফিকদের দল থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টিতে রয়েছে নারী পুরুষের জন্য মহাসাফল্য

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : এ মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা : আত তাওবা : আয়াত-৭২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতে অর্থাৎ এ সূরার ৭১ আয়াতে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা আল্লাহর রহমতের যোগ্য হবেন। আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যেগুলো হলো, তারা ঈমান রূপ মহা নিয়ামতের তাওফীক পাওয়ার কারণে একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, তারা পরস্পরকে ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেয় আর অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায কায়েম করে আর যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকেরাই এমন, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল করেন।

এসব গুণবৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াদা করেছেন জান্নাতের, যার তলদেশে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এটা কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য নয়; বরং তাদেরকে

এসব নিয়ামত দেয়া হবে স্থায়ীভাবে–চিরদিনের জন্য। চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে উত্তম বাসস্থান। তার সেখানে আরো পাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির মত দুর্লভ নিয়ামত- আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রকৃতপক্ষে এটাই জীবনের একমাত্র মহাসাফল্য যথার্থ কামিয়াবী।

আসলে ঈমানের প্রভাবে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেমন স্বচ্ছতা ও সততার অধিকারী হয়ে থাকে, তেমনি তাদের আমল ও আখলাকের ফলে সমাজেও শান্তি শৃংখলা বিরাজ করে। সাহচর্য প্রভাবের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি এর সফলও সমাজে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। পুরুষদের আল্লাহর পথে চলতে স্ত্রীরা বাধা না দিয়ে; বরং সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষায় সৎ জীবন যাপনে স্বামীরা তাদের সহায়ক ও পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহানুভূতির সুমধুর ভাব ও সম্পর্ক বিরাজ করে। এভাবে সমাজে নর-নারীর ঈমানী শক্তি তাদের দুনিয়ার জীবনে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কার্যকর হয়ে থাকে। নামায-রোযার মাধ্যমে যেমন তাদের আত্মিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুণ সৃষ্টি হয়, তেমনি যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের দিয়ে সামাজিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে ন্যায় ও সৎকাজের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায় ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

ঈমানদার নারী-পুরুষ ঈমানের বদৌলতে এমনি এক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আল্লাহর রহমতের ভাগী হতে পারে, তারা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। সর্বোপরি এভাবে তাদের জীবনের প্রকৃত সফলতা নিশ্চিত হতে পারে বলে আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৭. সূরা ইউসুফ (سُوْرَةُ يُوْسُفَ)

আয়াত : ১১১ রুকু : ১২ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

এ সূরার নাম ও আলোচ্য বিষয় ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তাঁকে কেন্দ্র করেই গোটা সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কুরাইশের লোকেরা নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এ সময় মক্কার কাফের সমাজের কোনো কোনো লোক (সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কী কারণে মিসরে চলে গিয়েছিল? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তাদের কথা-কাহিনী ও পৌরানিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোনো উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোনো কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিল, তিনি এর কোনো বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোনো ইহুদীকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উলটো তারাই মার খেয়ে গেলো। আল্লাহ্ কেবল সাথে সাথেই ইউসুফ আলাইহি সালামের এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না; বরং এ ঘটনাকে কুরইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যে ব্যবহার করছিল ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

নাযিলের উদ্দেশ্য

১. এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের প্রমাণ এবং তাও আবার বিরোধীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা। সেই সাথে তাদের স্থিরীকৃত পরীক্ষায় একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, নবী কোনা কথা বলেন না; বরং অহীর মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। ৩ ও ৭ আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ১০২ ও ১০৩ আয়াতে পূর্ণ শক্তিতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. কুরাইশ সরদারদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে এ সময় যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার ওপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের ঘটনা প্রয়োগ করে কুরাইশদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আজ তোমরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করছো যেমন ইউসূফের ভাইয়েরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু যেমন তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত যাকে চরম

নির্দয়ভাবে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো সেই ভায়ের পদতলেই নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি প্রয়োগ সফল হতে পারবে না। একদিন তোমাদেরও নিজেদের এ ভাইয়ের কাছে দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে, যাকে আজ তোমরা খতম করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো। সূরার শুরুতে এ উদ্দেশ্যটিও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,"ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

৩. আসলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরাইশদের দ্বন্দ্বের ওপর প্রয়োগ করে কুরআন মজীদ যেন একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলি তাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার দেড় দু'বছর পরই কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো মুহাম্মাদ ﷺকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয়। তারপর তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই দেশান্তরী অবস্থায়ই তিনি ঠিক তেমনি উন্নতি ও কর্তৃত্ব লাভ করেন যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন। তারপর মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সেই একই ঘটনা ঘটেছিল যা মিসরের রাজধানীতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁর ভাইদের শেষ উপস্থিতির সময় ঘটেছিল। সেখানে যখন ইউসুফের ভাইয়েরা চরম অসহায় ও দীন হীন অবস্থায় তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, "আমাদের প্রতি সাদকা করুন। আল্লাহ সাদকাকারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকেন।" তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রতিশোধ নেবার শক্তি রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন,"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সকল অনুগ্রহকারীর চাইতে বড় অনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে এখানে যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সামনে পরাজিত বিধ্বস্ত কুরাইশরা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি তাদের প্রত্যেকটি জুলুমের বদলা নেবার ক্ষমতা রাখতেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী মনে করো? আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো?" তারা জবাব দিল, "আপনি একজন উদারচেতা ভাই এবং একজন উদারচেতা ভাইয়ের সন্তান।" একথায় তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সেই একই জবাব দিচ্ছি যে জবাব ইউসুফ তার ভাইদেরকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমাদের মাফ করে দিলাম।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরাতেই আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীকে 'সুন্দরতম কাহিনী' বলে বিশেষিত করেছেন। কিন্তু কুরআন কোনো কাহিনী বা ঘটনাকে ইতিহাসের ঢং-এ বর্ণনা করে না; বরং কাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের উন্নত শিক্ষা ও উপদেশ দান করে।

গোটা কাহিনীতে এ কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে দীন-ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ঐ একই দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন।

এ কাহিনীর মাধ্যমে জনগণের সামনে দু'রকমের বিপরীতমুখী চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যাতে মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কোন্ ধরনের চরিত্র ভালো- একদিকে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর চরিত্র, অপর দিকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর হিংসুক ভাই, আযীযে মিসর, তার স্ত্রী ও মিসরের অভিজাত পরিবারের মহিলাদের চরিত্র।

এ কাহিনীর মাধ্যমে একটি গভীর অর্থপূর্ণ তত্ত্বও মানুষের মনে রেখাপাত করে। সে তত্ত্বটি হচ্ছে, আল্লাহ যা করতে চান তা অবশ্যই হয়ে যায়। মানুষ যত চেষ্টা-তদবিরই করুক, তা ঠেকাতে পারে না; বরং দেখা যায়, মানুষ যে পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করে তা তাদের উদ্দেশ্য সফল করার বদলে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণেরই সহায়ক হয়। যেমন- ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁকে কুয়ায় ফেলে মনে করেছিল যে, তাদের পথের কাঁটা দূর হয়ে গেল; কিন্তু দেখা গেল, তাদের এ অপকর্মের ফলেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর উন্নতির পথ খুলে গেল। আযীযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে জেলে পাঠিয়ে মনে করেছিল যে, তার যৌন কামনা পূরণ করতে রাজি না হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়া হলো।

অথচ এ জেলজীবনই ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে মিসরের শাসকের পদমর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিল। অপরদিকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাদের অন্যায় আচরণের জন্য তাঁর নিকট লজ্জিত হলো এবং আযীযে মিসরের স্ত্রী নিজের হীন চরিত্রের কারণে অপদস্ত হলো।

এ জাতীয় ঘটনা দু-চারটি নয়, ইতিহাসের পাতা এ ধরনের উদাহরণে ভরা। এসব ঘটনা এ মহাসত্যেরই সাক্ষী যে, আল্লাহ যাকে উপরে ওঠাতে চান, সারা দুনিয়ার শক্তি মিলেও তাকে নীচে ফেলতে পারে না; বরং মানুষ তাকে নীচে ফেলে দেওয়ার জন্য যত ফন্দি করে, আল্লাহ তার সবগুলোকেই তাকে উপরে ওঠার মাধ্যম বানিয়ে দেন। এর বিপরীতে আল্লাহ যাকে নীচে ফেলতে চান, তাকে ওঠানোর জন্য যত কৌশলই করা হোক তা উল্টে যায়।

এ সূরার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো-

একজন মর্দে মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রে সজ্জিত হয় এবং ধীরস্থিরভাবে সবর ও হিকমতের সাথে আল্লাহ তাআলার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সকল সমস্যার মোকাবিলা করতে থাকে, তাহলে নিছক চরিত্রবলেই সে সারা দেশ জয় করতে পারে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ১৭ বছর বয়সে ক্রীতদাস অবস্থায় বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে

পড়ে যান। অত্যন্ত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নৈতিক অপরাধে দোষী হিসেবেই তাকে জেলে যেতে হয়। এমন চরম দুরবস্থা থেকে তিনি ঈমান ও চরিত্রের হাতিয়ার দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করে মিসর জয় করেন। তিনি সেদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ ৫০ বছর পরম সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে মিসর শাসন করেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

মিশরের বাদশাহর স্ত্রী জুলাইখার কাহিনী

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۶﴾ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۷﴾ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿۲۸﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿۲۹﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ

عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾

অর্থ : যে মহিলাটির ঘরে সে ছিল সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকলো এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "চলে এসো"। ইউসুফ বললো, "আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন (আর আমি এ কাজ করবো!)। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো। এমনটিই হলো, যাতে আমি তার থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি। আসলে সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগে-পিছে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং সে পেছন থেকে ইউসুফের জামা (টেনে ধরে) ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই দরজার ওপর তার স্বামীকে উপস্থিত পেলো। তাকে দেখতেই মহিলাটি বলতে লাগলো, "তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে তার কী শাস্তি হতে পারে ? তাকে কারগারে প্রেরণ করা অথবা কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কী শাস্তি দেয়া যেতে পারে?" ইউসুফ বললো, "সে-ই আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছিল।" মহিলাটির নিজের পরিবারের একজন (পদ্ধতিগত) সাক্ষ্য দিল, "যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যুক। আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।" স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া তখন বললো, "এসব তোমাদের মেয়েলোকদের ছলনা। সত্যিই বড়ই ভয়ানক তোমাদের ছলনা! হে ইউসুফ! এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তুমিই আসল অপরাধী"। শহরের মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "আযীযের স্ত্রী তার যুবক গোলামের পেছনে পড়ে আছে, প্রেম তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে পরিষ্কার ভুল করে যাচ্ছে।"সে যখন তাদের এ শঠতাপূর্ণ কথা শুনলো তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো। তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার মজলিসের আয়োজন করলো। খাওয়ার বৈঠকে তাদের সবার সামনে একটি করে ছুরি রাখলো। (তারপর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসার ইশারা করলো। যখন ঐ মেয়েদের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো, তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো এবং নিজের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা। আযীযের স্ত্রী বললো, "দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে

নেয় তাহলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। "ইউসুফ বললো, "হে আমার রব! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়! আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাকে রক্ষা করলেন। অবশ্যই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। (সূরা ইউসুফ : আয়াত : ২৩-৩৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত বারটি আয়াত সূরা ইউসুফ থেকে নেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফকে আল্লাহ তায়ালা أَحْسَنَ الْقَصَصِ বা সর্বোত্তম কাহিনী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর কুরআনের এ একটি সূরাতেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় অনেক বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে ২৩ আয়াত থেকে ৩৪ আয়াত পর্যন্ত তৎকালীন মিশরের বাদশাহর স্ত্রী যুলায়খার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁকে কুপে নিক্ষেপ করে চলে গিয়েছিলো। আল্লাহর অসীম রহমতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কূপে সুস্থ ও জীবিত থেকে গেলেন। পথিক কাফেলার লোকেরা তাঁকে কুপ থেকে তুলে নিয়ে মিশর শহরে বিক্রি করে দিল। মিশর শহরে ইউসুফের এ ক্রেতা ছিলেন মিশরের বাদশাহ (আযীযে মেছের) বাদশাহ ইউসুফকে কিনে নিয়ে স্ত্রীকে যা বললেন, কুরআনের ভাষায় তা হলো :

أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا.

অর্থ : "একে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করো, এ আমাদের কোনো উপকারে আসতে পারে অথবা একে আমরা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-২১)

ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন যৌবনের স্তরে উপনীত হন, তিনি যখন আঠার-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক এবং সুষমামণ্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তখন তাঁর মালিকের স্ত্রী যুলায়খা ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে গোটা পরিবেশটাকেই ইউসুফের জন্য অস্বস্তিকর করে তুলেছিলো। প্রতিটি মুহূর্তেই জুলাইখা তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকতো ইউসুফকে কাবু করার জন্য। আর ইউসুফ– আল্লাহতে বিশ্বাসী নওযোয়ান, তাকওয়ার বলে বলীয়ান দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ মনোবল সম্পন্ন যুবক হয়েও এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্বীয় মানবিক দুর্বলতার কথা ভেবে কেঁপে উঠতেন। তিনি আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে বলতেন, " হে আল্লাহ! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি আমার নেই। আল্লাহ! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিই আমাকে বাঁচাও।"

এমনি পরিস্থিতিতে একদা 'আযীযে মেছের'-এর অনুপস্থিতিতে জুলাইখা ইউসুফের সাথে যে আচরণ ও কাণ্ড করেছিল উপরিউক্ত ১২টি আয়াতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

জুলাইখা ইউসুফকে বালাখানায় ঢুকিয়ে ক্রমাগত দরজাসমূহ বন্ধ করতে করতে ভিতরে নিয়ে গেল। কোনো কেনো বর্ণনায় সাতটি দরজায় সাতটি তালা দিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করে ভিতরের দিকে চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল আয়াতে আছে "বুরহান।" বুরহান মানে দলীল বা প্রমাণ। রবের প্রমাণ মানে রবের দেখিয়ে দেয়া বা বুঝিয়ে দেয়া এমন প্রমাণ যার ভিত্তিতে ইউসুফের বিবেক তার ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করেছে যে, এ নারীর ভোগের আহবানে সাড়া দেয়া তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ প্রমাণটি কী ছিল। ইতোপূর্বে পিছনের বাক্যেই তা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে, "আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন আর আমি খারাপ কাজ করবো! এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" এ অকাট্য যুক্তিই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সদ্যোন্মিত যৌবনকালের এ সংকট সন্ধিক্ষণে পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। তারপর বলা হলো, "ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।" এ থেকে নবীগণের নিষ্পাপ হবার (ইসমতে আম্বিয়া) তত্ত্বের অর্ন্তনিহিত সত্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবীর নিষ্পাপ হবার মানে এ নয় যে, তাঁর গুনাহ, ভুল ও ত্রুটি করার ক্ষমতা ও সামর্থ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলে তাঁর দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হতেই পারে না; বরং এর মানে হচ্ছে, নবী যদিও গুনাহ করার শক্তি রাখেন কিন্তু সমস্ত মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হওয়া এবং যাবতীয় মানবিক আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা-প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন সদাচারী ও আল্লাহভীরু হয়ে থাকেন যে, জেনে বুঝে কখনো গুনাহ করার ইচ্ছা করেন না। তার বিবেকের অভ্যন্তরে আল্লাহর এমন সব শক্তিশালী দলীল প্রমাণ তিনি রাখেন যেগুলোর মোকাবিলায় প্রবৃত্তির কামনা বাসনা কখনো সফলকাম হবার সুযোগ পায় না। আর যদি সজ্ঞানে তিনি কোনো ত্রুটি করেই বসেন তাহলে মহান আল্লাহ তখনই সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্খলন শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পদস্খলন নয়; বরং সমগ্র উম্মতের পদস্খলনের রূপ নেয়। তিনি সঠিক পথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলে সারা দুনিয়া গোমরাহীর পথে মাইলের পর মাইল চলে যায়।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, জুলাইখার সেই নির্জন কক্ষে আল্লাহর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই ইউসুফ সেখান থেকে পলায়োনদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয পত্নী জুলাইখা তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বাইরে যেতে বাধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প– তাই তিনি থামলেন না। ফলে তাঁর জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। মাআরেফুল কুরআনে মুফতী শফী রহ. ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ দৌড়িয়ে দরজার ধারে পৌঁছামাত্র যুলায়খার বন্ধ করা তালাগুলো আপনা আপনি খুলে নীচে পড়ে যেতে থাকে। এভাবে প্রত্যেকটি দরজার তালা খুলে পড়ে যেতো আর ইউসুফ প্রতিটি

কামরার দরজা পেরিয়ে যেতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। যুলায়খাও তাঁর পেছনে পেছনে যেতে যেতে শেষ দরজার বাইরে চলে গেল। উভয়ে দরজার বাইরে এসেই দেখলো আযীযে মেছের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকওয়ার বলে তথা আল্লাহর অসীম রহমতে এ মারাত্মক ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল থেকে রক্ষা পেলেন। তাঁর ঈমানী শক্তি এবং সর্বত্র আল্লাহর উপস্থিতির দ্বিধাহীন অকৃত্রিম বিশ্বাস থাকায় আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করলেন।

এদিকে দরজার বাইরে দুজনই আযীযে মেছেরকে দাঁড়ানো দেখতে পেল। যুলায়খা চমকে উঠলো, আর সম্পূর্ণ বিপরীত দোষ ও অপবাদ চাপিয়ে দিল ইউসুফের ওপর। সে স্বামীকে বললো, যে লোক তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তার শাস্তি এ ছাড়া কী হতে পারে যে তাকে জেলে পাঠানো হবে অথবা কোনো কঠোর দৈহিক যন্ত্রণা দেয়া হবে?

এতক্ষণ তো ইউসুফ সৌজন্যবোধের কারণে কোনো কথা বলেননি। এবার কিন্তু তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তাছাড়া প্রতিবাদ না করলে তো যুলায়খার মিথ্যা অপবাদ সমর্থন করা হয়। তিনি বলে উঠলেন : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي "সে-ই তো নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল।"

আযীযে মেছের পড়ে গেলেন বিপাকে। কে সত্যবাদী তা নির্ণয় করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। ঠিক এ সময় আল্লাহ তায়ালা এক অলৌকিক অবস্থা করে দিলেন। ঐ পরিবারই অবস্থানরত একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ ও দার্শনিকসূলভ বাকশক্তি দান করলেন। দোলনার শিশুটি থেকে এ ধারণা করাই যায় না যে, সে এসব কর্মকা- দেখবে ও বুঝবে, আর তারপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। যে শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মুজিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুললো, যখন আযীযে মেছের ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত।

আল্লাহ তায়ালা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি করিয়েছেন। সে বললো, ইউসুফের জামাটি দেখ– যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে তবে যুলায়খার কথা সত্য, ইউসুফ মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছনে দিকে ছিন্ন থাকে তাহলে যুলায়খা মিথ্যুক আর ইউসুফ সত্যবাদী। কারণ, তাতে বুঝা যাবে যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম পলায়নরত ছিলেন। কিন্তু যুলায়খা তাকে পলায়নে বাধা দিতে চেয়েছিল। অতপর যখন শিশুর বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছনে দিকে ছিন্ন দেখ গেল, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

শিশুর মুখে যুক্তিভিত্তিক কথা শোনার সময়ই আযীযে মেছের বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফের পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইউসুফের জামাটি পেছনের দিকে ছেড়া দেখে বাদশাহ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে,

দোষ যুলায়খারই এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম পবিত্র, তখন তিনি যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললেন :

إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.

অর্থ : "এতো তোমাদের ষড়যন্ত্র; তোমাদের ষড়যন্ত্র খুবই জটিল।" (ইউসুফ : আয়াত-২৮)

বাদশাহ যুলায়খাকে ভর্ৎসনা করার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে বললো, "ইউসুফ! এটাকে উপেক্ষা করো"- অর্থাৎ যুলায়খার এ ষড়যন্ত্র ভুলে যাও- এটা বলাবলি করতে যেয়ো না, নয়তো বে-ইজ্জতী হতে থাকবে। তারপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বললো :

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ.

অর্থ : "তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, তুমিই তো অপরাধী" (ইউসুফ : আয়াত-২৯)

অর্থাৎ স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও, কারণ স্বামীর অবর্তমানে তুমি তারই অধিকারের খেয়ানত করেছো। অথবা ইউসুফের কাছে ক্ষমা চাও, কারণ নিজে দোষ করে তার উপর চাপিয়েছো। (মারেফুল কুরআন)

ইউসুফের প্রতি যুলায়খার আশক্তির বিষয়টি জনসমক্ষে রটে গেল। বিশেষত মহিলাদের মাঝে তা নিয়ে চলছিল বেশ কানাঘুষা। সে সমাজের মহিলাদের এ কানাঘুষার কথা যুলায়খার কানেও গেল। গোপনে যুলায়খার বিরুদ্ধে মহিলাদের কুৎসা রটনার খবর শুনে যুলায়খা এক ফন্দি আঁটলো। সে একদিন সেসব মহিলাকে ভোজসভায় আহ্বান করলো। মহিলাদের সামনে বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রী ও ফলমূল রাখা হলো। যেহেতু কিছু খাবার ছিল চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার। তাই প্রত্যেক মহিলাকে একটি করে চাকুও দেয়া হলো। মহিলারা খাবার কাটতে উদ্যত হচ্ছিল। এমন সময় যুলায়খা পাশের কক্ষ থেকে ইউসুফকে মহিলাদের সামনে হাজির করলো। মহিলারা ইউসুফকে দেখে তাঁর রূপ সৌন্দর্যে স্থির থাকতে পারলো না। তারা ইউসুফের প্রতি বিমোহিত হয়ে অপলকনেত্রে তাকিয়ে চাকু দিয়ে খাবারের পরিবর্তে নিজে নিজ হাত কেটে ফেললো। তারা হতভম্ব হয়ে বলতে লাগলো,

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

অর্থ : "হায় আল্লাহ! এতো মানুষ নয়, অবশ্যই তিনি একজন সম্মানিত ফেরেশতা।" অর্থাৎ এত সুন্দর নুরানী চেহারা মানুষের হতে পারে না।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩১)

যুলায়খা তখন মহিলাদের বললো, "দেখলে তো, এ-ই তো সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে (আমার দুর্নাম রটাতে) আসলে আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, কিন্তু সে পবিত্র রয়েছে। ভবিষ্যতে সে যদি আমার আদেশ অমান্য করে তাহলে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং লাঞ্ছিতও হবে।"

এ থেকে তদানীন্তন মিসরের উচ্চ ও অভিজাত সমাজে নৈতকতার অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল তা অনুমান করা যায়। একথা সুস্পষ্ট, আযীযের স্ত্রী যেসব মহিলাকে

দাওয়াত দিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই নগরের আমীর-উমরাহ ও বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের বেগমরাই ছিল। এসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভদ্র মহিলার সামনে সে নিজের প্রিয় যুবককে পেশ করলো। তার সুদর্শন যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ সুষমা দেখিয়ে সে তাদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো যে, এমন সুন্দর যুবকের জন্য যদি আমি পাগল না হয়ে যাই তাহলে আর কী হবো! তারপর এসব পদস্থ ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী-কন্যারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে যেন একথার সত্যতা প্রমাণ করলো যে, সত্যিই এ ধরনের অবস্থায় তাদের প্রত্যেকেই ঠিক তাই করতো যা আযীযের স্ত্রী করেছে। আবর অভিজাত মহিলাদের এ ভরা মজলিসে মেজবান সাহেবা প্রকাশ্যে এ সংকল্প ঘোষণা করতে একটুও লজ্জা অনুভব করলো না যে, যদি এ সুন্দর যুবক তার কামনার ক্রীড়নক হতে রাযি না হয়, তাহলে সে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। এ সবকিছুই একথা প্রমাণ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় অন্ধ অনুসারীরা আজ যে নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশাকে বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতার অবদান মনে করে থাকে তা আসলে কোনো নতুন জিনিস নয়, অনেক পুরাতন, প্রাচীন জিনিস। অতি প্রাচীনকালে দাকিয়ানুসের শাসনেরও বহুশত বছর আগে মিসরে ঠিক একই রকম শানশওকতের সাথে এর প্রচলন ছিল যেমন আজকের এ "প্রগতিশীলতার" যুগে আছে। সে সময় ইউসুফ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ আয়াতগুলো আমাদের সামনে তার একটি অদ্ভুত চিত্র তুলে ধরেছে। উনিশ বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবক। বেদুঈন জীবনের উদ্দামতায় লালিত বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহী। আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাস জীবন, দেশান্তর ও বলপূর্বক দাসত্বের পর্যায় অতিক্রম করার পর ভাগ্য তাকে দুনিয়ার বৃহত্তম সুসভ্য রাষ্ট্রের রাজধানীতে একজন উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদমর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে টেনে এনেছে। এখানে এ বাড়ির যে বেগম সাহেবার সাথে সকাল বিকাল তাকে উঠাবসা করতে হয় সে-ই প্রথমে তার পেছনে লাগে। তারপর তার সৌন্দর্যের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রে। সারা শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। এখন তার চতুর্দিকে সবসময় শত শত সুন্দর জাল বিছানা থাকে তাকে আটকাবার জন্য। তার ভাবাবেগকে উসকিয়ে দেবার এবং তার ধার্মিকতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার জন্য সব ধরনের কৌশল ও ফন্দি আঁটা হতে থাকে। তিনি যেদিকে যান সেদিকেই দেখতে পান পাপ তার সমস্ত চাকচিক্য ও মোহনীয়তা নিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে অসৎ ও অশালীন করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু এখানে সুযোগই তাকে খুঁজে ফিরছে এবং সবসময় ওঁৎ পেতে আছে যখনই তার মনে অসৎকাজের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকপ্রবণতা দেখা দেবে তখনই সে তার সামনে নিজেকে পেশ করে দেবে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তিনি এক মহা আতংকের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। কখনো মাত্র এক লহমার জন্য যদি তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পের বাঁধন সামান্যতম ঢিলে হয়ে যায় তাহলে পাপের যে অসংখ্য দরজা তার অপেক্ষায় হরহামেশা খোলা আছে তার যে কোনো একটির মধ্য দিয়ে তিনি ভেতরে

প্রবেশ করে যেতে পারেন। এ অবস্থায় এ আল্লাহ্ বিশ্বাসী যুবক যে সাফল্যের সাথে এসব শয়তানী প্ররোচণার মোকাবিলা করেছেন তা এমনিতেই কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এ সর্বোচ্চ মানের আত্মসংযমের পরিচয় দেবার পর আত্মোপলব্ধি ও চিন্তার বিশুদ্ধতারও তিনি চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এমন নজীরবিহীন পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও তাঁর মনে কখনো এ মর্মে অহমিকা জাগেনি যে, "বাহ্, কত মজবুত আমার চরিত্র! এতো সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা আমার প্রেমে পাগলপারা কিন্তু এরপরও আমার পদস্থলন হয়নি।" বরং এর পরিবর্তে তিনি নিজের মানবিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে উঠেছেন এবং অত্যন্ত দীনতার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন, হে আমার রব! আমি একজন দুর্বল মানুষ। এ অসংখ্য অগণিত প্ররোচণার মোকাবিলা করার শক্তি আমার কোথায়! তুমি আমাকে সহায়তা দান করো এবং আমাকে বাঁচাও। আমি ভয় করছি আমার পা পিছলে না যায় আসলে এটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সংযম ও চিন্তার ভারসাম্যের অসাধারণ গুণাবলি এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বেখবর ছিলেন। এ কঠোর পরীক্ষার যুগে এ গুণগুলো সবই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। এগুলো পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে থাকেলো। তিনি নিজেও জানতে পারলেন তাঁর মধ্যে কোন কোন শক্তি আছে এবং তাদেরকে তিনি কোন কোন কাজে লাগাতে পারেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর চারিত্রিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে জুলাইখার স্বীকারোক্তি

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْـَٔانَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ الصَّٰدِقِينَ.

অর্থ : একথায় বাদশাহ সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎকাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তোমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা কী ?" সবাই একবাক্যে বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! আমরা তার মধ্যে অসৎ প্রবণতার গন্ধই পাইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম, নিঃসন্দেহে সে একদম সত্যবাদী।"

(সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে 'আযীযে মেছের'-এর স্ত্রীই নয়; বরং সমাজের অন্যান্য মহিলারাও যে ইউসুফের চরিত্রের স্বচ্ছতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল সেকথা ফুটে উঠেছে। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, মিশর সম্রাটের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ইউসুফকে যে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলিয়েও কঠিন ষড়যন্ত্র করেও তাকে কাবু করতে পারলো না, অধিকন্তু সম্রাটের সামনে উল্টো ইউসুফের ঘাড়েই সমস্ত দোষ

চাপিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত মিশর সম্রাটও প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলো আর ইউসুফকে বললো বিষয়টি নিয়ে যেন নাড়াচাড়া না করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও লোক সমক্ষে স্ত্রীর মুখ বাচানোর জন্য ইউসুফকে জেলখানায় পাঠানো হলো। জেলখানায় তাঁকে বন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছিল দীর্ঘ আট-নয় বছর।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাথে আরও দুই যুবকও জেলখানায় আটক ছিল। দুই যুবকের দুটো স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য তারা ইউসুফকে অনুরোধ জানালো। তারা দীর্ঘদিনের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইউসুফকে অত্যন্ত সৎ, চরিত্রবান ও সুবিজ্ঞ জানতে পেরেছে বলে উভয়ে তাঁর কাছে নিজ নিজ স্বপ্নের তা'বীর জানতে চাইলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। ইতোমধ্যে তাদের একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী জেলখানা থেকে মুক্তিও পেয়ে গেলো।

একদিন মিশর সম্রাট দরবারের লোকদের ডেকে তার এক আশ্চর্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। লোকেরা বললো, "এটা তো একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের কথা আর আমরা তো স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত নই।" সে সময় ওখানে জেলখানা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকটিও উপস্থিত ছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়লো দীর্ঘদিনের জেলখানার সাথী ইউসুফের কথা এবং স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে তার বিজ্ঞতার কথা। সে বললো, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দেব, আমাকে একটু জেলখানায় ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিন। যুবকটি সভাসদকে ইউসুফের নির্ভুল স্বপ্নে তা'বীর জানার বিষয়েও অবহিত করেছিল।

যুবকটিকে জেলখানায় পাঠানো হলো। সে ইউসুফকে বাদশাহর স্বপ্নের বিষয় জানালে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহর স্বপ্নে ব্যাখ্যা বলে দিল। বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আস।" বাদশাহর পাঠানো লোক যখন ইউসুফের কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ দিল, তখন ইউসুফ তাকে বললেন, আগে তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে তার কাছ থেকে জেনে আসতো, ঐসব মহিলাদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটেছিল? নিশ্চয়ই আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন।"

এ খবর বাদশাহর কাছে গেলে তিনি সেসব মহিলাদের একত্র করে তাদের কাছ থেকে ইউসুফ সম্পর্কে তার চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

সম্ভবত শাহীমহলে এ মহিলাদেরকে ডেকে এনে এ জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল। আবার এও হতে পারে যে, বাদশাহ নিজের কোনো বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যাক্তিকে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এ স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন।

অনুমান করা যেতে পারে, এ স্বীকারোক্তিগুলো কীভাবে আট নয় বছর আগের ঘটনাবলিকে আবার নতুন করে তরতাজা করে দিয়েছিল, কীভাবে ইউসুফের ব্যক্তিত্ব কারাজীবনের দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পর আবার অকস্মাত বিপুলভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কীভাবে মিসরের সমস্ত অভিজাত, মর্যাদাশালী ও মধ্যবিত্ত সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বাইবেল ও

তালমূদের বরাত দিয়ে একথা বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সারা দেশের জ্ঞানীগুণী, আলেম ও পীরদের একত্র করেছিলেন এবং তারা সবাই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছিল। এরপর ইউসুফ -এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ফলে সারা দেশের জনতার দৃষ্টি আগে থেকেই তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তারপর বাদশাহ্র তলবনামা পেয়ে যখন তিনি জেলখানা থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করলেন তখন সমগ্র দেশবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এ আবার কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির উচ্চ মনোবল সম্পন্ন মানুষ, যাকে আট নয় বছরের কারাবাসের পর বাদশাহ নিজেই মেহেরবানী করে ডাকছেন এবং তারপরও তিনি ব্যাকুল চিত্তে দৌঁড়ে আসছেন না! তারপর যখন তারা ইউসুফের নিজের কারামুক্তির এবং বাদশাহ্র সাথে দেখা করতে আসার জন্য পেশকৃত শর্তাবলি শুনালো তখন সবার দৃষ্টি এ অনুসন্ধান ও তদন্তের ফলাফলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। এরপর যখন লোকেরা এর ফলাফল শুনলো তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বলে বাহ্‌বা দিল যে, আহা, এ ব্যক্তি কেমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন ও চরিত্রের অধিকারী! কাল যারা নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছিল আজ তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার পক্ষে তারাই সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সে সময় ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠার জন্য কেমন অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাদশাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময় ইউসুফ হঠাৎ কেমন করে তাকে দেশের অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করার দাবী জানিয়েছিলেন এবং বাদশাহ কেন নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন একথা আর মোটেই বিস্ময়কর মেনে না। ব্যাপার যদি শুধু এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো যে কারাগারের একজন বন্দী বাদশাহ্র একটি স্বপ্নের তা'বীর বলে দিয়েছিলেন তাহলে এ জন্য তিনি বড়জোর কোনো পুরস্কারের এবং কারাগার থেকে মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র এতটুকুন কথায় তিনি বাদশাহ্কে বলবেন, "আমাকে দেশের যাবতীয় অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করো" এবং বাদশাহ্ বলে দেবেন "নাও, সবকিছু তোমার জন্য হাযির"-এটা যথেষ্ট হতে পারতো না।

৮. সূরা আন নাহল (سُوْرَةُ النَّحْلِ)

আয়াত : ১২৮ রুকূ : ১৬ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

৬৮ নং আয়াতে 'নাহল' শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। 'নাহল' মানে মৌমাছি। সূরার আলোচ্য বিষয় মৌমাছি নয়।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার কয়েকটি আয়াত থেকে এর নাযিলের সময় সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪১ নং আয়াত থেকে জানা যায়, এর আগেই যুলুম-অত্যাচরে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুসংখ্যক সাহাবী হিজরত করে আফ্রিকার হাবশায় (বর্তমান ইরিত্রিয়ায়) চলে গিয়েছিলেন।

১০৬ নং আয়াতের থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম-নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কী হবে।

১১২-১১৪ আয়াত থেকে পরিষ্কার এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, নবী ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সূরার ১১৫ আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ আয়াতে এ সূরার ১১৮ আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরা দুটির নাযিলের মাঝখতানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিল।

এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরটিও মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। সূরার সাধারণ বর্ণনাভঙ্গীও একথা সমর্থন করে।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে সপ্রমাণ করা, নবীর আহবানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনার ধরন

কোনো ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন ? তাদের এ কথাটি বারবার বলার

কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এ জন্য হৈ চৈ করো না; বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এরপর সাথে সাথেই বুঝবার জন্য ভাষণ দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক একাধিকবার সামনে আসতে শুরু করেছে।

১. হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য- প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।
২. অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।
৩. মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যে মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।
৪. মুহাম্মাদ ﷺ যে জীবন ব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যে সব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয়; বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।
৫. নবী ﷺ ও তাঁর সংগী-সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সাথে সাথে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কী হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে মন খারাপ করা বৈধ নয়

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ . يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

অর্থ : যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এ দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে ? দেখো, কেমন খারাপ কথা যা এরা আল্লাহর ওপর আরোপ করে।

(সূরা আন নাহল : আয়াত : ৫৮-৫৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে রাসূলের সময়ে আরবের মুশরিকদের কতিপয় ভ্রান্ত চিন্তা আচরণের মধ্যে একটির উল্লেখ্য করা হয়েছে। আর তাহল যখন তাদের কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ার খবর পিতার কানে পৌছতো, তখন পিতার চেহারা কালো হয়ে যেতো, রাগে ও ক্ষোভে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো আর সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতো। এর গ্লানির কারণে সে তার কওম থেকে আত্মগোপন করতো– সমাজের লোকদের মুখ দেখাব কীভাবে– এ ছিল তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। মেয়ে বড় হলে তাকে অন্য কোনো ছেলের কাছে বিয়ে দিতে হবে ভেবে সে লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়তো। এ হীনতা সত্ত্বেও সে কন্যাটাকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে– এ ছিল তার দুঃচিন্তা।

যে কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য এত বেশি লজ্জাজনক মনে করে থাকে, সেই কন্যা সন্তানকে আল্লাহর জন্য মনোনীত করতে তাদের কোনোই দ্বিধা হয় না। অথচ আল্লাহর আদৌ কোনো সন্তান থাকতে পারে এরূপ ধারণা করা একটি মহামূর্খতা ও চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব মুশরিকদের এ কর্মনীতিকে এখানে একটি বিশেষ দিক দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সম্পর্কে তাদের নিম্নমুখী চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং তাদেরকে একথা বলে দেয়া যে, মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহর ব্যাপারে তাদেরকে দুঃসাহসী ও ঔদ্ধত্যশালী বানিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা এতই বিকারগ্রস্ত ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে যে, এ ধরনের কথা বলা তারা একটুও দোষণীয় মনে করে না।

জাহেলী যুগের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আধুনিক যুগেও বিরাজমান রয়েছে। হয়তো ধরন কিছুটা পাল্টিয়েছে। তখনকার যুগ কেবল কন্যার জন্ম হওয়াকে গ্লানী ও অপমানকর মনে করা হতো কিন্তু আজকের বিশ্বের উন্নয়নমুখী দেশে তো সন্তানের আগমনকেই অসহনীয় ভাবা হচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, অধিক সন্তানের পরিবারকে সর্বাদিক থেকে নাজেহাল হতে দেখা যায়। পাশাপাশি একটি সন্তান পাওয়ার জন্যেও তো অনেক দম্পতিকে পাগলপারা হয়ে ঘুরতে দেখা যায়। আসল কথা, মানুষতো ব্যাষ্টিক (Micro) দৃষ্টি কোণ থেকে চিন্তা করে থাকে, আর আল্লাহর তো রয়েছে মহা সামষ্টিক (Super Macor) দৃষ্টি কোণ। বিশ্বসমাজে দেখা যায় প্রাচুর্যের দেশ (Aflucnt Country) বলে কথিতরা উন্নয়নমুখী জাতি (Developing Nations) সমূহকে জন্মনিরোধের সবক দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের দেশে ব্যাপক হারে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে অন্য দেশের জনসমষ্টিকে! আবার সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন চলছে নারী অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অধিকার-মর্যাদা তো সেই সত্তাই নির্ধারণ করতে পারেন যিনি সৃষ্টি করে লালনপালন করেছেন। অন্য কারো পক্ষে তা আদৌ সম্ভব হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ইসলামী জীবন বিধান বিশ্বের বুকে নারী মুক্তির ব্যবস্থা করেছে, সেই জীবন বিধানকে তো কেউ কেউ নারী মুক্তির অন্তরায় ভাবছে। এই হচ্ছে এদের ইসলাম সম্পর্কে চরম মূর্খতা অথবা জেনেবুঝে ইসলামদ্রোহীতার আত্মঘাতী ভূমিকা।

সৎকাজের বিনিময়ে মুমিন নারী-পুরুষ লাভ করবে পবিত্র জীবন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করব এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে। (সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে মু'মিন ও কাফের উভয় দলের এমন সব সংকীর্ণচেতা ও সেসব লোকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে, যারা মনে করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার পথ অবলম্বন করলে মানুষের পরকালে সাফল্য অর্জিত হলেও তার পার্থিব জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের জবাবে আল্লাহ্ বলছেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে শুধু পরকালীন জীবনই সুগঠিত হয় না, দুনিয়াবী জীবনও সুখী সমৃদ্ধিশালী হয়। যারা প্রকৃত পক্ষে ঈমানদার, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও সৎ তাদের পার্থিব জীবন ও বেঈমান ও অসৎকর্মশীল লোকদের যে প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যেসব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম সাফল্য তারা লাভ করে থাকেন তাও অন্যেরা লাভ করতে পারে না। কারণ অন্যদের প্রতিটি সাফল্য হয় নোংরা ও ঘৃণিত পদ্ধতি অবলম্বনের ফসল। সৎলোকেরা ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করেও যে মানসিক প্রশান্তি ও চিন্তার স্থৈর্য লাভ করেন তার সামন্যতম অংশও প্রাসাদবারী বেঈমান দুষ্কৃতিকারী লাভ করতে পারে না।

আখেরাতে তাদের মর্যাদা তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছোট বড় সব রকমের সৎ কাজ করে থাকবে তাকে তার সবচেয়ে বড় সৎকাজের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম মর্যাদা দান করা হবে।

৯. সূরা বনী ইসরাঈল বা ইসরা (سُوْرَةُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ إِسْرَاءِ)

আয়াত : ১১১ রুকু : ১২ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

চার নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ 'বনী ইসরাঈল' শব্দদ্বয় থেকে এ নাম গৃহীত হয়েছে। বনী ইসরাঈল এই সূরার আলোচ্য বিষয় নয়; বরং এ নামটিও কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো প্রতীক হিসেবেই রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদীস ও সীরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরাতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ সূরাটি নবী ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

পটভূমি

নবী ﷺ তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করার পর তখন ১২ বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পথ রুখে দেবার জন্য তাঁর বিরোধীরা সব রকমের চেষ্টা করে দেখছিল। তাতে সকল প্রকার বাধা বিপত্তির দেয়াল টপকে তাঁর আওয়াজ আরবের সমস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আরবের এমন কোনো গোত্র ছিল না যার দু'চারজন লোক তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়নি। মক্কাতেই আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদের এমন একটি ছোট্ট দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা এ সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি বিপদ ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় শক্তিশালী আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির বিপুল সংখ্যক লোক তার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল এখন তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে বিক্ষিপ্ত মুসলমানদেরকে এক জায়গায় একত্র করে ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং অতিশীঘ্রই তিনি এ সুযোগ লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

এহেন অবস্থায় মি'রাজ সংঘটিত হয়। মি'রাজ থেকে ফেরার পর নবী ﷺ দুনিয়াবাসীকে এ পয়গাম শুনান।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় সতর্ক করা, বুঝানো ও শিক্ষা দেয়া এ তিনটি কাজই একটি আনুপাতিক হারে একত্র করে দেয়া হয়েছে।

সতর্ক করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল ও অন্য জাতিদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর দেয়া যে অবকাশ খতম হবার সময় কাছে এসে গেছে তা শেষ হবার আগেই নিজেদেরকে সামলে নাও।

মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা গ্রহণ করো। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে দুনিয়ায় আবাদ করা হবে। তাছাড়া হিজরাতের পর যে বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই অহী নাযিল হতে যাচ্ছিল পরোক্ষভাবে তাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমে যে শাস্তি তোমরা পেয়েছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পর তোমরা যে সুযোগ পাচ্ছো তার সদ্ব্যবহার করো। এ শেষ সুযোগটিও যদি তোমরা হারিয়ে ফেলো এবং এরপর নিজেদের পূর্বতন কর্মনীতির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি আসলে কোন কোন জিনিসের ওপর রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। তাওহীদ, পরকাল, নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে এ মৌলিক সত্যগুলোর ব্যাপারে যেসব সন্দেহ-সংশয় পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। দলীল-প্রমাণ পেশ করার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অস্বীকারকারীদের অজ্ঞতার জন্য তাদেরকে ধমকানো ও ভয় দেখানো হয়েছে।

শিক্ষা দেবার পর্যায়ে নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এমনসব বড় বড় মূলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর ওপর জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। এটিকে ইসলামের ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে আরববাসীদের সামনে এটি পেশ করা হয়েছিল। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটি একটি নীল নকশা এবং এ নীল নকশার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ﷺ নিজের দেশের মানুষের এবং তারপর সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন গড়ে তুলতে চান।

এসব কথার সাথে সাথেই আবার নবী ﷺকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, সমস্যা ও সংকটের প্রবল ঘূর্ণবর্তে মজবুতভাবে নিজের অবস্থানের ওপর টিকে থাকো এবং কুফরীর সাথে আপোশ করার চিন্তাই মাথায় এনো না। তাছাড়া মুসলমানরা যাদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম, নিপীড়ন, কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে উঠতো, তাদেরকে ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকার এবং প্রচার ও সংশোধনের কাজে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আত্ম সংশোধন ও আতসংযমের জন্য তাদেরকে নামাযের ব্যবস্থাপত্র দেয়া যেসব উন্নত গুণাবলিতে বিভূষিত হওয়া উচিত তেমনি ধরনের গুণাবলীতে ভূষিত করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, এই প্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুসলমানদের ওপর নিয়মিতভাবে ফরয করা হয়।

দাসত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

অর্থ : তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে “উহ্” পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না; বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতাসহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত : ২৩-২৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মানব জাতির শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য কীসে ও কীভাবে– তা একমাত্র সে সত্তাই ভাল জানেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে লালন-পালন করেন। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে তার জীবনের চলার পথও বাতলে দিয়েছেন। আল কুরআনই হচ্ছে আল্লাহর সেই পথনির্দেশিকা। আর এরই বাস্তবায়ন পদ্ধতি হচ্ছে রাসূলের সুন্নাহ। আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির জন্যে দুটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

১. মানবজাতি তাদের রব আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করবে না।

২. মানুষ নিজ নিজ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা-উপাসনা করো না; বরং এ সঙ্গে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করো না। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয়; বরং নবী ﷺ মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়াত এ রাজ্যের আইন।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার প্রতি আদব-সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদাতের সাথে একত্রিত করে ফরয করে দিয়েছেন। যেমন সূরা লুকমানে নিজের শোকরের সাথে মাতা-পিতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর করো আর পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ওয়াজিব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন, সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলো, এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। (মাআরেফুল কুরআন-কুরতুবী থেকে)

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের সেবাযত্নের বিষয়ে মুফতী শফী রহ. তাঁর তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বেশ কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি সেগুলো নিয়েছেন তাফসীরে মাযহারী থেকে। এখানে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো–

১. বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দুটো দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দুটো দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্যে একজনকে পায় তবে জান্নাত বা জাহান্নামের একটি দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, জাহান্নামের এ শাস্তি বাণী কি তখনো প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা তার প্রতি যুলুম করেন? তিনি তিনবার বললেন, যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যুলুমও করেন, তবুও পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।

   একথার সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলেও সন্তান তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

২. বায়হাকী ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে সেবা-যত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতের বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব পায়।" লোকেরা আরয করলো, "সে যদি দিনে একশবার এভাবে দৃষ্টিপাত করে?" তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশবার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে।"

৩. বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকল গোনাহর শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও দেয়া হয়।

সন্তান হত্যা ও ব্যভিচার মারাত্মক অপরাধ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

অর্থ : দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ। যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত : ৩১-৩২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার র্নিদেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের স্বল্পতার আশঙ্কায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্ত্বাধীন নয়; বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে; বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোনো ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

"যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবে না; বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যোগ আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক

পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর সেই সাথে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং এ যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।

আকজের বিশ্বে মুসলিম সমাজ নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিতে এবং এজন্যে অহংকার করতে কসুর করে না ঠিক; কিন্তু ইসলামী জীবন বিধান তথা কুরআন সুন্নাহর আইন দৈনন্দিন জীবন এবং সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করার ব্যাপারে চরম গাফলাতিতে নিমজ্জিত। তাদের অনেকে এ বিয়য়টিকে দুনিয়াদারী মনে করে থাকে। অনেক মুখলেছ ব্যক্তিও দীনকে ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েই সন্তুষ্ট। অধিকন্তু কোনো ব্যক্তি বা দল যদি দীনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা করতে দাওয়াত দেয় তখন এরাই তাদের বিরোধিতায় মেতে উঠে। বস্তুত দীনকে যথার্থ না বুঝার কারণে অধিকাংশ মানুষ এমনটি করে থাকে। অবশ্য কিছু লোক অহমিকায় ও হঠকারিতায় মত্ত হয়েও এরূপ করে থাকে। প্রথমে বর্ণিতরা নিজেদেরকে সুন্নাতের পা-বন্দ আমল ও কার্যক্রমে খুব তৃপ্তি পায়, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদার আমল ও কার্যক্রম জেনে তা অনুসরণ করতে রাজি না। সূরা বনী ইসরাঈলের আলোচ্য আয়াত দুটো যেন আজকের তথাকথিত মুসলমানদের শিক্ষা নিতে ডাকছে।

১০. সূরা মারইয়াম (سُوْرَةُ مَرْيَمَ)

আয়াত : ৯৮ রুকূ : ৬ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরাটির ১৬ নং আয়াতের 'মারইয়াম' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সূরা যার মধ্যে মারইয়ামের কথা বলা হয়েছে। তবে মারইয়ামের কাহিনী এর আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিলের সময়

নবুয়তের পঞ্চম বছরে একদল সাহাবীর হাবশায় হিজরতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদরকে যখন হাবশায় শাসক নাজ্জাশীর দরবারে ডাকা হয় তখন জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তেলাওয়াত করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কুরাইশ সরদাররা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং ভয়-ভীতি ও মিথ্যা অপবাদের ব্যাপক প্রচার করে ইসলামী আন্দোলনকে দমাতে পারলো না তখন তারা জুলুম-নিপীড়ন, মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের নওমুসলিমদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতে থাকলো। তাদেরকে বন্দী করে, তাদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে, তাদেরকে অনাহারে রেখে এমনকি কঠোর শারীরিক নির্যাতনের যাঁতাকালে নিষ্পেষিত করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। এই নির্যাতনে ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হলো বিশেষ করে গরীব লোকেরা এবং দাস ও দাসত্বের বন্ধনমুক্ত ভৃত্যরা। এসব মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম কুরাইশদের আশ্রিত ও অধীনস্থ ছিল। যেমন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আমের ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে 'উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পিতামাতা প্রমুখ সাহাবীগণ। এদেরকে মেরে মেরে আধমরা করা হলো। কক্ষে আবদ্ধ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হলো। মক্কার প্রখর রোদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর তাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতে থাকলো। বুকের ওপর প্রকা- পাথর চাপা অবস্থায় সেখানে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে থাকলো। যারা পেশাজীবী ছিল তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে পারিশ্রমিক দেবার ব্যাপারে পেরেশান করা হতে থাকলো।

বুখারী ও মুসলিমে খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রেওয়াতে বলা হয়েছে, "আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইবনে ওয়ায়েল আমার থেকে কাজ করিয়ে নিল। তারপর যখন আমি তার কাছে মজুরী আনতে গেলাম, সে বললো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকার করবে না ততক্ষণ আমি তোমার মজুরী দেবো না"।

এভাবে যারা ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসা নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো হতো। যারা সমাজে কিছু মানমর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে সর্বপ্রকারে অপমানিত ও হেয় করা হতো। এই যুগের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম "হে আল্লাহর রাসূল! এখন তো জুলুম সীমা ছড়িয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না?" একথা শুনে তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদের ওপর এর চেয়ে বেশি জুলুম নিপীড়ন হয়েছে। তাদের হাড়ের ওপর লোহার চিরুনী চালানো হতো। তাদেরকে মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো। তারপরও তারা নিজেদের দীন ত্যাগ করতো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এ কাজটি সম্পন্ন করে ছাড়বেন, এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং তার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো"। (বুখারী)

অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নবুয়তের পঞ্চম বছরের শেষ দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণকে পরামর্শ দিলেন, "তোমরা হাবশায় চলে গেলে ভালো হয়। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজ্যে কারো প্রতি জুলুম হয় না। সেটি কল্যাণের দেশ। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ দূর করে দেন ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান করবে"।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বক্তব্যের পর প্রথমে এগারো জন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশার পথে রওয়ানা হন। কুরাইশের লোকেরা সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শু'আইবা বন্দরে তাঁরা যথাসময়ে হাবশায় যাওয়ার নৌকা পেয়ে যান। এভাবে তারা গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর কয়েক মাস পরে আরো কিছু লোক হিজরত করেন। এভাবে ৮৩ জন পুরুষ; ১১ জন মহিলা ও ৭ জন অ-কুরাইশী মুসলমান হাবশায় একত্র হয়ে যায়। এ সময় মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মাত্র ৪০ জন মুসলমান থেকে গিয়েছিলেন।

হিজরতের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কারণ কুরাইশদের ছোট বড় পরিবারগুলোর মধ্যে এমন কোনো পরিবারও ছিল না যার কোনো একজন এ মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিল না। কারোর ছেলে, কারোর জামাতা, কারোর মেয়ে, কারোর ভাই এবং কারোর বোন এই দলে ছিল। এই দলে ছিল আবু জেহেলের ভাই সালামাহ ইবনে হিশাম, তার চাচাত ভাই হিশাম ইবনে আবী হুযাইফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আহ এবং তার চাচাত বোন, উম্মে সালামাহ, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ, উতবার ছেলে ও কলিজা ভক্ষণকরিণী হিন্দার সহোদর ভাই আবু হুযাইফা এবং সোহাইল ইবনে আমেরের মেয়ে সাহলাহ। এভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও ইসলামের সুপরিচিত শত্রুদের ছেলে মেয়েরা ইসলামের জন্য স্বগৃহ ও আত্মীয় স্বজনদের

ত্যাগ করে বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। তাই এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গৃহও ছিল না। এ ঘটনার ফলে অনেক লোকের ইসলাম বৈরিতা আগের চেয়ে বেড়ে যায়। আবার অনেককে এ ঘটনা এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম বৈরিতার ওপর এ ঘটনাটিই প্রথম আঘাত হানে। তাঁর একজন নিকট আত্মীয় লাইলা বিনতে হাশ্মাহ বর্ণনা করেন, আমি হিজরত করার জন্য নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম এবং আমার স্বামী আমের ইবনে রাবী'আহ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় উমর এলেন এবং দাঁড়িয়ে আমার ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, "আবদুল্লাহর মা! চলে যাচ্ছো?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছো। আল্লাহর পৃথিবী চারদিকে উন্মুক্ত, এখন আমরা এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তি ও স্থিরতা দান করবেন"। একথা শুনে উমরের চেহারায় এমন কান্নার ভাব ফুটে উঠলো, যা আমি তার মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি কেবল এতটুকু বলেই চলে গেলেন যে, "আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন"।

হিজরতের পরে কুরাইশ সরদাররা এক জোট হয়ে পরামর্শ করতে বসলো। তারা স্থির করলো, আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবী'আহ (আবু জাহেলের বৈপিত্রেয় ভাই) এবং আমর ইবনে আসকে মূল্যবান উপঢৌকন সহকারে হাবশায় পাঠানো হবে। এরা সেখানে গিয়ে এই মুসলমান মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাবার জন্য হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশীকে সম্মত করাবে। উম্মুল মু'মিনীন সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা (নিজেই হাবশার মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিলেন) এ ঘটনাটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কুরাইশদের এই দু'জন কূটনীতি বিশারদ দূত হয়ে আমাদের পিছনে পিছনে হাবশা পৌঁছে গেলো। প্রথমে নাজ্জাশীর দরবারের সভাসদদের মধ্যে ব্যাপকহারে উপঢৌকন বিতরণ করলো। তাদেরকে এই মর্মে রাযী করালো যে, তারা সবাই মিলে এক যোগে মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য নাজ্জাশীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তারপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে মহামূল্যবান নযরানা পেশ করার পর বললো, "আমাদের শহরের কয়েকজন অবিবেচক ছোকরা পালিয়ে আপনার এখানে চলে এসেছে। জাতির প্রধানগণ তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানাবার জন্য আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এই ছেলেগুলো আমাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে এবং এরা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি; বরং তারা একটি অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে"। তাদের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরবারের চারদিক থেকে এক যোগে আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো "এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের দোষ সম্পর্কে এদের জাতির লোকেরাই ভালো জানে। এদেরকে এখানে রাখা ঠিক নয়"। কিন্তু নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বললেন, "এভাবে এদেরকে আমি তাদের হাতে সোপর্দ করে দেবো না। যারা অন্যদেশ ছেড়ে আমার দেশের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে এবং এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। প্রথমে আমি

এদেরকে ডেকে এই মর্মে অনুসন্ধান করবো যে, তারা এদের ব্যাপারে যা কিছু বলছে সে ব্যাপারে আসল সত্য ঘটনা কী"? অতঃপর নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

নাজ্জাশীর বার্তা পেয়ে মুহাজিরগণ একত্র হলেন। বাদশাহর সামনে কী বক্তব্য রাখা হবে তা নিয়ে তারা পরামর্শ করলেন। শেষে সবাই একজোট হয়ে ফায়সালা করলেন, নবী ﷺ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই হুবহু কোনো প্রকার কম বেশি না করে তাঁর সামনে পেশ করবো, তাতে নাজ্জাশী আমাদের থাকতে দেন বা বের করে দেন তার পরোয়া করা হবে না। দরবারে পৌঁছার সাথে সাথেই নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এটা কী করলে, নিজেদের জাতির ধর্মও ত্যাগ করলে আবার আমার ধর্মেও প্রবেশ করলে না, অন্যদিকে দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মও গ্রহণ করলে না?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ থেকে জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি প্রথমে আরবীয় জাহেলীয়াতের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক দুষ্কৃতির বর্ণনা দেন। তারপর নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি কী শিক্ষা দিয়ে চলেছেন তা ব্যক্ত করেন। তারপর কুরাইশরা নবীর ﷺ আনুগত্য গ্রহণকারীদের ওপর যেসব জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো বর্ণনা করেন এবং সবশেষে একথা বলে নিজের বক্তব্যের উপসংহার টানেন যে, আপনার দেশে আমাদের ওপর কোনো জুলুম হবে না এই আশায় আমরা অন্য দেশের পরিবর্তে আপনার দেশে এসেছি"। নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর ওপর যে কালাম নাযিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী করেছো তা একটু আমাকে শুনাও তো দেখি। জবাবে জাফর সূরা মারইয়ামের গোড়ার দিকের ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু শুনালেন। নাজ্জাশী তা শুনেছিলেন এবং কেঁদে চলছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। যখন জাফর তেলাওয়াত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, "নিশ্চিতভাবেই এ কালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম যা কিছু এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবো না"।

পরদিন আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীকে বললো "তাদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন, ঈসা ইবনে মারইয়ামের সম্পর্কে তারা কী আকীদা পোষণ করে? তাঁর সম্পর্কে তারা একটা মারাত্মক কথা বলে? নাজ্জাশী আবার মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরের চালবাজীর কথা মুহাজিররা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তারা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী যদি ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাহলে তার কী জবাব দেয়া যাবে। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক ছিল। এ জন্য সবাই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু তবুও রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীগণ এই ফায়সালাই করলেন যে, যা হয় হোক, আমরা তো সেই কথাই বলবো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শিখিয়েছেন। কাজেই যখন তারা দরবারে গেলেন এবং নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসের প্রশ্ন তাদের

সামনে রাখলেন তখন জা'ফর ইবনে আবু তালেব উঠে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বললেন, "তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ ও একটি বাণী, যা আল্লাহ কুমারী মারইয়ামের নিকট পাঠান"।

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বললে ঈসা তার থেকে এই তৃণখণ্ডের চাইতেও বেশি কিছু ছিলেন না"। এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সমস্ত উপঢৌকন এই বলে ফেরত দিয়ে দিলেন যে, "আমি ঘুষ নিই না এবং মুহাজিরদেরকে বলে দিলেন, তোমরা পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করতে থাকো"।

আলোচ্য বিষয় ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখে যখন আমরা এ সূরাটি দেখি তখন এর মধ্যে সর্ব প্রথম যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে আসে সেটি হচ্ছে এই যে, যদিও মুসলমানরা একটি মজলুম শরণার্থী দল হিসেবে নিজেদের স্বদেশভূমি ত্যাগ করে অন্যদেশে চলে যাচ্ছিল তবুও এ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সামান্যতম আপোস করার শিক্ষা দেননি; বরং চলার সময় পাথেয় স্বরূপ এ সূরাটি তাদের সাথে দেন, যাতে ঈসায়ীদের দেশে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের একেবারে সঠিক মর্যাদা তুলে ধরেন এবং তাঁর আল্লাহর পুত্র হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন।

প্রথম দু'রুকূ'তে ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনী শুনাবার পর আবার তৃতীয় রুকূতে সমকালীন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইবরাহীমের (আলাইহিস সালাম) কাহিনী শুনানো হয়েছে। কারণ এ একই ধরনের অবস্থায় তিনিও নিজের পিতা, পরিবার ও দেশবাসীর জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আজ হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীমের পর্যায়ে রয়েছে এবং তোমরা রয়েছো সেই জালেমদের পর্যায়ে যারা তোমাদের পিতা ও নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে গৃহত্যাগী করেছিল। অন্যদিকে মুহাজিরদের এ সুখবর দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন স্বদেশ ত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি; বরং আরো অধিকতর মর্যাদাশীল হয়েছিলেন তেমনি শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর চতুর্থ রুকূতে অন্যান্য নবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দীনের বার্তা বহন করে এনেছেন সকল নবীই সেই একই দীনের বার্তাবহ ছিলেন। কিন্তু নবীদের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতগণ বিকৃতির শিকার হতে থেকেছে। আজ বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে যেসব গোমরাহী দেখা যাচ্ছে এগুলো সে বিকৃতিরই ফসল।

শেষ দু'রুকূতে মক্কার কাফেরদের ভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং কথা শেষ করতে গিয়ে মু'মিনদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সত্যের শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরা জনগণের প্রিয় ভাজন হবেই।

কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলের সতী-স্বাধ্বী নারী মারইয়াম

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا. يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا.

অর্থ : অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলো; তারা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। 'হে হারূন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।'

(সূরা মারইয়াম : আয়াত : ২৭-২৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াত দুটোতে মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের ফলে মারইয়াম সমাজের লোকদের দ্বারা যে তিরস্কৃত হয়েছিলেন সে কথাগুলো বিবৃত হয়েছে। বিষয়টি সূরা মারইয়ামের দ্বিতীয় রুকূ'র ১৬ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাত তায়ালা নবী করীম ﷺ-কে বলেছেন, এ কিতাব মারইয়ামের কাহিনী বর্ণনা করো। সূরা আলে মারইয়ামকে বায়তুল মাকদাসে ইবাদাতে বসিয়ে দিলেন। মারইয়ামের খালু যাকারিয়া (আ) থেকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিলেন। এক সময় মারইয়াম নিজের লোকজন থেকে পূর্বদিকে গোসলের জন্য গেলেন এবং পর্দা করে নিলেন। আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল আমীনকে মারইয়ামের কাছে পাঠালেন। জিবরাঈল পূর্ণ মানবকৃতিতে মারইয়ামের সামনে উপস্থিত হলেন। মারইয়াম ভয় পেয়ে গেলেন আর বললেন, আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাই তোমার থেকে, যদি তুমি তাকওয়াবান লোক হও। জিবরাঈল বললেন, আমি তোমার রবের প্রেরিত দূত। আমি এসেছি তোমাকে একটি পবিত্র ছেলে দান করতে। (ভয় করো না, আমি তো মানুষ নই) এতে মারইয়াম কিছুটা নিশ্চিত হয়ে বললেন, "আমার ছেলে হবে কীভাবে? যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আর আমি চরিত্রহীনরাও নই।" ফেরেশতা বললেন, "এভাবেই হবে।" (একথাটি যাকারিয়াকেও বলা হয়েছিল)। তোমার রব বলেছেন এটা তো আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, একে মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন হিসেবে বানাব এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত বানিয়ে রাখব। এটা (পিতা ছাড়া ছেলে তৈরি করা ঈসাকে সৃষ্টি করা) তো একটা স্থিরকৃত কাজ। এ কথোপকথন চলছিল, হঠাৎ মারইয়ামের গ্রীরাদেশ থেকে কাপড় একটু সরে গেলে জিবরাইল তাঁর বুকের উপরিভাগের উম্মুক্ত স্থানে ফুঁ দিলেন আর পুত্র সন্তানের ভ্রূণ তাঁর গর্ভে সঞ্চারিত হলো। অতঃপর মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণ অনুভব করলেন তখন তিনি গর্ভসহ দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।

তারপর প্রসবের সময় হলে যখন মারইয়াম-এর প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। যাতে করে তিনি গাছের উপর ভর দিয়ে উঠা-নামা করতে পারেন। এ সময় তাঁর কোনো সঙ্গী-সাথী ছিল না। অথচ তিনি ছিলেন

প্রসব ব্যথায় অস্থির। সে সময় আরাম ও দরকারী যেসব উপকরণ কাছে থাকা উচিত ছিল, তার কিছুই তাঁর কাছে ছিল না। তাছাড়া সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশঙ্কাও তাঁর মনকে অস্থির করে রেখেছিল। সেই কঠিনতম মুহূর্তে মারইয়াম দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কত অসহায় ছিলেন তা ভুক্তভোগী নারীরাই বুঝতে পারেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন –

يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا.

অর্থ : "হায়, আমি যদি এ অবস্থার আগেই মরে যেতাম আর আমার নামনিশানাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতো!" (সূরা : মারইয়াম : আয়াত-২৩)

এমতাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল ﷺ সেখানে পৌছে নিম্মভূমিতে অবস্থান নিলেন। তিনি নিম্নস্থান থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, তুমি দুঃখ ও চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার পাদদেশে একটি নহর বা ঝরনা প্রবাহিত করে দিয়েছেন, আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে। সন্তান প্রসবের পর মারইয়াম ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লে রাব্বুল আলামীন তাঁর খাদ্য হিসেবে এ সবের ব্যবস্থা করে দিলেন। শুকনো খেজুর গাছ তাজা হয়ে গেল এবং পাকা খেজুর দেখা দিল। আর পায়ের নিচে ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা মারইয়ামকে বললেন, তুমি খাও, পান করো, আর চোখ শীতল করো। অর্থাৎ খেজুর খেয়ে ক্ষুধা মিটাও, ঝরনার পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করো আর পুত্রকে দেখে ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার কারণে চক্ষু শীতল করো এবং আনন্দিত থাক। বাকি দুর্নামের সমাধান হলো, যখনই কোনো মানুষ তোমার ছেলে দেখে তোমাকে প্রশ্নের সম্মুখিন করে তখন তুমি নিজে কোনো জবাব দিবে না, ইঙ্গিতে বলবে আমি রহমান আল্লাহর জন্য রোযা রেখেছি, তাই কারো সাথে কথা বলবো না, আর বাচ্চার দিকে ইশারা করে তার কাছে জবাব শুনতে বলবে। দেখবে নবজাত শিশু আল্লাহর হুকুমে অস্বাভাবিকভাবে কথা বলে জবাব দিবে। এভাবে তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রমাণ প্রকাশিত হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে মারইয়াম যে বলেছিলেন, "হায়! আমি যদি এ অবস্থার আগেই মরে যেতাম আর আমার নামনিশাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতো!" এ শব্দগুলো থেকেই বুঝা যায় মারইয়াম কত জটিল অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন, কত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবস্থার নাজুকতা অনুধাবন করতে পারলে সবাই বুঝতে পারবেন, তাঁর মুখে এসব শব্দ কেবল প্রসব বেদনার কারণেই উচ্চারিত হয়নি। বরং এ চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল যে, আল্লাহ তাঁকে যে মারাত্মক ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিলেন, তা থেকে তিনি মান-সম্মান নিয়ে কীভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। সমাজে তিনি কীভাবে সসম্মানে ঠাঁই পাবেন। এতদিন তো গর্ভকে লোক চক্ষুর আড়ালে কোনোভাবে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু এখন এ বাচ্চাকে কোথায় কীভাবে লুকিয়ে রাখবেন।

শেষ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে মারইয়ামের ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম পিতা ছাড়া কেবল মাতা থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। জনমানবশূন্য ময়দানে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে মারইয়াম সন্তান প্রসব করলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে বাঁচলেন আর মানুষের তোহমত থেকে বাঁচার পথও আল্লাহ পাক বলে দিলেন। বলে দিলেন , বাচ্চা সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের জবাবে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তার জন্ম সম্পর্কে যে কেউই প্রশ্ন তুলবে তার জবাব দানের ব্যবস্থা করা আমার দায়িত্ব। উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের সমাজে চুপ থাকার রোযা রাখার রেওয়াজ ছিল।

মারইয়াম নবজাত সন্তান ঈসাকে নিয়ে লোকালায় এলে লোকেরা তাজ্জব হয়ে তাকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন করলো। তাদের প্রশ্নগুলোর সারকথা ছিল এই যে, যার গোটা পরিবারই অত্যন্ত পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাসের কথা! মারইয়াম এসব প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সদ্যজাত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। ইশারায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে যা কিছু বলার ও জিজ্ঞেস করার আছে তা এ শিশুকেই জিজ্ঞেস করো। তার কাছেই তোমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলোর জবাব পাবে। লোকেরা মনে করলো মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে। তাই তারা বললো ওতো কেবল কোলের শিশু মাত্র। তার সাথে আমরা কীভাবে কথা বলবো? সহসা সেই নবজাত সন্তান কোলের শিশু ঈসা বলে উঠলেন, "আমি আল্লাহর বান্দাহ। আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন। আর তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকবো। তিনি আমাকে মায়ের অনুগত বানিয়েছেন, আমাকে স্বৈরাচারী ও হতভাগ্য দুচ্চরিত্র বানাননি। আর আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন মরে যাব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে উত্থিত হবো।"

আল কুরআন ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মবৃত্তান্ত এভাবে বর্ণনা করার পর ঘোষণা করেছে :

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ . مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۗ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

অর্থ : "এ হলো মারইয়াম পুত্র ঈসার ঘটনা। এটা একটা চূড়ান্ত সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকেরা সন্দেহ করে থাকে। আল্লাহ তো এমন নন যে কাউকে তিনি নিজের পুত্র বানিয়ে নেবেন! তিনি পবিত্র মহিমায়ম,তিনি কোনো কাজ করা স্থির করলে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।" (সূরা : মারইয়াম : আয়াত : ৩৪-৩৫)

অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শানও তাঁর বিশেষত্ব উক্ত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। এমন একটি সত্য ও সুস্পষ্ট বিষয়ে লোকেরা অযথা বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে। তারা এতে নানাবিধ মতপার্থক্য দাঁড় করিয়েছে। কেউ তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে, আর কেউ বানিয়েছে আল্লাহর বেটা, কেউ বলেছে মিথ্যাবাদী, প্রতারক আবার অনেকে তাঁর বংশ ও নসবনামায় তিরস্কার করেছে। আল কুরআন তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে যে,

ইসা ইহুদী-খ্রিস্টানদের এসব সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্কের উর্ধে। তিনি আল্লাহর একজন মোকাররম বান্দা, মিথ্যাবাদী-প্রতারক নন– সত্যবাদী, আল্লাহর নবী, তাঁর বংশ ও নসব পাক-পবিত্র। আল্লাহ তাঁকে 'কালেমাতুল্লাহ' আখ্যা দিয়েছেন। আয়াতে 'কাওলাল হক' বলে সম্ভবত এ 'কালেমাতুল্লাহ'-ই বুঝানো হয়েছে।

(আল কুরআনুল কারীম : শাব্বীর আহমদ উসমানী।)

ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অলীক চিন্তাধারায় বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তো তাঁকে বাড়িয়ে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে: আর ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এমন ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, তারা তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করেছেন– নাউযুবিল্লাহ। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তির অপনোদন করে তাঁর সঠিক মর্যাদা ও প্রকৃত সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (কুরতুবী থেকে মাআরেফুল কুরআন : মুফতী শফী র.)

এভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম নিয়ে যেমন তৎকালীন খ্রিস্টানরা নানা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবতারণা করেছিল– তারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত পুরুষ ছাড়া কেবল নারী থেকে সন্তান সৃষ্টি করার একটি স্বচ্ছ ঘটনাকে ঘোলাটে করার যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা মানুষের বৈশিষ্ট্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে নানা সন্দেহ ছড়িয়েছিল, ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র' বলার মত জঘন্য ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। আল কুরআন তাদের সে ভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করে আখেরী নবীর সময়কার ইহুদী-খ্রিস্টান-মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের 'হক'-এর দিকে আহ্বান করেছিল। মুজিযা হিসেবে জন্মগ্রহণকারী ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতা মারইয়ামকে অমর্যাদার বিতর্কের জালে জড়ানোর চক্রান্ত করেছিল। তেমনি আখেরী নবীর সময়কার ইহুদী-খ্রিস্টানরাও আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'নবুওয়াত' সম্পর্কে অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির ঘূর্ণায়নে আবর্তিত হচ্ছে। আর মানব সমাজকেও বিভ্রান্ত করছে। এতে করে ইহুদী-খ্রিস্টান-মুশরিকগণ পৃথিবীর শান্তি, বিপন্ন করছিল আখেরী নবীর আনীত বিশ্ব শান্তির পয়গামের বিরোধিতা করে। আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য ইতিহাসের সূচনা করেছেন এভাবে وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ "এ কিতাবে মারইয়ামের ইতিহাস আলোচনা করো।"

আল কুরআন এমনিভাবে পূর্বোক্ত নবী-রাসূলগণের ইতিহাস এবং আল্লাহর কতিপয় বিশেষ বান্দা ও বান্দীর ঘটনাবলি কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়াদির আলোচনা করেছে। এখানে মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আলোচনায় তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খ্রিস্টানদের তাওহীদী শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা যে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মূল শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে আল কুরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে। তারা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং মারইয়ামের উপর তোহমত আরোপ করে সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে মানব স্বভাবের বানিয়ে সকল নবীর দীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর কুঠারাঘাত করেছে আর নিজেদেরকে শিরক ও কুফরের মধ্যে নিক্ষেপ

করেছে। অথচ নিজেদেরকে ঈসা ও ইনজিল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করছে।

সদ্যজাত শিশু ঈসা ﷺ স্বয়ং মাতার কোলে থেকে সুস্পষ্ট বলে দিলেন। "আমি আল্লাহর বান্দা'। অর্থাৎ আমার এ অস্বাভাবিক জন্মের কারণে কেউ যেন এমন বিভ্রান্তিতে না পড়ে যে, আমি কোনো অতিমানবীয় অস্তিত্বের অধিকারী। আমি তো আল্লাহরই বান্দাহ। শিশু ঈসার দ্বিতীয় কথা ছিল, "আল্লাহ্ আমাকে কিতাব ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন আর আমি যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই আমার অবস্থান হবে কেবল বরকত আর বরকত।" তাঁর তৃতীয় কথা ছিল, "আমাকে জীবনভর সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূলত এ দুটো বিষয়ই সকল শরীয়তের মূল ভিত্তি ছিল। এজন্যে সকল আসমানী জীবন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম এ দুটো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।" শিশু ঈসার চতুর্থ কথা ছিল, "আল্লাহ্ আমাকে আমার মায়ের অনুগত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে তিনি স্বৈরাচারী ও বদ চরিত্রের বানাননি।" সর্বশেষ তিনি বলেছেন, "আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো আর যেদিন আমি জীবিত হয়ে উঠবো।"

ঈসা ﷺ-এর জন্মের পর পরই মায়ের কোলে থেকে উপরিউক্ত পাঁচটি এমন বিষয়ের কথা বলেছেন যাতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অন্যসব মানুষের মতই একজন মানুষ। তিনি মানুষের উর্ধে আল্লাহ বা আল্লাহর বেটা কোনোটিই নন। প্রথম কথায় তিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথায় তাঁকে আল্লাহ্ কিতাব ও নবুওয়াত প্রাপ্ত আল্লাহর বিশেষ অনুগৃহীত বান্দা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় কথায় তিনি নিজের দায়িত্ব অন্যান্য নবী-রাসূলগণের দায়িত্বের অনুরূপ এবং মানুষ নবী হিসেবে যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন অর্পিত দায়িত্ব আনজাম দানের জন্য আদিষ্ট বলে প্রচার করেছেন। চতুর্থ কথায় তিনি অন্যান্য মানুষের মতই মারইয়ামের উদরে জন্ম নেয়ার কারণে মায়ের অনুগত থাকার কথা সংকল্প ও নির্দেশনার বিষয়েং স্বীকার করেছেন। ব্যতিক্রম কেবল এতটুকু যে, তিনি আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়াই মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। আর সর্বশেষ কথায় তিনি নিজেকে জন্ম, মৃত্যু ও হাশরে উঠার স্বাভাবিক মানবীয় জীবন ধারার গণ্ডীর মধ্যে কথা একজন মানুষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুসারী বলে দাবীদার খ্রিস্টানদের আকীদা-বিশ্বাস ও দাবী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পিত সে বিষয়ে সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছে।

১১.সূরা আন নূর (سُوْرَةُ النُّوْرِ)

আয়াত : ৬৪ রুকূ : ৯ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

পঞ্চম রুকূ'র প্রথম আয়াতের 'নূর' শব্দ থেকে এ নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি যে বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসঙ্গে এটি নাযিল হয়। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূতে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কী? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পর্দার বিধান কুরআন মাজীদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূরা আহযাব। আর আহযাব যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পর্দার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুসতালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পর্দার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্য আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরি মনে করি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন বনীল মুসতালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসঙ্গে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনো কোনোটিতে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সা'দ ইবনে মু'আযের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী সা'দ ইবনে মু'আযের ইন্তিকাল হয় বনী কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনীল মুসতালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও

অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পর্দার বিধান নাযিল হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহযাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বোন হামনা বিনতে জাহশ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোয় শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, আয়েশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনে বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ্য ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় সা'দ ইবনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপস্থিত বর্ণনা থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসঙ্গে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটিতে সা'দা ইবনে মু'আযের কথা বলা হয়েছে আবার কোনোটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে উসাইদ ইবনে হুদ্বাইরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসঙ্গে আয়েশা বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলির সাথে পুরোপুরি খাপখেয়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি বনীল মুসতালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের ঘটনা তার পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে ও হিজাবের হুকুম আহযাব ও কুরাইযার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হবার পর যে, সূরা নূর ৬ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহ্যাবের কয়েক মাস পর নাযিল হয়, যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তার ওপর আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেয়া উচিত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয় খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তা এত বেশি ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশরিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দোমনা সংশয়ী নির্বিশেষে সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে তারা এক জোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনা উপকণ্ঠে এক মাস ধরে মাথা কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার

সাথে সাথেই নবী ﷺ ঘোষণা করে দেন-

لَنْ تَغْزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

অর্থ : "এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের ওপর হামলা করবে।" (ইবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)

রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির অগ্রগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার থেকে ইসলাম আর আত্মরক্ষার নয়; বরং অগ্রগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগ্রগতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ। প্রতিপক্ষও ভালোভাবে এটা অনুভব করছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা ইসলামের এ উত্তরোত্তর উন্নতির আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা তাদের চাইতে বেশি শক্তির সমাবেশ ঘটায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রু দলই এটা অনুভব করছিল। একদিকে তারা দেখছিল নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তার মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে। অন্যদিকে তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবস্থাপনা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পরাজয়বরণ করে চলছে।

নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের গুণাবলি ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সৎগুণাবলি তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের গুণাবলির আয়ত্ব করে নেবার চিন্তা জাগে না; বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেভাবেই হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে হবে,

যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের যত গুণই থাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটিও আছে। এ হীন মানসিকতাই ইসলামের শত্রুদের কর্মতৎপরতার গতি সামরিক কার্যক্রমের দিক থেকে সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শত্রুদের তুলনায় মুসলমানদের ভেতরের মুনাফিকরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতো তাই পরিকল্পিতভাবে বা পরিকল্পনা ছাড়াই স্থিরিকৃত হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা ভেতর থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা বাইর থেকে তার ফলে যত বেশি পারে লাভবান হবার চেষ্টা করবে।

৫ হিজরী যিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী ﷺ আরব থেকে পালক পুত্র সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের (যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে হারেস) তালাক দেয়া স্ত্রীকে (যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে জাহশ) বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপ্রচারের এক বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন- মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে তার পালক পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। কিভাবে পুত্র তাঁর প্রেমের খবর পেয়ে যায় এবং তার পর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন। এ গল্পগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণে মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরদের একটি দল যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন করেছেন। অথচ যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবী ﷺ-এর আপন ফুফুর (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী ﷺ-এর চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী ﷺ নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে যায়েদকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্নী হওয়াকে স্বভাবতই মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু নবী ﷺ কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্যই যয়নবকে রাদিয়াল্লাহু আনহা এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বন্ধু ও শত্রু সবাই জানতো। আর এ কথাও সবাই জানতো, যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তাঁর ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত

তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জঘন্য ধরনের নৈতিক দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

এরপর দ্বিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সময়। প্রথম হামলার চাইতে এটি ছিল বেশি মারাত্মক। বনীল মুসতালিক গোত্রটি বনী খুযা'আর একটি শাখা ছিল। তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে কুদাইদ এলাকায়। যে ঝরনাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল মরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী'র যুদ্ধও বলা হয়েছে। ৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী ﷺ খবর পান, তারা মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য উপজাতিকেও একত্র করার চেষ্টা করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ষড়যন্ত্রটিকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান। এ অভিযানে আবুদল্লাহ ইবনে উবাইও বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তাঁর সহযোগী হয়। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, এর আগে কোনো যুদ্ধেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়নি। মুরাইসী নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হঠাৎ শত্রুদের মুখোমুখি হন। সামান্য সংঘর্ষের পর যাবতীয় সম্পদ-সরঞ্জাম সহাকারে সমগ্র গোত্রটিকে গ্রেফতার করে নেন।

এ অভিযান শেষ হবার পর তখনো মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এমন সময় একদিন উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন কর্মচারী (জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারী) এবং খাযরাজ গোত্রের একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন আনসারদেরকে ডাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ডাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে লোকেরা একত্র হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিলকে তাল করে দেয়। সে আনসারদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, "এ মুহাজিররা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং এ কুরাইশী কাঙালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা। এসব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে ডেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের ধন-সম্পত্তিতে তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে।" তারপর সে কসম খেয়ে বলে, "মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পন্ন তারা দীন-হীন-লাঞ্ছিতদেরকে বাইরে বের করে দেবে।" তার এসব কথাবার্তার খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছুলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পরামর্শ দেন, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَكَيْفَ يَا عُمَرُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

অর্থ : (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কী বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মাদ ﷺ তার নিজেরই সংগী-সাথীদেরকে হত্যা করছে।)

তারপর তিনি তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর

পর্যন্ত কোথাও থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কারোর এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করার এবং অন্যদের তা শোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি নিজের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অসময়ে রওয়ানা হবার হুকুম দিয়েছেন? তিনি জবাব দেন , "তুমি শোননি তোমাদের সাথী কীসব কথা বলছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেন, " কোন সাথী?" জবাব দেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মুকুট তৈরি হচ্ছিল। আপনার আগমনের ফলে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। তারই ঝাল সে ঝাড়ছে"।

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এরই মধ্যে একই সফরে সে আর একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। এটা এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সংযম ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো মারাত্মক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ফিতনা। এ ঘটনার বিবরণ আয়েশার বর্ণনায় শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা যাবে। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সঙ্গে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।" (এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিলো না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যাথা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফয়সালা করতেন। শরীয়তে এমন অবস্থার জন্য লটারীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারে সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোনো ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবল মাত্র একজনকে দেয়া যেতে পারে।) বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রাত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তার খোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাতলা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার

মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখানে দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পর্দার হুকুম নাযিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। [তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস। তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তার স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামায যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাঙবে, সঙ্গে সঙ্গে নামাজ পড়ে নিবে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোণ জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী ﷺ তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন]।

আমাকে দেখে তিনি উট থামিয়ে নেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন।" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সাথে সাথেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনার কুচক্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, সে সময় সাফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেনা শিবিরে এসে পৌঁছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিষ্কলংক অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌঁছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচখচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন ও কেমন আছে?

নিজে আমার সাথে কোনো কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গেলাম যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিসতাহ ইবনে উসাসার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ আবু বকর সিদ্দিকের রাদিয়াল্লাহু আনহু জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিসতাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন, "ধ্বংস হোক মিসতাহ।" আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?" তারপর তিনি গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কীসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিসতাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাসসান ইবনে সাবেত ও যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা বোন হামনা বিনতে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজনের কারণে আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।"

সামনের দিকে এগিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আমি চলে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।' কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, 'সে

আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোনো কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।' সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় বলেন, 'হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে! তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়িতে আসেনি।' একথায় উসাইদ ইবনে হুদাইর (কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সা'দ ইবনে মু'আয) উঠে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজদের লোক হয় তাহলে আপনি হুকুম দিন আমরা হুকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত।' একথা শুনতেই খাযরাজ প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ رضي الله عنه দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, 'মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এ জন্যই মুখে আনছো যে সে খাযরাজদের অন্তর্ভুক্ত। যদি সে তোমাদের গোত্রের লোক হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে না, আমরা তাকে হত্যা করবো।' উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।' একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাংগামা শুরু হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসেছিলেন। মসজিদের মধ্যেই আওস ও খাযরাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন।"

আয়েশা رضي الله عنها-এর অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ এতদসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ত্রুটি মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদ রটিয়ে একই গুলীতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه-এর ইজ্জতের ওপর হামলা চালায়, অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের উন্নততর নৈতিক মর্যাদা ও চারিত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। তৃতীয় সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করে যে, যদি ইসলাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে না ফেলে থাকতো তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র পরস্পর লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বিষয়

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম হামলার সময় সূরা আহযাবের শেষ ৬টি রুকূ' নাযিল হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাযিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাচ্ছিল যেটা ছিল তাদের প্রাধান্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ্ তাদের চরিত্রে হননমূলক অপবাদ রটনার অভিযানের বিরুদ্ধে একটি ক্রুদ্ধ ভাষণ দেবার বা মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, তোমাদের নৈতিক অঙ্গনে যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুলো পূর্ণ কর এবং এ অঙ্গনকে আরো বেশি শক্তিশালী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যয়নবের (রা) বিয়ের সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাংগামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহযাব পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাংগামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো দেয়া হয়-

১. নবী করীম (সা)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহমধ্যে মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং ভিন পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে বিনম্র স্বরে কথা বলো না, যাতে কোনো ব্যক্তি কোনো অবাঞ্ছিত আশা পোষণ না করে বসে।

২. নবী করীমের (সা) গৃহে ভিন পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে।

৩. গায়রে মাহরাম পুরুষ ও মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে নবীর পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহরাম আত্মীয়রাই স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন।

৪. মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা এবং একজন মুসলমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তার আপন মায়ের মতই হারাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে।

৫. মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর লানত ও লাঞ্ছনাকর আযাবের কারণ হবে এবং এভাবে কোনো মুসলমানের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা এবং তার ভিত্তিতে তার ওপর অযথা দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহর শামিল।

৬. সকল মুসলমান মেয়েকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে।

তারপর যখন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় মদীনার সমাজে একটি হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাযিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে এখানে সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের সংশোধন সংগঠনের জন্য কী ধরনের আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করার বিধান দেয়, তা পাঠক অনুমান করতে পারবেন ঃ

- যিনা ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা ১৫-১৬ আয়াত)
- এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।
- ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়।
- যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী পেশ করতে পারে না, তার শাস্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।
- স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য 'লিয়ান' -এর রীতি প্রবর্তন করা হয়।
- আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে কোনো ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে যে কোনো অপবাদ দেয়া হোক, তা চোখবুজে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের গুজোব যদি রটে যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া এবং তার পথ রোধ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে নীতিগতভাবে একটি কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই বিবাহিত হওয়া উচিত। নষ্টা ও ভ্রষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভ্রষ্ট পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রাসূলকে একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভ্রষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গীনি হতে পারতো? যে নারী কার্যত ব্যভিচারে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায় তার সাধারণ চালচলন কীভাবে এমন পর্যায়ের হতে পারে যে, রাসূলের মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব তার সাথে এভাবে সংসার জীবন যাপন করেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থান্ধ লোক একটি

বাজে অপবাদ কারোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না; উপরন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেলে দেখতে হবে অপবাদ কে লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে?

- যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসলিম সমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না; বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।
- মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্ গড়ে উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।
- লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে নিঃসংকোচে প্রবেশ করো না; বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।
- নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ও উঁকিঝুঁকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়।
- মেয়েদের হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা বুক ঢেকে রাখো।
- মেয়েদের নিজেদের মাহরাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর সামনে সাজগোজ করে না আসার হুকুম দেয়া হয়।
- তাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, বাইওর বের হলে শুধু যে কেবল নিজেদের সাজসজ্জা লুকিয়ে বের হবে তই না; বরং এমন অলংকার পরিধান করেও বাইরে বের হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে।
- সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবুড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি বাঁদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্রচারনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্লীলতার সহজ শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শোনার এবং তা ছাড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে।
- বাদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য 'মুকাতাব'-এর পথ বের করা হয়। মালিক ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাঁদী ও গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হুকুম দেয়া হয়।
- বাঁদীদেরকে অর্থোপার্জনের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাঁদীদের মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

- পারিবারিক জীবনে গৃহে পরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্য নিয়ম করা হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় গৃহের কোনো পুরুষ ও মেয়ের কামরায় আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- বুড়িদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু 'তাবার্‌রুজ' (নিজেকে দেখানোর জন্য সাজ-সজ্জা করা) থেকে দূরে থাকার হুকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নসিহত করা হয়েছে, বার্ধক্যাবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে ভালো।
- অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ও রুগ্নকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে কোথাও থেকে কোনো খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে না। এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।
- নিকট আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে খেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ে যেমন তারা নিজেদের বাড়িতে খেতে পারে। এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা বেড়ে যাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্র বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোনো কুচক্রী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো।

এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মুমিনদের এমন সব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পন্ন মুমিন কে আর মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আরো কতিপয় নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টক্কর দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশি শক্তিশালী করা।

এ সমগ্র আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর হামলার জবাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিঁটেফোটাও নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন এবং অন্যদিকে সূরার বিষয়বস্তু ও বাক্যরীতি দেখুন। এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংস্কারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই পাওয়া যায় না যে, ফিতনার মোকাবেলায় কঠিন থেকে কঠিনতর উত্তেজক পরিস্থিতিতে আমাদের কেমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উদার হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তাসহকারে এগিয়ে যেতে হবে। এ থেকে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ

বাণী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্তার অবতীর্ণ বাণী যিনি অনেক উচ্চ স্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সত্তায় এসব অবস্থা ও জীবনাচারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্জলা পথনির্দেশনা ও বিধান দানের দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী ﷺ-এর নিজের বাণী হতো তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর জঘন্য আক্রমণের ধারা বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র লোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্যভাবে যে স্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

মানব বংশ বিধ্বংসী ব্যভিচারের শাস্তি

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা আন নূর : আয়াত-২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ বিষয়টির অনেকগুলো আইনগত, নৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রয়ে গেছে। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া বর্তমান যুগে এক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র এ শরীয়াতী বিধান অনুধাবন করা কঠিন। তাই নিচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-

১. যিনা বা ব্যভিচারের যে সাধারণ অর্থটি প্রত্যেক ব্যক্তি জানে সেটি হচ্ছে এ যে, "একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে কোনো বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পর যৌন মিলন করে।' এ কাজটির নৈতিকভাবে খারাপ হওয়া অথবা ধর্মীয় দিক দিয়ে পাপ হওয়া কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে দূষণীয় ও আপত্তিকর হওয়া এমন একটি জিনিস যে ব্যাপারে প্রাচীনতম যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল মানব সমাজ ঐকমত্য পোষণ করে আসছে। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কয়েকজন লোক যারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিজেদের প্রবৃত্তি তোষণ নীতির অধীন করে দিয়েছে অথবা যারা নিজেদের উন্মত্ত মস্তিস্কের অভিনব খেয়ালকে দার্শনিক তত্ত্ব মনে করে নিয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেনি। এ বিশ্বজননী ঐকমত্যের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রকৃতি নিজেই যিনা হারাম হওয়ার দাবী জানায়। মানব জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এবং মানবিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ই এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করে যে, নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র

আনন্দ উপভোগের জন্য মিলিত হবার এবং তারপর আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হবে না; বরং প্রত্যেকটি জোড়ার পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার ও চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যা সমাজের সবাই জানবে এবং সবার কাছে হবে পরিচিত এবং সেই সাথে সমাজ তার নিশ্চয়তাও দেবে। এ অঙ্গীকার ও চুক্তি ছাড়া মানুষের বংশধারা এক দিনের জন্যও চলতে পারে না। কারণ মানব শিশু নিজের জীবন ও নিজের বিকাশের জন্য বছরের পর বছরের সহানুভূতিশীল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা-প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী হয়। যে পুরুষটি এ শিশুর দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের কারণ হয়েছে যতক্ষণ না সে নারীর সাথে এ সহযোগিতা করবে ততক্ষণ কোনো নারী একাকী এ বোঝা বহন করার জন্য কখনো তৈরি হতে পারে না। অনুরূপভাব এ চুক্তি ছাড়া মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিও টিকে থাকতে পারে না। কারণ সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্মই তো একটি পুরুষ ও একটি নারীর সহ অবস্থান করার, গৃহ ও পরিবারের অস্তিত্ব দান করার এবং তারপর পরিবারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যদি নারী ও পুরুষ গৃহ ও পরিবার গঠন না করে নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য স্বাধীনভাবে সহ অবস্থান করতে থাকে তাহলে সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সমাজ জীবনের ভিত্তি চূর্ণ ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ ইমারত যে ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এসব কারণে নারী ও পুরুষের যে স্বাধীন সম্পর্ক কোনো সুপরিচিত ও সর্বসম্মত বিশ্বস্ততার চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় তা মূলত মানবিক প্রকৃতির বিরোধী। এসব কারণেই প্রতি যুগে মানুষ একে মারাত্মক দোষ, বড় ধরনের অসদাচার ও ধর্মীয় পরিভাষায় একটি কঠিন গোনাহ মনে করে এসেছে এবং এসব কারণেই প্রতি যুগে মানব সমাজ বিয়ের প্রচলন ও প্রসারের সাথে সাথে যিনা ও ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন-কানুন এবং নৈতিক, তামাদ্দুনিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। জাতি ও সমাজের জন্য যিনার ক্ষতিকর হবার চেতনা কোথাও কম এবং বেশি, কোথাও সুস্পষ্ট আবার কোথাও অন্যান্য সমস্যার সাথে জড়িয়ে অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

২. যিনার হারাম হবার ব্যাপারে একমত হবার পর যে বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে সেটি হচ্ছে, এর অপরাধ অর্থাৎ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার ব্যাপারটি। এখান থেকে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইনের বিরোধ শুরু হয়। যেসব সমাজ মানব প্রকৃতির কাছাকাছি থেকেছে তারা সবসময় যিনা অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে একটি অপরাধ হিসেবে দেখে এসেছে এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ধারা যতই সমাজকে খারাপ করে চলেছে এ অপরাধ সম্পর্কে ততই মনোভাব কোমল হয়ে চলেছে।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করা হয় সেটি ছিল, "নিছক যিনা" এবং "পর নারীর সাথে যিনা" এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটিকে সামান্য ভুল এবং কেবলমাত্র শেষোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়।

নিছক যিনার যে সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, " কোন অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রী নয়।" এ সংজ্ঞায় মূলত পুরুষের নয় বরং নারীর অবস্থার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। নারী যদি স্বামীহীন হয় তাহলে তার সাথে সংগম নিছক যিনা হবে। এ ক্ষেত্রে সংগমকারী পুরুষের স্ত্রী থাক বা না থাক। তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও ভারতের আইনে এর শাস্তি ছিল খুবই হাল্কা পরিমাণের। গ্রীস ও রোমও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীরাও এ থেকে প্রভাবিত হয়। বাইবেলে একে শুধুমাত্র এমন একটি অন্যায় বলা হয়েছে যার ফলে পুরুষকে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডই দিতে হয়। যাত্রা পুস্তকে এ সম্পর্কে যে হুকুম দেয়া য়েছে তার শব্দাবলি নিম্নরূপ-

"আর কেহ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে।"

"দ্বিতীয় বিবরণে" এ হুকুমটি কিছুটা অন্য শব্দাবলির সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর বলা হয়েছে, পুরুষের কাছ থেকে পঞ্চাশ শেকল (প্রায় ২০ তোলা) পরিমাণ রৌপ্য কন্যার পিতাকে জরিমানা দেবে।

তবে কোনো ব্যক্তি যদি পুরোহিতের মেয়ের সাথে যিনা করে তাহলে তার জন্য ইহুদী আইনে রয়েছে ফাঁসি এবং মেয়েকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা।

এ চিন্তাটি হিন্দু চিন্তার সাথে কত বেশি সামঞ্জস্যশীল তা অনুমান করার জন্য মনু সংহিতার সাথে একবার মিলিয়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি নিজের জাতের কুমারী মেয়ের সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে সে কোনো শাস্তি লাভের যোগ্য নয়। মেয়ের বাপ রাজী থাকলে সে বিনিময় দিয়ে তাকে বিয়ে করে নেবে। তবে মেয়ে যদি উচ্চ বর্ণের হয় এবং পুরুষ হয় নিম্নবর্ণের, তাহলে মেয়েকে গৃহ থেকে বের করে দেয়া উচিত এবং পুরুষের অংগচ্ছেদের শাস্তি দিতে হবে।"

আর মেয়ে ব্রাহ্মণ হলে এ শাস্তি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার শাস্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

আসলে এ সমস্ত আইন পরস্ত্রীর সাথে যিনা করাই ছিল বড় অপরাধ। অর্থাৎ যখন কোনো (বিবাহিত বা অবিবাহিত) ব্যক্তি এমন কোনো মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোনো ব্যক্তির স্ত্রী। এ কর্মটির অপরাধ হবার ভিত্তি এ ছিল না যে, একটি

পুরুষ একটি নারী যিনা করেছে; বরং তারা দু'জন মিলে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এমন একটি শিশু লালন পালন করার বিপদে ফেলে দিয়েছে যেটি তার নয়, এটিই ছিল এর ভিত্তি। অর্থাৎ যিনা নয়; বরং বংশধারা মিশ্রণের আশঙ্কা এবং একের সন্তানকে অন্যের অর্থে প্রতিপালন করা ও তার উত্তরাধিকার হওয়াই ছিল অপরাধের মূল ভিত্তি। এ কারণে পুরুষ ও নারী উভয়েই অপরাধী সাব্যস্ত হতো। মিসরীয়দের সামজে এর শাস্তি ছিল পুরুষটিকে লাঠি দিয়ে ভালোমতে পিটাতে হবে এবং মেয়েটির নাক কেটে দিতে হবে। প্রায় এ একই ধরনের শাস্তির প্রচলন ছিল ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও প্রাচীন ইরানেও। হিন্দুদের মধ্যে নারীর শাস্তি ছিল, তার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া হতো এবং পুরুষের শাস্তি ছিল, তাকে উত্তপ্ত লোহার পালংকে শুইয়ে দিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। গ্রীস ও রোমে প্রথম দিকে একজন পুরুষের অধিকার ছিল যদি সে নিজের স্ত্রীর সাথে কাউকে যিনা করতে দেখে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারতো অথবা ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড নিতে পারতো। তারপর প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে সীজার আগস্টিস এ আইন জারি করেন যে, পুরুষের সম্পত্তির অর্ধাংশ বাজেয়াপ্ত করে তাকে দেশান্তর করে দিতে হবে এবং নারীর অর্ধেক মোহরানা বাতিল এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকেও দেশের কোনো দূরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে। কনষ্টান্টিন এ আইনটি পরিবর্তিত করে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেন। লিও ও মারসিয়ানের যুগে এ শাস্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর সীজার জাস্টিনীন এ শাস্তিটি আরো হাল্কা করে এ নিয়ম জারি করেন যে, মেয়েটিকে বেত্রাঘাত করার পর কোনো সন্যাসীর আশ্রমে দিয়ে আসতে হবে এবং তার স্বামীকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, সে চাইলে দু'বছর পর তাকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারে অন্যথায় সারা জীবন সেখানে ফেলে রাখতে পারে।

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য আইন-কানুন এসব বিচিত্র চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশও আজ এসব আইনের ধারা অনুসরণ করে চলছে। এ পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে যিনা করা একটি দোষ, নৈতিক চরিত্রহীনতা বা পাপ যাই কিছু হোক না কেন, মোটকথা এটা কোনো অপরাধ নয়। একে যদি কোনো জিনিস অপরাধে পরিণত করতে পারে তাহলে তা হচ্ছে এমন ধরনের বল প্রয়োগ যার সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন ক্রিয়া করা হয়। আর কোনো বিবাহিত পুরুষের যিনা করার ব্যাপারটা হচ্ছে, তা যদি অভিযোগের কারণ হয়ে থাকে তাহলে তার স্ত্রীর জন্য। সে চাইলে তার প্রমাণ দিয়ে তালাক হাসিল করতে পারে। আর যিনার অপরাধী যদি হয় বিবাহিত নারী, তাহলে তার স্বামীর কেবল তার বিরুদ্ধে নয়; বরং যিনাকারী পুরুষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেখা দেয় এবং উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সে স্ত্রী থেকে তালাক এবং যিনাকারী পুরুষ থেকে অর্থদন্ড নিতে পারে।

৩. এসব চিন্তার বিপরীতে ইসলামী আইন স্বয়ং যিনাকেই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে এবং বিবাহিত হবার পরও যিনা করলে তার দৃষ্টিতে তা অপরাধের মাত্রা আরো বেশি বাড়িয়ে দেয়। এটা এ জন্য নয় যে, অপরাধী কারোর সাথে "চুক্তিভংগ" অথবা অন্য কারো বিছানায় হস্তক্ষেপ করেছে; বরং এ জন্য যে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামণা পূরণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। ইসলামী আইন যিনাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হচ্ছে এই যে, এটি এমন একটি কর্ম যাকে স্বাধীনভাবে করার সুযোগ দেয়া হলে একদিকে মানব বংশধারা এবং অন্যদিকে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। বংশধারার স্থায়িত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ের জন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরিহার্য। আর তার সাথে সাথে যদি অবাধ যৌন সম্পর্কেরও খোলাখুলি অবকাশ থাকে তাহলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। কারণ গৃহ ও পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করা ছাড়া যেখানে লোকদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার সুযোগ থাকে সেখানে তাদের থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, সেসব প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য তারা আবার এত বড় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে উদ্যত হবে। এটা ঠিক বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকার পর রেল গাড়িতে বসার জন্য টিকিটের শর্ত অর্থ হীন হয়ে যাওয়ার মতো। টিকিটের শর্ত যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে কার্যকর করার জন্য বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তারপর যদি কোনো ব্যক্তি পয়সা না থাকার কারণে বিনা টিকিটে সফর করে তাহলে সে অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের অপরাধী হবে এবং ধনাঢ্য হবার পরও এ অপরাধ করলে তার অপরাধ আরো কঠিন হয়ে যায়।

৪. ইসলাম মানব সমাজকে যিনার আশঙ্কা থেকে বাঁচাবার জন্য শুধুমাত্র দণ্ডবিধি আইনের অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে না; বরং তার জন্য ব্যাপক আকারে সংস্কার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আর এ দণ্ডবিধি আইনকে নির্ধারণ করেছে নিছক একটি শেষ উপায় হিসেবে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকেরা এ অপরাধ করে যেতেই থাকুক এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করার জন্য দিনরাত তাদের ওপর নজর রাখা হোক; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ অপরাধ না করে এবং কাউকে শাস্তি দেবার সুযোগই না পাওয়া যায়। সে সবার আগে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে। তার মনের মধ্যে বসিয়ে দেয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয়। তার মধ্যে আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মরেও মানুষ এ হাত থেকে বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এটি হচ্ছে ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আর তারপর বারবার তাকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, যিনা ও সতীত্বহীনতা এমন বড় বড় গোনাহর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা

হবে। সমগ্র কুরআনে বারবার এ বিষয়বস্তু সামনে আসতে থাকে। তারপর ইসলাম মানুষের জন্য বিয়ের যাবতীয় সম্ভাব্য সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এক স্ত্রীতে তৃপ্ত না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী রাখার সুযোগ করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল না হলে স্বামীর জন্য তালাক ও স্ত্রীর "খুলা'র সুযোগ করে দেয়। আর অমিলের সময় পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে সরকারী আদালতে পর্যন্ত আপীল করার পথ খুলে দেয়, এর ফলে দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে আর নয়তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরেরের বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতো অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে। এসব বিষয় সূরা বাকারাহ, সূরা নিসা ও সূরা তালাকে দেখা যেতে পারে। আর এ সূরা নূরেও দেখা যাবে পুরুষ ও নারীকে বিয়ে না করে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং এ ধরনের লোকদের বিয়ে করিয়ে দেবার এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরকেও অবিবাহিত করে না রাখার জন্য পরিষ্কার হুকুম দেয়া হয়েছে।

তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মূল করে দেয় যেগুলো যিনার আগ্রহ ও তার উদ্যোগ সৃষ্টি করে এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। যিনার শাস্তি বর্ণনা করার এক বছর আগে সূরা আহযাবে মেয়েদেরকে গৃহ থেকে বের হতে হলে চাদর মুড়ি দিয়ে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্য যে নবীর গৃহ ছিল আদর্শ গৃহ সেখানে বসবাসকারী মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, নিজেদের গৃহ মধ্যে মর্যাদা ও প্রশান্তি সহকারে বসে থাকো, নিজেদের সৌন্দর্য, ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িও না এবং বাইরের পুরুষরা তোমাদের থেকে কোন জিনিস নিলে যেন পর্দার আড়াল থেকে নেয়। দেখতে দেখতে এ আর্দশ সমস্ত মু'মিন মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কাছে জাহেলী যুগের নির্লজ্জ মহিলারা নয়; বরং নবীর ﷺ স্ত্রী ও কন্যাগণই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের শাস্তি নির্ধারণ করার আগে নারী ও পুরুষের অবাধ মিশ্রিত সামাজিকতা বন্ধ করা হয়, নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করা হয় এবং যে সমস্ত কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ যিনার সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দেয় সেগুলোর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এসবের পরে যখন যিনার ফৌজদারী তথা অপরাধমূলক শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন দেখা যায় এর সাথে সাথে এ সূরা নূরেই অশ্লীলতার সম্প্রসারণেও বাধা দেয়া হচ্ছে। পতিতাবৃত্তিকে আইনগতভাবে বন্ধ করা হচ্ছে। নারী ও পুরুষদের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া এবং তার আলোচনা করার জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হচ্ছে। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হুকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হচ্ছে, যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্চায় পৌছুতে না পারে। সেই সাথেনারীদেরকে নিজেদের ঘরে মাহরাম ও গায়ের মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করার এবং গায়ের মাহরামদের সামনে সেজেগুজে না আসার হুকুম দেয়া হচ্ছে। এ থেকে যে

সংস্কার পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে যিনার আইনগত শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার সমগ্র অবয়বটি অনুধাবন করা যেতে পারে। ভিতর-বাইরের যাবতীয় সংশোধন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্ট প্রকৃতির লোক প্রকাশ্য বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার ওপর জোর দেয় তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার এবং একজন ব্যভিচারীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের এ ধরনের প্রবৃত্তির অধিকারী বহু সংখ্যক লোকের মানসিক অপারেশন করার জন্য এ শাস্তি। এ শাস্তি নিছক একজন অপরাধীর শাস্তির নয়; বরং এটি একটি কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যভিচারীদের অবাধ বিচরণস্থল নয় এবং এটি স্বাদ আস্বাদনকারী পুরুষ ও নারীদের নৈতিক বাঁধন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা আমোদ ফূর্তি করার জায়গাও নয়। এ দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি ইসলামের এ সংস্কার পরিকল্পনা অনুধাবন করতে চাইলে সহজে অনুভব করেন যে, এ সমগ্র পরিকল্পনার একটি অংশকেও তার নিজের জায়গা থেকে সরানো যেতে পারে না এবং এর মধ্যে কোনো কম বেশিও করা যেতে পারে না। এর মধ্যে রদবদল করার চিন্তা করতে পারে এমন একজন অজ্ঞ-নাদান, যে একে অনুধাবন করার যোগ্যতা ছাড়াই এর সংশোধনকারী ও সংস্কারক হয়ে বসেছে অথবা মহাজ্ঞানী আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনাটি দিয়েছেন তা পরিবর্তন করাই যার আসল নিয়ত এমন একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীই এ চিন্তা করতে পারে।

৫. এ আয়াতে যিনার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তা আসলে "নিছক যিনা'র শাস্তি, বিবাহিতের যিনার শাস্তি নয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ বিবাহিতের যিনা কঠিনতর অপরাধ। একথা কুরআনের একটি ইশারা থেকে জানা যায় যে, সে এখানে এমন একটি যিনার শাস্তি বর্ণনা করছে যার উভয় পক্ষ অবিবাহিত। সূরা নিসায় ইতিপূর্বে বলা হয়, "তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচারের অপরাধ করবে তাদের ওপর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চার জনের সাক্ষ্য নাও। আর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে এরপর তাদেরকে (অপরাধী নারীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দাও, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য বের করে দেন কোনো পথ।"

এরপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বলা হয়- "আর তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিনদের মধ্য থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না, তারা তোমাদের মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে করবে। তারপর যদি (ঐ বাঁদীরা) বিবাহিত হয়ে যাবার পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (এ ধরনের অপরাধে) স্বাধীন নারীদের তুলনায় অর্ধেক দিতে হবে।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতে আশা দেয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারিণীদের জন্য, যাদেরকে আপাতত বন্দী করার হুকুম দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ পরে কোন পথ বের করে দেবেন। এ থেকে জানা যায়, সূরা নিসার উপরে উল্লেখিত আয়াতে যে ওয়াদা করা হয়েছিল এ দ্বিতীয় হুকুমটির মধ্যমে সে ওয়াদা পূরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বিবাহিতা

বাঁদীর যিনার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একই আয়াতে এবং একই বর্ণনা ধারায় দু'বার "মুহসানাতদের" বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না। অবশ্যই এখানে "মুহসানাত" মানে বিবাহিতা নারী হতে পারে না; বরং এর মানে হতে পারে, একটি স্বাধীন পরিবারের অবিবাহিতা নারী। তারপর শেষের বাক্যাংশে বলা হচ্ছে, বাঁদী বিবাহিতা হবার পর যদি যিনা করে, তাহলে এ অপরাধে মুহসানাতের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার শাস্তি হবে তার অর্ধেক। পরবর্তী আলোচনায় পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, প্রথম বাক্যাংশে "মুহসানাত" অর্থ যা ছিল এ বাক্যাংশেও তার অর্থ সে একই অর্থাৎ বিবাহিতা নয়; বরং স্বাধীন পরিবারে লালিতা পালিতা অবিবাহিতা নারী। এভাবে সূরা নিসার এ দু'টি আয়াতে একত্র হয়ে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে, সেখানে অবিবাহিতাদের যিনার শাস্তির কথা বর্ণনার যে ওয়াদা করা হয়েছিল সূরা নূরের এ হুকুমটি সে কথাই বর্ণনা করছে।

৬. বিবাহিতের যিনার শাস্তি কী, একথা কুরআন মাজীদ থেকে নয়; বরং হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত, নবী ﷺ কেবল মুখেই এর শাস্তি রজম (প্রস্তরঘাতে মৃত্যু) বর্ণনা করেননি; বরং কার্যত বহু সংখ্যক মোকদ্দমায় তিনি এ শাস্তি জারিও করেন। তাঁর পরে চার খোলাফায়ে রাশেদীনও নিজ নিজ যুগে এ শাস্তি জারি করেন এবং আইনগত শাস্তি হিসেবে বারবার এরি ঘোষণা দেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে "আল্লাহর দীন" বলা হচ্ছে। এ থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতই দীন নয়; বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহর আইন ও শরীয়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও যেন অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। যেখানে একে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয়; বরং আল্লাহর দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় যে জিনিসটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, আল্লাহর এ সতর্কবাণী যিনাকারী ও যিনাকারিণীর ওপর আমার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগকালে অপরাধীর জন্য দয়া ও মমতার প্রেরণা যেন তোমাদের হাত টেনে না ধরে। নবী ﷺ একথাটি আরো স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বলেন- "কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে। সে হদের মধ্যে বেত্রাঘাতের সংখ্যা এক ঘা কমিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে? জবাব দেবে, আপনার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, তাহলে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে বেশি অনুগ্রহশীল ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে জাহান্নামে। আর একজন শাসককে আনা হবে। সে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ১টি বাড়িয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এ কাজ করেছিলে কেন? সে জবাব দেবে, যাতে লোকেরা আপনার নাফরমানি করা থেকে বিরত

থাকে। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে তুমি তাহলে আমার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে জাহান্নামে।

(তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

দয়া বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হদের মধ্যে কম-বেশি করার কাজ চললে এ অবস্থা হবে। কিন্তু কোথাও যদি অপরাধীদের মর্যাদার ভিত্তিতে বিধানের মধ্যে বৈষম্য করা হতে থাকে তাহলে সেটা হবে জঘন্য ধরনের অপরাধ। বুখারী ও মুসলিমে আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণে বলেন, "হে লোকেরা! তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এ জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোনো মর্যাদাশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো।" অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একটি হদ্ জারি করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার চাইতেও বেশি কল্যাণকর।" (নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, অপরাধ প্রমাণ হবার পর অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া যাবে না এবং তার শাস্তিও কম করা যাবে না; বরং তাকে পুরো একশ কোড়া মারতে হবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন যে, অপরাধী যে মারের কোনো কষ্ট অনুভব করতে না পারে এমন ধরনের কোনো হাল্কা মার মারা যাবে না। আয়াতের শব্দাবলি উভয় ধরনের অর্থ সম্বলিত; বরং উভয় অর্থই প্রযোজ্য মনে হয়। বরঞ্চ সে সাথে এ অর্থও হয় যে, যিনাকারীকে সে শাস্তি দিতে হবে যা আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাকে অন্য কোনো শাস্তিতে পরিবর্তিত করা যাবে না। কোড়া মারার পরিবর্তে যদি অন্য কোনো শাস্তি দয়া ও মমতার ভিত্তিতে দেয়া হয়, তাহলে তা হবে গোনাহ। আর যদি কোড়া মারাকে একটি বর্বরোচিত শাস্তি মনে করে অন্য শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে তা হবে নির্জলা কুফরী, যা এক মুহূর্তকালের জন্যও ঈমানের সাথে একই বক্ষে একত্র হতে পারে না। আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নেয়া আবার (নাউযুবিল্লাহ) তাকে বর্বরও বলা কেবলমাত্র এমন ধরনের লোকের পক্ষে সম্ভব যে জঘন্য পর্যায়ের মুনাফিক।

ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। এ থেকে ইসলামের শাস্তি তত্ত্বের ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। সূরা আল মায়েদায় চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ প্রতিরোধক শাস্তি।" (৩৮ আয়াত)

আর এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যিনাকারীকে প্রকাশ্য লোকদের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এ থেকে জানা যায়, ইসলামী আইনে শাস্তির তিনটি উদ্দেশ্য-

- অপরাধী থেকে তার জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্বাদন করিয়ে দিতে হবে।

- তাকে পুনর্বার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে।
- তার শাস্তিকে শিক্ষণীয় করতে হবে, যাতে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধীকারী অন্য লোকদের মগজ ধোলাই হয়ে যায় এবং তারা যেন এ ধরনের কোনো অপরাধ করার সাহসই না করতে পারে। এ ছাড়াও প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার আর একটি লাভ হচ্ছে এই যে, এ অবস্থায় শাসকরা শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে অহেতুক সুবিধা দান বা অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করার সাহস না দেখাতে পারে।

ব্যভিচারি ব্যভিচারিণী ব্যতীত বিয়ে করো না

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۘوَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করবে না, মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (সূরা আন নূর : আয়াত-৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : অ-তাওবাকারী ব্যভিচারীর জন্য ব্যভিচারিণীই উপযোগী অথবা মুশরিক নারী। কোনো সৎ মু'মিন নারীর জন্য সে মোটেই উপযোগী পুরুষ নয়। আর মু'মিনদের জন্য জেনে বুঝে নিজেদের মেয়েদেরকে এ ধরনের অসচ্চরিত্র লোকদের হাতে সোপর্দ করা হারাম। এভাবে যিনাকারিণী (অ-তাওবাকারী)মেয়েদের জন্য তাদেরই মতো যিনাকারীরা অথবা মুশরিকরাই উপযোগী। সৎ মু'মিনদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু'মিনরা জানে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য হারাম। যে সমস্ত পুরুষ ও নারী তাদের চরিত্রহীনতার পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছে একমাত্র তাদের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর "যিনাকারী" হবার দোষ আর তাদের জন্য প্রযুক্ত হয় না।

যিনাকারীর সাথে বিয়ে হারাম হবার অর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এ নিয়েছেন যে, আদতে তার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিতই হয়না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, এর অর্থ নিছক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে আইনগতভাবে তা বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সত্ত্বেও উভয় পক্ষকে যিনাকারী গণ্য করতে হবে একথা ঠিক নয়। নবী ﷺ একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে বলেন, "হারাম হালালকে হারাম করে দেয় না।" (তাবারানী ও দারুকুতনী) অর্থাৎ একটি বেআইনি কাজ অন্য একটি আইনসংগত কাজকে বেআইনী করে দেয় না। কাজেই কোনো ব্যক্তির যিনা করার কারণে সে যদি বিয়েও করে তাহলে তা তাকে যিনায় পরিণত করে দিতে পারেনা এবং বিবাহ চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ যে ব্যভিচারী নয় সেও ব্যভিচারী গণ্য হবে না। নীতিগতভাবে বিদ্রোহ ছাড়া কোনো অপরাধ এমন নেই, যা

অপরাধ সম্পাদনকারীকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত করে। যার পরে তার কোনো কাজই আইনসংগত হতে পারেনা। এ বিষয়টি সামনে রেখে যদি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে এই মনে হয় যে, যাদের ব্যভিচারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত করা একটি গোনাহ্‌র কাজ। মু'মিনদের এ গোনাহ্ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে ব্যভিচারীদের হিম্মত বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ শরীয়াত তাদেরকে সমাজের অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য জীব গণ্য করতে চায়।

অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও নেয়া যায় না যে, যিনাকারী মুসলিম পুরুষের বিয়ে মুশরিক নারীর সাথে এবং যিনাকারিণী মুসলিম নারীর বিয়ে মুশরিক পুরুষের সাথে সঠিক হবে। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যিনা একটি চরম নিকৃষ্ট কুকর্ম। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজ করে সে মুসলিম সমাজের সৎ ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার নিজের মতো যিনাকারীদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত অথবা মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যারা আদৌ আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি বিশ্বাসই রাখেনা।

এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোই আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসের রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উম্মে মাহযাওল নামে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এক মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চায় এবং এ জন্য নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চায়। তিনি নিষেধ করে এ আয়াতটি পড়েন। তিরমিযী ও আবু দাউদে বলা হয়েছে, মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগে মক্কার ঈনাক নামক এক ব্যভিচারিণীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চান। দু'বার জিজ্ঞেস করার পরও তিনি নীরব থাকেন। আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করেন, এবার তিনি জবাব দেন, "হে মারসাদ! ব্যভিচারী এক ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, কাজেই তাকে বিয়ে করো না।"

এ ছাড়াও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন, "কোনো দাইয়ুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে তার স্ত্রী ব্যভীচারিণী এবং এরপরও সে তার স্বামী থাকে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" (আহমাদ, নাসাঈ, আবু দাউদ) প্রথম দুই খলীফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ই এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা ছিল এই যে, তাঁদের আমলে যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা অভিযোগে গ্রেফতার হতো তাদেরকে তাঁরা প্রথমে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন তারপর তাদেরকেই পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি বড়ই পেরেশান অবস্থায় আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে আসে। সে এমনভাবে কথা বলতে থাকে যেন তার

মুখে কথা ভালভাবে ফুটছিল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করুন ব্যাপারখানা কী? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলে সে বলে, তাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে এক ব্যক্তি এসেছিল। সে তার মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমার মন্দ হোক, তুমি নিজের মেয়ের আবরণ ঢেকে দিলে না। "শেষ পর্যন্ত পুরুষটি ও মেয়েটির বিরুদ্ধে মামলা চলে। উভয়কে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর উভয়কে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক বছরের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করেন। এ ধরনেরই আরো কয়েকটি ঘটনা কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ শাস্তিযোগ্য অপরাধ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ . اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই তো সত্যত্যাগী। তবে যদি এটার পর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন নূর : আয়াত-৪-৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ হুকুমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজে লোকদের গোপন প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্কের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এর মাধ্যমে অসংখ্য অসৎকাজ, অসৎবৃত্তি ও অসৎ প্রবণতার প্রসার ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎবৃত্তিটি হলা, এভাবে সবার অলক্ষে একটি ব্যভিচারমূলক পরিবেশ তৈরি হয়ে যেতে থাকে। একজন নিছক কৌতুকের বশে কারোর সত্য বা মিথ্যা কুৎসিত ঘটনাবলি অন্যের সামনে বর্ণনা করে বেড়ায়। অন্যেরা তাতে লবণ মরিচ মাখিয়ে লোকদের সামনে পরিবেশন করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও নিজেদের বক্তব্য বা কুধারণা বর্ণনা করে। এভাবে কেবলমাত্র যৌন কামনা-বাসনার একটি ব্যাপক ধারাই প্রবাহিত হয় না; বরং খারাপ প্রবণতার অধিকারী নারী-পুরুষরা জানতে পারে যে, সমাজের কোথায় কোথায় অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারবে। শরীয়াত প্রথম পদক্ষেপেই এ জিনিসটির পথ রোধ করতে চায়। একদিকে সে হুকুম দেয়, যদি কেউ যিনা করে এবং সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে তার যিনা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে এমন চরম শাস্তি দাও যা কোনো অপরাধে দেয়া হয় না। আবার অন্যদিকে সে ফায়সালা করে, যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোনো কথা বিনা প্রমাণে

নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। ধরে নেয়া যাক যদি অভিযোগকারী কাউকে নিজের চোখে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও তার নীরব থাকা উচিত এবং অন্যদের কাছে একথা না বলা উচিত ফলে ময়লা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে যেতে পারবেনা। তবে তার কাছে সাক্ষী থাকে তাহলে সমাজে আজেবাজে কথা ছড়াবার পরিবর্তে বিষয়টি শাসকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং আদালতে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ আইনটি পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এর বিস্তারিত বিষয়াবলি দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত । তাই নীচে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি-

১. আয়াতে وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয় "যেসব লোক অপবাদ দেয় ।" কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বলে, এখানে অপবাদ মানে সব ধরনের অপবাদ নয়; বরং বিশেষভাবে যিনার অপবাদ। প্রথমে যিনার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামনের দিকে আসছে "লি'আন"-এর বিধান। এ দু'য়ের মাঝখানে এ বিধানটির আসা পরিষ্কার ইংগিত দিচ্ছে এখানে অপবাদ বলতে কোন ধরনের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। তারপর يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ (অপবাদ দেয় সতী মেয়েদেরকে) থেকেও এ মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে এমন অপবাদের কথা বলা হয়েছে যা সতীত্ব বিরোধী। তাছাড়া অপবাদদাতাদের কাছে তাদের অপবাদের প্রমাণস্বরূপ চারজন সাক্ষী আনার দাবী করা হয়েছে। সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থায় একমাত্র যিনার সাক্ষ্যদাতাদের জন্য চারজনের সংখ্যা রাখা হয়েছে। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে সমগ্র উম্মতের আলেম সমাজের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ আয়াতে শুধুমাত্র যিনার অপবাদের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে । এ জন্য উলামায়ে কেরাম স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ "কাযাফ" নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে অন্যান্য অপবাদসমূহ (যেমন কাউকে চোর, শরাবী, সূদখোর বা কাফের বলা) এ বিধানের আওতায় এসে না পড়ে। "কাযাফ" ছাড়া অন্য অপবাদসমূহের শাস্তি কাযী নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন অথবা দেশের মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের জন্য অপমান বা মানহানির কোনো সাধারণ আইন তৈরি করতে পারেন।

২. আয়াতে يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ (সতী নারীদেরকে অপবাদ দেয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধুমাত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া পর্যন্ত এ বিধানটি সীমাবদ্ধ নয়; বরং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষদেরকে অপবাদ দিলেও এ একই বিধান কার্যকর হবে । এভাবে যদিও অপবাদদাতাদের জন্য وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ (যারা অপবাদ দেয়) পুরুষ নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তবুও এ মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই নির্দেশ করা হয়নি; বরং মেয়েরাও যদি "কাযাফ"-এর অপরাধ করে তাহলে তারাও এ একই বিধানের আওতায় শাস্তি পাবে। কারণ অপরাধের ব্যাপারে অপবাদদাতা ও যাকে অপবাদ দেয়া হয় তাদের পুরুষ বা নারী হলে কোনো পার্থক্য দেখা দেয় না। কাজেই আইনের আকৃতি হবে এ রকম- যে কোনো পুরুষ ও নারী কোনো নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও

নারীর ওপর যিনার অপবাদ চাপিয়ে দেবে তার জন্য হবে এ আইন (উল্লখ্য, এখানে "মুহসিন" ও "মুহসিনা" মানে বিবাহিত পুরুষ ও নারী নয়; বরং নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারী ।

৩. অপবাদদাতা যখন কোনো নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকরী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে এ অপবাদ দেবে একমাত্র তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কোনো কলঙ্কযুক্ত ও দাগী চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে এটি প্রযুক্ত হতে পারে না । দুশ্চরিত্র বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে "অপবাদ" দেবার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু যদি সে এমন না হয় , তাহলে তার ওপর প্রমাণ ছাড়াই অপবাদদাতার জন্য কাযী নিজেই শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন অথবা এ ধরনের অবস্থার জন্য মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে পারে।

৪. কোনো মিথ্যা অপবাদ (কাযাফ) দেয়ার কাজটি শাস্তিযোগ্য হবার জন্য শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, একজন অন্য জনের ওপর কোনো প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার অপবাদ দিয়েছে; বরং এ জন্য কিছু শর্ত অপবাদদাতার মধ্যে, কিছু শর্ত যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে এবং কিছু শর্ত স্বয়ং অপবাদ কর্মের মধ্যে থাকা অপরিহার্য।

অপবাদদাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে-

- প্রথমত তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। শিশু যদি অপবাদ দেবার অপরাধ করে তাহলে তাকে আইন শৃংখলা বিধানমূলক (তা'যীর) শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ওপর শরিয়াতী শাস্তি (হদ) জারি হতে পারে না ।
- দ্বিতীয়ত তাকে মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে । পাগলের ওপর "কাযাফের" শাস্তি জারি হতে পারে না । অনুরূপভাবে হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোনো ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন ক্লোরোফরমের প্রভাবাধীন অপবাদদাতাকেও অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না।
- তৃতীয়ত সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় (ফকীহগণের পরিভাষায় 'তায়েআন') এ কাজ করবে । কারোর বল প্রয়োগে অপবাদদানকারীকে অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না ।
- চতুর্থত সে যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার নিজের বাপ বা দাদা নয়। কারণ তাদের ওপর অপবাদের হদ জারি হতে পারে না । এগুলো ছাড়া হানাফীদের মতে পঞ্চম আর একটি শর্তও আছে। সেটি হচ্ছে, সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে, বোবা হবে না । বোবা যদি ইশারা ইংগিতে অপবাদ দেয় তাহলে তার ফলে অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে না । ইমাম শাফেঈর মতে এটা যদি দ্ব্যর্থহীন হয় এবং তা দেখে সে কী বলতে চায় তা লোকেরা বুঝতে পারে, তাহলে তো সে অপবাদদাতা । কারণ তার ইশারা এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও বদনাম করে দেবার ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করার তুলনায় কোনো অংশে কম নয় । পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে

এক ব্যক্তিকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে পারে । তারা তাকে শুধুমাত্র দমনমূলক (তা'যীর) শাস্তি দেবার পক্ষপাতি ।

যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যেও নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে। যেমন-

- প্রথমত তাকে বুদ্ধি সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ তার ওপর এমন অবস্থায় যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় যখন সে বুদ্ধি সচেতন ছিল। পাগলে প্রতি (পরে সে বুদ্ধি সচেতন হয়ে গিয়ে থাক বা না থাক) যিনা করার অপবাদ দানকারী 'কাযাফ'-এর শাস্তিলাভের উপযুক্ত নয়। কারণ পাগল তার নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে পারে না। আর তার বিরুদ্ধে যিনা করার সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও সে যিনার শাস্তির উপযুক্ত হয় না এবং তার মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয় না। কাজেই তার প্রতি অপবাদ দানকারীরো কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ বলেন, পাগলের পরিচিত ব্যভিচারের অপবাদদানকারী কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ সে একটি প্রমাণ বিহীন অপবাদ দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই।
- দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তার ওপর যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। শিশুর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া অথবা যুবকের বিরুদ্ধে এ মর্মে অপবাদ দেয়া যে, সে শৈশবে এ কাজ করেছিল, এ ধরনের অপবাদের ফলে 'কাযাফ'-এর শাস্তি ওয়াজিব হয় না। কারণ পাগলের মত শিশুও নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে কাযাফ-এর শাস্তি তার ওপর ওয়াজিব হয় না এবং তার মান-সম্মানও নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম মালেক বলেন, যে ছেলে প্রাপ্ত বয়স্কের কাছাকাছি পৌছে গেছে তার বিরুদ্ধে যদি যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তো অপবাদদানকারীর ওপর কাযাফ-এর শাস্তি ওয়াজিব হবে না কিন্তু যদি একই বয়সের মেয়ের ওপর যিনা করার অভিযোগ আনা হয় যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, তাহলে তার প্রতি অবাদদানকারী কাযাফ-এর শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র মেয়েরই নয় বরং তার পরিরবারেরও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং মেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যায়।
- তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলমান হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। কাফেরের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা মুসলিমের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, সে কাফের থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার জন্য কাযাফ-এর শাস্তি ওযাজিব করে দেয় না।
- চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে। বাঁদি বা গোলামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা স্বাধীনের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, সে গোলাম থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার জন্য কাযাফ-এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। কারণ গোলামীর

অসহায় ও দুর্বলতার দরুন তার পক্ষে নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হতে পারে। স্বয়ং কুরআনই গোলামীর অবস্থাকে 'ইহ্‌সান' তথা পূর্ণ বিবাহিত অবস্থা গণ্য করেনি। আর সূরা নিসায় শব্দটি বাঁদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দাউদ যাহেরী এ যুক্তি মানেন না। তিন বলেন, বাঁদি ও গোলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদদানকারীও কাযাফ-এর শাস্তিলাভের যোগ্য।

- পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, তাকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তার জীবন যিনা ও যিনাসদৃশ চালচলন থেকে মুক্ত হবে। যিনা মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, সে বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ, সন্দেহযুক্ত মালিকানা বা বিবাহ সদৃশ যৌন সংগম করেনি। তার জীবন যাপন এমন ধরনের নয় যেখানে তার বিরুদ্ধে চিরত্রহীনতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনার অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং যিনার চেয়ে কম পর্যায়ে চরিত্রহীনতার অভিযোগ তার প্রতি ইতোপূর্বে কখনো প্রমাণিত হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রেই তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় এবং এ ধরনের অনিশ্চিত নিষ্কলুষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তি লাভের যোগ্য হতে পারে না। এমন কি যদি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তি জারি হবার আগে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে কখনো কোন যিনার অপরাধের সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ যার প্রতি সে অপবাদ আরোপ করেছিল সে নিষ্কলুষ থাকেনি।

কিন্তু এ পাঁচটি ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি (হদ্) জারি না হবার অর্থ এ নয় যে, পাগল, শিশু, কাফের, গোলাম বা অনিষ্কলুষ ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ ছাড়াই যিনার অপবাদ আরোপকারী দমনমূলক (তা'যীর) শাস্তি লাভের যোগ্য হবে না।

এবার স্বয়ং মিথ্যা অপবাদ কর্মের মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া যেতে হবে সেগুলোর আলোচনায় আসা যাক। একটি অভিযোগকে দু'টি জিনিসের মধ্য থেকে কোনো একটি জিনিস মিথ্যা অপবাদে পরিণত করতে পারে।

- অভিযোগকারী অভিযুক্তের ওপর এমন ধরনের নারী সংগমের অপবাদ দিয়েছে যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে।
- অথবা সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ সন্তান গণ্য করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই এ অপবাদটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা-ইংগিত গ্রহণযোগ্য নয়। এর সাহায্যে যিনা বা বংশের নিন্দার অর্থ গ্রহণ করা মিথ্যা অপবাদদাতার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল হয়। যেমন কাউকে ফাসেক, পাপী, ব্যভিচারী বা দুশ্চরিত্র ইত্যাদি বলে দেয়া অথবা কোনো মেয়েকে বেশ্যা, কস্বী বা ছিনাল বলা কিংবা কোনো সৈয়দকে পাঠান বলে দেয়া এসব ইশারা হয়। এগুলোর মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন মিথ্যা অপবাদ প্রমাণ হয় না। অনুরূপভাবে যেসব শব্দ নিছক গালাগালি হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন

হারামি বা হারামজাদা ইত্যাদিকেও সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করা যেতে পারে না। তবে 'তা'রীয' (নিজের প্রতি আপত্তিকর বক্তব্য অস্বীকৃতির মাধ্যমে অন্যকে খোঁটা দেয়া) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে এটাও অপবাদ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যেমন কেউ অন্যকে সম্বোধন করে বলে, "হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আর যিনাকারী নই" অথবা "আমার মা তো আর যিনা করে আমাকে জন্ম দেয়নি।" ইমাম মালেক বলেন, এমন কোনো "তা'রীয" "কাযাফ" বা যিনার মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রতিপক্ষকে যিনাকারী বা জারজ সন্তান গণ্য করাই বক্তার উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় "হদ" বা কাযাফ-এর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সাথীগণ এবং ইমাম শাফেঈ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে শুবরুমাহ ও হাসান ইবনে সালেহ বলেন, "তা'রীযে"র ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং সন্দেহ সহকারে কাযাফের শাস্তি জারি হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ বলেন, যদি ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে "তা'রীয়" করা হয়, তাহলে তা হবে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আর হাসি-ঠাট্টার মধ্যে করা হলে তা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ হবে না। খলীফাগণের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তা'রীযের জন্য কাযাফ-এর শাস্তি দেন। উমরের আমলে দু'জন লোকের মধ্য গালিগালাজ হয়। একজন অন্য জনকে বলে, "আমার বাপও যিনাকারী ছিল না, আমার মাও যিনাকারিণী ছিল না।" মামলাটি উমরেরর দরবারে পেশ হয়। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা এ থেকে কী মনে করেন। কয়েকজন বলে, "সে নিজের বাপ-মার প্রশংসা করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ-মার প্রশংসা ওপর আক্রমণ করেনি।" "আবার অন্য কয়েকজন বলে," তার নিজের বাপ-মা'র প্রশংসা করার জন্য কি শুধু এ শব্দগুলোই রয়ে গিয়েছিল এ বিশেষ শব্দগুলোকে এ সময় ব্যবহার করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ-মা ব্যভিচারী ছিল।" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় দলটির সাথে একমত হন এবং 'হদ' জারি করেন। (জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা) কারোর প্রতি সমকামিতার অপবাদ দেয়া ব্যভিচারের অপবাদ কিনা এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে ব্যভিচারের অপবাদ গণ্য করেন এবং 'হদ' জারি করার হুকুম দেন।

৫. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ (Cognizable Offence) কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আবী লাইলা বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর হক। কাজেই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে সে দাবী করুক বা নাই করুক মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কাযাফ-এর

শাস্তি জারি করা ওয়াজিব। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো, যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার দাবীর ওপর নির্ভর করে এবং এদিক দিয়ে এটি ব্যক্তির হক। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আওযাঈও এ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে যদি শাসকের সামনে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তা হবে সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ অন্যথায় এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার দাবীর ওপর নির্ভরশীল।

৬. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেবার অপরাধ আপোসে মিটিয়ে ফেলার মতো অপরাধ (Compoundable Offence) নয়। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আদালতে মামলা দায়ের না করাটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হবার পর অপবাদ দানকারীকে তার অপবাদ প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে তার ওপর 'হদ' জারি করা হবে। আদালত তাকে মাফ করতে পারে না, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও পারে না এবং কোনো প্রকার অর্থদণ্ড দিয়েও ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা যেতে পারে না। তাওবা করে মাফ চেয়েও সে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না। নবী ﷺ-এর এ উক্তি আগেই আলোচিত হয়েছে, "অপরাধকে আপোসে মিটিয়ে দাও কিন্তু যে অপরাধের নালিশ আমার কাছে চলে এসেছে, সেটা ওয়াজিব হয়ে গেছে"।

৭. হানাফীদের মতে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবী করতে পারে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজেই অথবা যখন দাবী করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজে উপস্থিত নেই এমন অবস্থায় আর বংশের মর্যাদাহানি হয় সেও দাবী করতে পারে। যেমন- বাপ, মা এবং ছেলেমেয়েরা এ দাবী করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে এটা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভযোগ্য। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা গেলে তার প্রত্যেক শরয়ী উত্তরাধিকার হদ্ জারি করার দাবী জানাতে পারে। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ইমাম শাফেঈ স্ত্রী ও স্বামীকে এর বাইরে গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথেই দাম্পত্য সম্পর্ক খতম হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী কোনো এক জনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে অন্যের বংশের কোনো মর্যাদাহানি হয় না। অথচ এ দু'টি যুক্তিই দুর্বল। কারণ শাস্তি দাবী করাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার বলে মেনে নেবার পর মৃত্যু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে বলে স্বামী ও স্ত্রী এ অধিকারটি লাভ করবে না একথা বলা স্বয়ং কুরআনের বক্তব্য বিরোধী। কারণ কুরআন এক জনের মরে যাওয়ার পর অন্যজনকে উত্তাধিকারী গণ্য করেছে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কোনো একজনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে অন্য জনের বংশের কোনো মর্যাদাহানি হয় না একথাটি স্বামীর ব্যাপারে সঠিক হলেও হতে পারে কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে একদম সঠিক নয়। কারণ যার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তার সমস্ত সন্তান সন্ততির বংশধারাও সন্দেহযুক্ত হয়ে যা। তাছাড়া শুধুমাত্র বংশের

মর্যাদাহানির কারণে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে, এ চিন্তাও সঠিক নয়। বংশের সাথে সাথে মান-সম্মান-ইজ্জত-আবরুর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন পুরুষ ও নারীর জন্য তার স্বামী বা স্ত্রীকে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী গণ্য করা কম মর্যাদাহানিকর নয়। কাজেই ব্যভিচারের মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার দাবী যদি উত্তরাধিকারিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে তা থেকে আলাদা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

৮. কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবার পর কেবলমাত্র নিম্নলিখিত জিনিসটিই তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। তাকে এমন চারজন সাক্ষী আনতে হবে যারা আদালতে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা অপবাদ আরোপিত জনকে ওমুক পুরুষ বা মেয়ের সাথে কার্যত যিনা করতে দেখেছে। হানাফীয়াদের মতে এ চারজন সাক্ষীকে একই সঙ্গে আদালতে আসতে হবে এবং একই সঙ্গে তাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। কারণ যদি তারা একের পর এক আসে তাহলে তাদের প্রত্যেক মিথ্যা অপবাদদাতা হয়ে যেতে থাকবে এবং তার জন্য আবার চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। কিন্তু এটি একটি দুর্বল কথা। ইমাম শাফেঈ ও উসমানুল বাত্তি এ ব্যাপারে যে কথা বলেছেন সেটিই সঠিক। তারা বলেছেন, সাক্ষীদের একসঙ্গে বা একের পর এক আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না; বরং বেশি ভাল হয় যদি অন্যান্য মামালার মতো এ মামলায় সাক্ষীরা একের পর এক আসে এবং সাক্ষ্য দেয়। হানাফীয়াদের মতে এ সাক্ষীদের "আদেল" তথ্য ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া জরুরি নয়। যদি অপবাদদাতা চারজন ফাসেক সাক্ষীও আনে তাহলে সে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিও যিনার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ সাক্ষী "আদেল" নয়। তবে কাফের, অন্ধ, গোলাম বা মিথ্যা অপবাদের অপরাধে পূর্বাহ্নে শাস্তিপ্রাপ্ত সাক্ষী পেশ করে অপবাদদাতা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, অপবাদদাতা যদি ফাসেক সাক্ষী পেশ করে, তাহলে সে এবং তার সাক্ষী সবাই শরীয়াতে শাস্তিযোগ্য হবে। ইমাম মালেকও একই রায় পেশ করেন। এ ব্যাপারে হানাফীয়াদের অভিমতই নির্ভুলতার বেশি নিকটবর্তী বলে মনে হয়। সাক্ষী যদি "আদেল" (ন্যায়নিষ্ঠ) হয় অপবাদদাতা অপবাদের অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু সাক্ষী যদি "আদেল" না হয়, তাহলে অপবাদদাতার অপবাদ, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যিনা ও সাক্ষীদের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাচার সবাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকেও শরীয়াতের শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যেতে পারবে না।

৯. যে ব্যক্তি এমন সাক্ষ্য পেশ করতে সক্ষম হবে না, যা তাকে অপবাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে তার ব্যাপারে কুরআন তিনটি নির্দেশ দেয়- এক, তাকে

৮০ ঘা বেত্রাঘাত করতে হবে। দুই, তার সাক্ষ্য কখনো গৃহীত হবে না। তিন, সে ফাসেক হিসেবে চিহ্নিত হবে। অতঃপর কুরআন বলছে,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

'অর্থ : তারা ছাড়া যারা এরপর তাওবা করে ও সংশোধন করে নেয়, কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (আন নূর : আয়াত-৫)

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাওবা ও সংশোধনের মাধ্যমে যে ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক ঐ তিনটি নির্দেশের মধ্য থেকে কোনটির সাথে আছে। প্রথম হুকুমটির সাথে এর সম্পর্ক নেই, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। অর্থাৎ তাওবার মাধ্যেম "হদ" তথা শরীয়াতের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে না এবং যে কোন অবস্থায়ই অপরাধীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। শেষ হুকুমটির সাথে ক্ষমার সম্পর্ক আছে, এ ব্যাপারেও সকল ফকীহ একমত। অর্থাৎ তাওবা করার ও সংশোধিত হবার পর অপরাধী ফাসেক থাকবে না। আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। (এ ব্যাপারে অপরাধী শুধুমাত্র মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়, না আদালতের ফায়সালা ঘোষিত হবার পর ফাসেক হিসেবে গণ্য হয়, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়। এ কারণে তাঁরা সে সময় থেকেই তাকে প্রত্যাখ্যাত সাক্ষী গণ্য করেন। বিপরীতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সহযোগীগণ ইমাম মালেক বলেন, আদালতের ফায়সালা জারি হবার পর সে ফাসেক হয়। তাই তাঁরা হুকুম জারি হবার পূব পর্যন্ত তাকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী মনে করেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, অপরাধীর আল্লাহর কাছে ফাসেক হওয়ার ব্যাপারটি মিথ্যা অপবাদ দেবার ফল এবং তার মানুষের কাছে ফাসেক হওয়ার বিষয়টি আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এবং তার শাস্তি পাওয়ার ওপর নির্ভর করে।) এখন থেকে যায় মাঝখানের হুকুমটি অর্থাৎ "মিথ্যা অপবাদদাতার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হবে না।" إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا বাক্যাংশটির সম্পর্ক এ হুকুমটির সাথে আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত ব্যাপকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলেন, কেবলমাত্র শেষ হুকুমটির সাথে এ বাক্যাংশটির সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা ও সংশোধন করে নেবে সে আল্লাহর সমীপে এবং মানুষের কাছেও ফাসেক থাকবে না। কিন্তু এ সত্ত্বে প্রথম দু'টি হুকুম অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ অপরাধীর বিরুদ্ধে শরীয়াতের শাস্তি জারি করা হবে এবং তার সাক্ষ্যও চিরকাল প্রত্যাখ্যাত থাকবে। এ দলে রয়েছেন কাযী শুরাইহ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ', ইবনে সিরীন, মাকহুল, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, সুফইয়ান সওরী ও হাসান ইবনে সালেহর মতো শীর্ষ স্থানীয় ফকীহগণ। দ্বিতীয় দলটি বলেন, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا এর সম্পর্ক প্রথম হুকমটির সাথে তো নেই-ই তবে শেষের দু'টো

হুকুমের সাথে আছে অর্থাৎ তাওবার পর মিথ্যা অপবাদে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে এবং সে ফাসেক হিসেবেও গণ্য হবে না। এ দলে রয়েছেন আতা, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম, যুহরী, ইকরামাহ, উমর ইবনুল আব্দুল আযীয, ইবনে আবী নুজাইহ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, মাসরূক, দ্বাহ্হাক, মালেক ইবনে আনাস, উসমান আলবাত্তী, লাইস ইবনে সা'দ, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইবনে জারীর তাবারীর মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ্বৃন্দ। এরা নিজেদের মতের সমর্থনে অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের সাথে সাথে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলায় যে ফায়সালা দিয়েছিলেন সেটিও পেশ করে থাকেন। কারণ তার কোনো কোনো বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, 'হদ' জারি করার পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর নিজের কথায় অনঢ় থাকেন। বাহ্যত এটি একটি বড় শক্তিশালী সমর্থন মনে হয়। কিন্তু মুগীরাহ ইবনে শু'বার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণী পূর্বেই পেশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এ নজিরের ভিত্তিতে এ বিষয়ে যুক্তি প্রদশর্ন করা সঠিক নয়। সেখানে মূল কাজটি ছিল সর্ববাদী সম্মত এবং স্বয়ং মুগীরাহ ইবনে শু'বাও এই অস্বীকার করেননি। মেয়েটি কে ছিল, এ নিয়ে ছিল বিরোধ। মুগীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী, যাকে এরা উম্মে জামীল মনে করেছিলেন। এ সঙ্গে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুগীরার স্ত্রীও উম্মে জামীলের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য ছিল যে, ঘটনাটি যে পরিমাণ আলোয় যতটা দূর থেকে দেখা গেছে তাতে মেয়েটিকে উম্মে জামীল মনে করার মতো ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভানা ছিল। কিন্তু আন্দাজ-অনুমান সবকিছু ছিল মুগীরার পক্ষে এবং বাদীপক্ষের একজন সাক্ষী একথা স্বীকার করেছিলেন যে, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না।

এ কারণে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহগীরাহ ইবনে শু'বার পক্ষে রায় দেন এবং ওপরে উল্লেখিত হাদীসে যে কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে আবু বকরকে শাস্তি দেবার পর সেগুলো বলেন। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, ওমরের উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা বুঝানো যে, তোমরা অযথা একটি কুধারণা পোষণ করেছিলে, একথা মেনে নাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেবার ওয়াদা কর। অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষ্য কখনো গৃহীত হবে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে না যে, সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত ব্যক্তিগণ যদি তাওবা করে তাহলে এরপর উমরের মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। আসলে এ বিষয়ে প্রথম দলটির মতই বেশি শক্তিশালী মনে হয়। মানুষের তাওবার অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় । আমাদের সামনে যে ব্যক্তি তাওবা করবে আমরা তাকে বড় জোর ফাসেক বলবো না। এতটুকু সুবিধা তাকে আমরা দিতে পারি। কিন্তু যার মুখের কথার ওপর আস্থা একবার খতম হয়ে গেছে সে কেবলমাত্র আমাদের সামনে তাওবা করছে বলে তার মুখের কথাকে আবার দাম দিতে থাকবো, এত বেশি

সুবিধা তাকে দেয়া যেতে পারে না। এ ছাড়া কুরআনের আয়াতের বর্ণনাভংগীও একথাই বলছে-। إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (তবে যারা তাওবা করেছে) এর সম্পর্ক শুধুমাত্র أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (তারাই ফাসেক) এর সাথেই রয়েছে। তাই এ বাক্যের মধ্যে প্রথম দু'টি কথা বলা হয়েছে কেবলমাত্র নির্দেশমূলক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ "তাদেরকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না।" আর তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে খবর পরিবেশন করার ভংগীতে ছাড়া যারা তাওবা করে নিয়েছে" একথা বলা প্রকাশ করে দেয় যে এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষের খবর পরিবেশন সংক্রান্ত বাক্যাংশটির সাথে সম্পর্কিত। পূর্বের দু'টি নির্দেশমূলক বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। তবুও যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষ বাক্যাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে এরপর বুঝে আসে না তা "সাক্ষ্য গ্রহণ করো না" বাক্যাংশ পর্যন্ত এসে থেমে গেল কেন, "আশি ঘা বেত্রাঘাত করো" বাক্যাংশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল না কেন ।

১০. প্রশ্ন করা যেতে পারে, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا এর মাধ্যমে ব্যতিক্রম করাটাকে প্রথম হুকুমটির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া যায় না কেন? মিথ্যা অপবাদ তো আসলে এক ধরনের মানহানিই। এরপর এর ব্যক্তি নিজের দোষ মেনে নিয়েছে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতের এ ধরনের কাজ করবে না বলে তাওবা করেছে। তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না কেন? অথচ আল্লাহ নিজেই হুকুম বর্ণনা করার পর বলছেন, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا .... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু বান্দা মাফ করবে না, এটাতো সত্যই বড় অদ্ভুত ব্যাপার হবে। এর জবাব হচ্ছে, তাওবা আসলে ه ب و ت সমন্বিত চার অক্ষরের একটি শব্দ মাত্র নয়; বরং হৃদয়ের লজ্জানুভূতি, সংশোধনের দৃঢ়সংকল্প ও সততার দিকে ফিরে যাওয়ার নাম। আর এ জিনিসটির অবস্থা আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই তাওবার কারণে পার্থিব শাস্তি মাফ হয় না; বরং শুধুমাত্র পরকালীন শাস্তি মাফ হয়। এ কারণে আল্লাহ বলেননি, যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও; বরং বলেছেন, যারা তাওবা করে নেবে আমি তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুনাময়। যদি তাওবার সাহায্যে পার্থিব শাস্তি মাফ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করবে না এমন অপরাধী কে আছে?

১১. এ প্রশ্নও করা যেতে পারে, এক ব্যক্তির নিজের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে না পারার মানতে এ নয় যে, সে মিথ্যুক। এটা কি সম্ভব নয় যে, তার অভিযোগ যথার্থই সঠিক কিন্তু সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। তাহলে শুধুমাত্র প্রমাণ পেশ করতে না পারার কারণে তাকে কেবল মানুষের সামনেই নয়, আল্লাহর সামনেও ফাসেক গণ্য করা হবে, এর কারণ কী? এর জবাব হচ্ছে, এক ব্যক্তি নিজের চোখেও যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলেও সে তা নিয়ে আলোচনা করলে এবং সাক্ষী ছাড়া তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে থাকলে গোনাহগার হবে। এক ব্যক্তি যদি কোনো ময়লা-আবর্জনা নিয়ে এক কোণে

বসে থাকলে তাহলে অন্য ব্যক্তি উঠে সমগ্রসমাজ দেহে তা ছড়িয়ে বেড়াক আল্লাহর শরীয়াত এটা চায় না। সে যদি এ ময়লা-আবর্জনার খবর জেনে থাকে তাহলে তার জন্য দু'টি পথ থাকে । যেখানে তা পড়ে আছে সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেবে অথবা তার উপস্থিতির প্রমাণ পেশ করবে, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ তা পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। এ দু'টি পথ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ তার জন্য নেই। যদি সে জনগণের মধ্যে এর আলোচনা শুরু করে দেয় তাহলে এক জায়গায় আটকে থাকা আবর্জনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। আর যদি সে যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ্য ছাড়াই বিষয়টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদদের কাছে নিয়ে যায় তাহলে শাসকগণ তা পরিষ্কার করতে পারবেন না। ফলে এ মামলায় ব্যর্থতা আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ার কারণও হবে এবং ব্যভিচারীদের বাস্তবে যতই সত্যবাদী হোক না কেন সে একজন ফাসেকই।

১২. মিথ্যা অপবাদের 'হদে'র ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে অপবাদদাতাকে যিনাকারীর তুলনায় হাল্কা মার মারতে হবে। অর্থাৎ ৮০ ঘা বেতই মারা হবে কিন্তু যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে প্রহার করা হয় তাকে ঠিক ততটা কঠোরভাবে প্রহার করা হবে না। কারণ যে অভিযোগের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে তার মিথ্যাবাদী হওয়াটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

১৩. মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হচ্ছে যে, অপবাদদাতা শাস্তি পাবার আগে বা মাঝখানে যতবারই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করুক না কেন 'হদ' তার ওপর একবারই জারী হবে। আর যদি হদ জারী করার পর সে নিজের পূর্ববর্তী অপরাধেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তাহলে যে 'হদ' তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে তাই যথেষ্ট হবে।

নিজের স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে তার বিধান

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ . وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ . وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ . وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নাত। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং

পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না এবং আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন নূর : আয়াত : ৬-১০)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াত পেছনের আয়াতের কিছুকাল পরে নাযিল হয়। মিথ্যা অপবাদের বিধান যখন নাযিল হয় তখন লোকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়, ভিন পুরুষ ও নারীর চরিত্রহীনতা দেখে তো মানুষ সবর করতে পারে, সাক্ষী না থাকলে ঠোঁটে তালা লাগাতে পারে এবং ঘটনাটি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর চরিত্রহীনতা দেখলে কী করবে? হত্যা করলে তো উল্টো শাস্তি লাভের যোগ্য হয়ে যাবে। সাক্ষী খুঁজতে গেলে তাদের আসা পর্যন্ত অপরাধী সেখানে অপেক্ষা করতে যাবে কেন আর সবর করলে তা করবেই বা কেমন করে। তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারে। কিন্তু এর ফলে না মেয়েটির কোনো বস্তুগত বা নৈতিক শাস্তি হলো, না তার প্রেমিকের। আর যদি তার অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয়, তাহলে অন্যের সন্তান নিজের গলায় ঝুলালো।

এ প্রশ্নটি প্রথমে সা'দ ইবনে উবাদাহ একটি কাল্পনিক প্রশ্নের আকারে পেশ করেন। তিনি এতদূর বলে দেন, আমি যদি আল্লাহ না করুন নিজের ঘরে এ অবস্থা দেখি, তাহলে সাক্ষীর সন্ধানে যাবো না; বরং তলোয়ারের মাধ্যমে তখনই এর হেস্তনেস্ত করে ফেলবো। (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মাত্র কিছুদিন পরেই এমন কিছু মামলা দায়ের হলো যেখানে স্বামীরা স্বচক্ষেই এ ব্যাপার দেখলো এবং নবী ﷺ-এর কাছে এর অভিযোগ নিয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমরের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আনসারদের এক ব্যক্তি (সম্ভবত উওয়াইমির আজ্‌লানী) রাসূলের সামনে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে পায় এবং সে মুখ থেকে সে কথা বের করে ফেলে, তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের "হদ" জারি করবেন, হত্যা করলে আপনি তাকে হত্যা করবেন, নীরব থাকলে সে চাপা ক্রোধে ফুঁসতে থাকবে। শেষমেশ সে করবে কী? একথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেন, হে আল্লাহ! এ বিষয়টির ফায়সালা করে দাও। (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ, আহমাদ)

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হেলাল ইবনে উমাইয়াহ এসে নিজের স্ত্রীর ব্যাপারটি পেশ করেন। তিনি তাকে নিজের চোখে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে দেখেছিলেন। নবী ﷺ বলেন, "প্রমাণ আনো, অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি জারি হবে।' এতে সাহাবীদের মধ্যে সাধারণভাবে পেরেশানী সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হেলাল বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি একদম সঠিক ঘটনাই তুলে ধরছি, আমার চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং কান শুনেছে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার ব্যাপারে এমন হুকুম নাযিল করবেন যা আমার পিঠ বাঁচাবে। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়। (বুখারী, আহমাদ ও আবুদ দাউদ)

এখানে মীমাংসার যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছে তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় "লি'আন" বলা হয়।

এ হুকুম এসে যাবার পর নবী ﷺ যেসব মামলার ফায়সালা দেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিতাবগুলোতে লিখিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেগুলোই লি'আন সংক্রান্ত বিস্তারিত আইনগত কার্যধারার উৎস।

হেলাল ইবনে উমাইয়ার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও মুসনাদে আহমাদ এবং তাফসীরে ইবনে জারিরে ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হবার পর হেলাল ও তার স্ত্রী দু'জনকে নবীর আদালতে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আল্লাহর হুকুম শুনান। তারপর বলেন, "খুব ভালভাবে বুঝে নাও, আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চাইতে কঠিন।" হেলাল বলেন, "আমি এ বিরুদ্ধে একদম সত্য অভিযোগ দিয়েছি।" স্ত্রী বলে, "এ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বেশ, তাহলে এদের দু'জনের মধ্যে লি'আন করানো হোক।" তদানুসারে প্রথমে হেলাল উঠে দাঁড়ায়। তিনি কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কসম খাওয়া শুরু করেন। এ সময় নবী ﷺ বারবার বলতে থাকেন, "আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যেবাদী। তারপর কি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাওবা করবে। "পঞ্চম কসমের পূর্বে উপস্থিত লোকেরা হেলালকে বললো, "আল্লাহকে ভয় করো। দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে হালকা। এ পঞ্চম কসম তোমার ওপর শাস্তি ওয়াজিব করে দেবে।"

কিন্তু হেলাল বলেন, যে আল্লাহ এখানে আমার পিঠ বাঁচিয়েছেন তিনি পরকালেও আমাকে শাস্তি দেবেন না। একথা বলে তিনি পঞ্চম কসমও খান। তারপর তার স্ত্রী ওঠে। সেও কসম খেতে শুরু করে। পঞ্চম কসমের পূর্বে তাকেও থামিয়ে বলা হয়, "আল্লাহকে ভয় করো, আখেরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব বরদাশত করে নেয়া সহজ। এ শেষ কসমটি তোমার ওপর আল্লাহর আযাব ওয়াজিব করে দেবে।" একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে যায় এবং ইতঃস্তত করতে থাকে। লোকেরা মনে করে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারপ সে বলতে থাকে। "আমি চিরকালের জন্য নিজের গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না।" তারপর সে পঞ্চম কসমটি ও খায়। অতঃপর নবী ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা দেন, এর সন্তান (যে তখন মাতৃগর্ভে ছিল) মায়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। বাপের সাথে সম্পর্কিত করে তার নাম ডাকা হবে না। তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবার অধিকার করোর থাকবে না। যে ব্যক্তি তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবে সে মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তির অধিকারী হবে। ইদ্দতকালে তার খোরপোশ ও বাসস্থানলাভের কোনো অধিকার হেলালের ওপর বর্তায় না। কারণ তাকে তালাক বা মৃত্যু ছাড়াই স্বামী থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তারপর তিনি লোকদের বলেন, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখো সে কার মতো হয়েছে। যদি এ আকৃতির হয় তাহলে হেলালের হবে। আর যদি ঐ

আকৃতির হয়, তাহলে যে ব্যক্তির সাথে মিলিয়ে একে অপবাদ দেয়া হয়েছে এ তার হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেলো সে শেষোক্ত ব্যক্তির আকৃতি পেয়েছে। এ অবস্থায় নবী ﷺ বলেন, "যদি কসমসমূহ না হতো (অথবা আল্লাহর কিতাব প্রথমেই ফায়সালা না করে দিতো) তাহলে আমি এ মেয়েটির সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম।"

'উওয়াইমির আজলানীর মামলার বিবরণ পাওয়া যায় বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদ। সাহল ইবনে সা'দ সা'ঈদী ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, উওয়াইমির ও তাঁর স্ত্রী উভয়কে মসজিদে নববীতে ডাকা হয়। তারা নিজেদের ওপর 'লি'আন' করার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকেও সতর্ক করে দিয়ে তিনবার বলেন, "আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাহলে কি তোমাদের কেউ তাওবা করবে?" দু'জনের কেউ যখন তাওবা করলো না তখন তাদের 'লি'আন' করানো হয়। এরপর 'উওয়াইমির বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি এ স্ত্রীকে রেখে দিই তাহলে মিথ্যুক হবো।" একথা বলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হুকুম দেয়া ছাড়াই তিনি তিন তালাক দিয়ে দেন। সাহল ইবনে সা'দ বলেন, " রাসূলুল্লাহ ﷺ এ তালাক জারি করেন, তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং বলেন, "যে দম্পতি লি'আন করবে তাদের জন্য এ ছাড়াছাড়ি।" লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার এ সুন্নত কায়েম হয়ে যায়। এরপর তারা আর কখনো একত্র হতে পারবে না। সাহল ইবনে সা'দ একথাও বর্ণনা করেন যে, স্ত্রী গর্ভবতী ছিল এবং 'উওয়াইমির বলেন, এ গর্ভ আমার ঔরসজাত নয়। এ জন্য শিশুকে মায়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয় এবং এ সুন্নত জারি হয় যে, এ ধরনের সন্তান মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে।

এ দু'টি মামলা ছাড়া হাদীসের কিতাবগুলোতে আমরা এমন বহু রেওয়ায়াত পাই যেগুলো থেকে এ মামলাগুলো কাদের সাথে জড়িত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। হতে পারে সেগুলোর কোনো কোনোটি এ দু'টি মামলার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কয়েকটিতে অন্য কিছু মামলার কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে লি'আন আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত হল।

ইবনে উমর একটি মামলার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রী লি'আন শেষ করার পর নবী ﷺ তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ ও ইবনে জারীর)

ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। (সিহাহ সিত্তা ও আহমাদ) ইবনে উমরেরই আর একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, উভয়ের লি'আন করার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যুক।" তারপর তিনি পুরুষটিকে

বলেন, "এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর ওপর নিজের কোনো অধিকার দেখাতে পারো না। এর ওপর কোনো রকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রকার প্রতিশোধমলূক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই"। পুরুষটি বলে হে, আল্লাহর রাসূল! আর আমার সম্পদ। (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সম্পদ ফেরত নেবার কোনো অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার ওপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে ঐ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল করে তার থেকে লাভ করেছো। আর যদি তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো। তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনা তোমার কাছ থেকে তা বেশি দূরে রয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

দারুকুত্নী আলী ইবনে আবু তালেব ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উক্তি উদ্ধৃতি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, "সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো একত্র হতে পারে না।" (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আর কোনো দিন তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না)। আবার এ দারাকুতনী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেন, এরা দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারে না।

কাবীসাহ ইবনে যুওয়াইব বর্ণনা করেছেন, উমরের আমলে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অবৈধ গণ্য করে তারপর আবার তা নিজের বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বলতে থাকে, এ শিশু আমার নয়। ব্যাপারটি হযরত উমরেরর আদালতে পেশ হয়। তিনি তার ওপর কাযাফের শাস্তি জারি করেন এবং ফায়সালা দেন, শিশু তার সাথেই সম্পর্কিত হবে। (দারাকুতনী, বাইহাকী)।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার একটি স্ত্রী আছে, আমি তাকে ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ঠেলে দেয় না। (উল্লেখ্য, এটি একটি রূপক কথা ছিল। এর অর্থ যিনাও হতে পারে আবার যিনার কম পর্যায়ের নৈতিক দুর্বলতাও হতে পারে।) নবী ﷺ বলেন, তালাক দিয়ে দাও। সে বলে, আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারি না। জবাব দেন, তুমি তাকে রেখে দাও। (অর্থাৎ তিনি তার কাছ থেকে তার ইংগিতের ব্যাখ্যা নেননি এবং তার উক্তিকে যিনার অপবাদ হিসেবে গণ্য করে লি'আন করার হুকুম দেননি।) (নাসাঈ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এক ব্যাক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার স্ত্রী কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। আমি তাকে আমার সন্তান বলে মনে করি না। (অর্থাৎ নিছক শিশু সন্তানের গায়ের রং তাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। নয়তো তার দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ লাগাবার অন্য কোনো কারণ ছিল না।) রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন, তোমার তো কিছু উট আছে। সে বলে, হ্যাঁ, আছে। জিজ্ঞেস করেন, সেগুলোর রং কী? জবাব দেয় লাল। জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনোটা কি খাকি রংয়ের আছে?

জবাব দেয়, জি হ্যাঁ, কোনো কোনোটা এমনও আছে। জিজ্ঞেস করেন, এ রংটি কোথায় থেকে এলো? জবাব দেয়, হয়তো কোনো শিরা টেনে নিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদাদের কেউ এ রংয়ের থেকে থাকবে এবং তার প্রভাব এর মধ্যে এসে গেছে।) তিনি বলেন, "সম্ভবত এ শিশুটিকেও কোনো শিরা টেনে নিয়ে গেছে।" তারপর তিনি তাকে সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার অনুমতি দেননি। (বুখারী,মুসলিম, আহমাদ ও আবুদ দাউদ।)

আবু হুরাইরার রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লি'আন সম্পর্কিত আয়াত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "যে স্ত্রী কোনো বংশে এমন সন্তান প্রবেশ করায় যে ঐ বংশের নয় (অর্থাৎ হারামের শিশু গর্ভে ধারণ করে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়) তার আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে অথচ সন্তান তাকে দেখছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে পর্দা করবেন এবং পূর্বের ও পরের সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী।)

লি'আনের আয়াত এবং এ হাদীসগুলো, নজিরসমূহ ও শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতিগুলোই হচ্ছে ইসলামের লি'আনের আইনের উৎস। এগুলোর আলোকে ফকীহ্গণ লি'আনের বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরি করেছে। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছে-

১. যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লি'আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে 'হদ' জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে। মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সঙ্গে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে।

(নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)।

২. ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরি।

৩. লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার ওপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে।

৪. সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি'আনের যোগ্যতা সম্পন্ন হবার জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী মুসলিম বা কাফের, গোলাম বা স্বাধীন, গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের অধিকারী হোক বা না হোক এবং মুসলিম স্বামীর স্ত্রী মুসলমান বা যিম্মী যেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, লি'আন শুধুমাত্র এমন স্বাধীন মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে যারা কাযাফের অপরাধে শাস্তি পায়নি। যদি স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই কাফের, গোলাম বা কাযাফের অপরাধে পূর্বেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লি'আন হতে পারে না। এ ছাড়াও যদি স্ত্রীর এর আগেও কখনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে কোনো পুরুষের সাথে মাখামাখি করে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লি'আন ঠিক হবে না। হানাফীগণের এ শর্তগুলো আরোপ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের মতে লি'আন ও কাযাফের আইনের মধ্যে এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই যে, অন্য ব্যক্তি যদি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য রয়েছে 'হদ' আর স্বামী এ অপবাদ দিলে সে লি'আন করে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। বাকি অন্যান্য সবদিক দিয়ে লি'আন ও কাযাফ একই জিনিস। এ ছাড়াও হানাফীদের মতে যেহেতু লিয়ানের কসম সাক্ষ্য দেবার মর্যাদা রাখে, তাই সাক্ষ্য দেবার যোগ্যতা নেই এমন কোনো ব্যক্তিকে তারা এর অনুমতি দেয় না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত দুর্বল এবং ইমাম শাফেঈ যে কথাটি বলেছেন সেটিই সঠিক। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, কুরআন স্ত্রীর বিরুদ্ধে কাযাফের ব্যাপারটিকে কাযাফের আয়াতের একটি অংশে পরিণত করেনি; বরং সে জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন বর্ণনা করেছেন তাই তাকে কাযাফের আয়াতের শব্দাবলি থেকে আলাদা এবং উভয় হুকুমও ভিন্ন। তাই লি'আনের আয়াত থেকেই লি'আনের বিধান গ্রহণ করা উচিত। কাযাফের আয়াত থেকে নয়। যেমন কাযাফের আয়াতের শাস্তি লাভের যোগ্য হচ্ছে এমন লোক যে সতী সাধ্বী স্ত্রীর শর্ত আরোপ করা হয়নি। একটি মেয়ে কোনো সময় হয়তো পাপ কাজ করেছিল, যদি পরবর্তীকালে সে তাওবা করে কোনো পুরুষকে বিয়ে করে এবং তারপর তার স্বামী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাহলে লি'আনের আয়াত একথা বলে না যে, এ মেয়ের স্বামীকে এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবার বা এর সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার ব্যাপক অনুমতি দিয়ে দাও, কারণ এর জীবন এক সময় কলুষিত ছিল। দ্বিতীয় এবং ঠিক একই পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে কাযাফ ও অপরিচিতার বিরুদ্ধে কাযাফের মধ্যে আসমান যমীন ফারাক। এদের উভয়ের ব্যাপারে আইনের প্রকৃতি এক হতে পারে না। পরনারীর সাথে অন্য পুরুষের

আবেগ-অনুভূতি, ইজ্জত-আবরু, সমাজ-সংস্কৃতি ও বংশ গোত্রগত কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। তার চালচলনের ব্যাপারে যদি কোনো ব্যক্তির খুব বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে তা হবে তার সমাজকে চরিত্রহীনতা মুক্ত দেখার আবেগ থেকে। পক্ষান্তরে নিজের স্ত্রীর সাথে মানুষের সম্পর্ক এক ধরনের নয়, কয়েক ধরনের এবং অত্যন্ত গভীর। সে একাধারে তার বংশধারা, ধন-সম্পদ ও গৃহের আমানতদার। তার জীবন সঙ্গিনী। তার গোপনীয়তার সংরক্ষক। তার অত্যন্ত গভীর ও সংবেদনশীল আবেগ-অনুভূতি তার সাথে জড়িত। তার খারাপ চালচলনে মানুষের আত্মমর্যাদা, ইজ্জত, স্বার্থ ও ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর সুগভীর আঘাত আসে। এ দু'টি ব্যাপার কোন্ দিক দিয়ে এক, যার ফলে উভয়ের জন্য আইনের একই প্রকৃতি হতে হবে। একজন যিম্মী, অথবা গোলাম কিংবা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর ব্যাপার কি কোনো স্বাধীন সাক্ষ্যদানের যোগ্য মুসলমানের ব্যাপার থেকে সামান্যতম ভিন্ন অথবা গুরুত্ব ও ফলাফলের দিক দিয়ে একটুখানিও কম। সে যদি নিজের চোখের নিজের স্ত্রীকে কারোর সাথে ঢলাঢলি করতে দেখতো অথবা সে যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো যে, তার স্ত্রী অন্য কারোর সংস্পর্শে গর্ভবতী হয়ে গেছে, তাহলে তাকে লি'আন করার অধিকার না দেবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ আছে কি। আর এ অধিকার তার থেকে ছিনিয়ে নেবার পর আমাদের আইনে তার জন্য আর কি পথ আছে। কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার জানা যায়।

বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীর যথার্থ ব্যভিচার বা অবৈধ গর্ভধারণের ফলে একজন স্বামী এবং স্বামীর মিথ্যা অপবাদ বা সন্তানের বংশ অযথা অস্বীকারের ফলে একজন
স্বামী এবং স্বামীর মিথ্যা অপবাদ বা সন্তানের বংশ অযথা অস্বীকারের ফলে একজন
স্ত্রী যে জটিল সমস্যায় ভুগতে থাকে কুরআন তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি উপায় বের করতে চায়। এ প্রয়োজন শুধুমাত্র সাক্ষ্যদানের যোগ্য স্বাধীন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং কুরআনের শব্দাবলির মধ্যেও এমন কোনো জিনিস নেই যা এ প্রয়োজনটি শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তবে কুরআন লি'আনের কসমকে সাক্ষ্যদান হিসেবে গণ্য করেছে তাই সাক্ষ্যদানের শর্তাবলি এখানে আরোপিত হবে, এ যুক্তি পেশ করলে এর দাবী হবে, ন্যায়নিষ্ঠ গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের অধিকারী স্বামী যদি কসম খায় এবং স্ত্রী কসম খেতে ইতঃস্তত করে তাহলে স্ত্রীকে রজম করা হবে। কারণ ব্যভিচারের ওপর সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে, এ অবস্থায় হানাফীগণ রজম করার হুকুম দেন না। তারা নিজেরাই যে এ কসমগুলোকে হুবহু সাক্ষ্যের মর্যাদা দান করেন না এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। বরং সত্য বলতে কি স্বয়ং কুরআনও এ কসমগুলোকে সাক্ষ্য শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করল এগুলোকে সাক্ষ্য গণ্য করে না। নয়তো স্ত্রীকে চারটি কসমের পরিবর্তে আটটি কসম খাবার হুকুম দিতো।

৫. নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে না; বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সা'দ এর ওপর আরো এ শর্তটি বাড়ান যে, কসম খাবার সময় স্বামীকে বলতে হবে, সে নিজের চোখে স্ত্রীকে ব্যভিচারে রত থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন শর্ত। কুরআনে এর কোনো ভিত্তি নেই, হাদীসেও নেই।

৬. যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতঃস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীগণ বলেন, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষন সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ, হাসান ইবনে, সালেহ ও লাইস ইবনে সা'দের মতে, লি'আন করতে ইতঃস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। তাই কাযাফের হদ্ ওয়াজিব হয়ে যায়।

৭. স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি'আন করতে ইতঃস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা তারপর যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরিউক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ উক্তি থেকে পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চতভাবেই সে শাস্তিযোগ্য হবে। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা হচ্ছে, কুরআন এখানে "শাস্তির' ধরন বলে দেয়নি; বরং সাধারণভাবে শাস্তির কথা বলছে। যদি বলা হয়, শাস্তি মানে এখানে যিনার শাস্তিই হতে পারে, তাহলে এর জবাব হচ্ছে, যিনার শাস্তির জন্য কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় চার জন সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেছে। নিছক এক জনের চারটি কসম এ শর্ত পূরা করতে পারে না। স্বামীর কসম তো তার নিজের কাযাফের শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া এবং স্ত্রীর ওপর লি'আনের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তার মাধ্যমে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর জবাবী কসম খেতে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয় এবং বড়ই গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্ জারি করা যেতে পারে না। এ বিষয়টিকে পুরুষের কাযাফের হদের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ তার কাযাফ তো প্রমাণিত, এ কারণেই তাকে লি'আন করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এর বিপরীতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ প্রমাণিত হয়। কারণ তার নিজের স্বীকারোক্তি অথবা চারজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া তা প্রমাণিত হতে পারে না।

৮. যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার ঔরসজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিণী হয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে, যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

৯. ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরই ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে; বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছ যখন তার মতে এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোনো কোনো রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

১০. যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর (সে গ্রহণ করাটা যে কোনো পর্যায়েরই হোক না কেন, সুস্পষ্ট শব্দাবলি ও বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক অথবা এমন কাজ করা হোক যাতে মনে হয় শিশুকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে যেমন, জন্মের পর মোবারকবাদ গ্রহণ করা অথবা শিশুর সাথে পিতৃসুলভ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা কিংবা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা) পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশাধারা অস্বীকার করলে কাযাফের শাস্তির অধিকারী হবে। তবে পিতা কতক্ষণ পর্যন্ত বংশদারা অস্বীকার করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মালেকের মতে, স্ত্রী যে সময় গর্ভবতী ছিল সে সময় যদি স্বামী গৃহে উপস্থিত থেকে থাকে তাহলে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে নিজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়-কালের মধ্যে স্বামীর জন্য সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার সুযোগ আছে। এরপর তার অস্বীকার করার অধিকার নেই। তবে এ সময় যদি সে অনুপস্থিত থেকে থাকে এবং তার অসাক্ষাতে সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে যখনই সে জানবে তখন তাকে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন করে সন্তানের দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক-দু'বছর পরে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন হবে ঠিকই কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেব না। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে বা জন্ম সম্পর্ক

জানার পরে চল্লিশ দিনের মধ্যে পিতার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার আছে। এরপর এ অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ চল্লিশ দিনের শর্ত অর্থহীন। সঠিক কথা সেটিই যেটি ইমাম আবু হানীফা বলেছেন। অর্থাৎ জন্মের পর বা জন্মের কথা জানার পর এক-দু'দিনের মধ্যেই বংশাধারা অস্বীকার করা যেতে পারে। তবে যদি এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে, যাকে যথার্থ বাধা বলে স্বীকার করে নেয়া যেত পারে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

১১. যদি স্বামী তালাক দেবার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না; বরং তার বিরুদ্ধে কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজঈ তালাক হয় এবং রুজু (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) করার সময়-কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে, এটি শুধুমাত্র এমন অবস্থায় কাযাফ হবে যখন কোনো গর্ভস্থিত বা ভূমিষ্ঠ সন্তানের বংশধারা গ্রহণ করা বা না করার সমস্যা মাঝখানে থাকবে না। অন্যথায় বায়েন তালাক দেবার পরও পুরুষের লি'আন করার অধিকার থাকে। কারণ সে স্ত্রী লোককে বদনাম করার জন্য নয় বরং নিজেই এমন এক শিশুর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে লি'আন করছে যাকে সে নিজের বলে মনে করে না। ইমাম শাফেঈ প্রায় এই একই মত দিয়েছেন।

১২. লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোনোটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোনোটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

- স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোনো শাস্তি লাভের উপযুক্ত হয় না।
- স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে।
- নারীকে ব্যভিচারিণী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি'আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে তার ব্যভিচারিণী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে তবুও তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করলে সে 'হদে'র যোগ্য হবে।
- নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না।
- ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না।
- নারী ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, লি'আনের পরে পুরুষ ও নারী কীভাবে আলাদা হবে। দুই, লি'আনের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব? প্রথম বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ লি'আন শেষ করবে, নারী জবাবী লিআন করুক বা না করুক তখনই সাথে সাথেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফার বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন লি'আন শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন, লি'আনের ফলে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না; বরং আদালত ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই ছাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথায় আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দ্বিতীয় বিষয়টিতে ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, যুফার, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, শাফেঈ, আহমেদ ইবনে হাম্বল ও হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, লি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেলে তারা এরপর থেকে চিরকালের জন্য পরস্পরের ওপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও কোনো অবস্থাতেই পারবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও রাদিয়াল্লাহু আনহু একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার ওপর কাযাফের হদ জারি হয়ে যায় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষণ তারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সতী সম্ভ্রান্ত নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারীর জন্য মহাশাস্তি অবধারিত

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ : যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি। (আন নূর : আয়াত-১১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়েশার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটানো হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ অপবাদকে "ইফক" শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ অপরাধকে পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। 'ইফক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কথা উলটে দেয়া, বাস্তব ঘটনাকে বিকৃতি করে দেয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটিকে ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর কোনো দোষারোপ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলে তখন এর অর্থ হয় সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ।

এ সূরাটি নাযিলের মূলে যে ঘটনাটি আসল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল এখান থেকে তার ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনার মাধ্যমে তা তুলে ধরছি- "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সঙ্গে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।"(এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিলো না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যাথা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফয়সালা করতেন। শরীয়তে এমন অবস্থার জন্য লটারীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারে সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোনো ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবল মাত্র একজনকে দেয়া যেতে পারে।) বনীল মুসতালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রাত্রিকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফেলার যাত্রা বিরত্রি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তার খোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে

যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উঠের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাতলা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উঠের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখানে দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পর্দার হুকুম নাযিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস। তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামায যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাঙবে, সাথে সাথে নামাজ পড়ে নিবে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোনো জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী ﷺ তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন।) আমাকে দেখে তিনি উট থামিয়ে নেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন।" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সাথে সাথেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনার কুচক্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, সে সময় সাফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে আয়েশা ﵂ সেনা শিবিরে এসে পৌঁছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিষ্কলংক

অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌঁছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচখচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন (ও কেমন আছে?)

নিজে আমার সাথে কোনো কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গেলাম যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিসতাহ ইবনে উসামার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ আবু বকর সিদ্দিকের রাদিয়াল্লাহু আনহু জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিসতাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন, "ধ্বংস হোক মিসতাহ।" আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?" তারপর তিনি গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কিসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিসতাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাসসান ইবনে সাবেত ও যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা বোন হামনা বিনতে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজনের কারণে আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।"

সামনের দিকে এগিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আমি চলে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর

যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।' কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, 'সে আল্লাহ্‌র কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোনো কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।' সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় বলেন, 'হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে! তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোনো খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়িতে আসেনি।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন, "এ মিথ্যা অপবাদের গুজব কমবেশি এক মাস ধরে সারা শহরে ছড়াতে থাকে। নবী ﷺ মারাত্মক ধরনের মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকেন। আমি কাঁদতে থাকি। আমার বাপ-মা চরম পেরেশানী ও দুঃখে-শোকে ভুগতে থাকেন। শেষে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসেন এবং আমার কাছে বসেন। এ সমগ্র সময়-কালে তিনি কখনো আমার কাছে বসেননি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উম্মে রুমান (আয়েশার মা) অনুভব করেন আজ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর কথা হবে। তাই তাঁরা দু'জনেও কাছে এসে বসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তোমার অপরাধ মুক্তির কথা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি তুমি সত্যিই গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। বান্দা যখন তার গোনাহ স্বীকার করে নিয়ে তাওবা করে তখন আল্লাহ্ তা মাফ করে দেন। একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে যায়। আমি আমার পিতাকে বলি, আপনি রাসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বলেন, "মা, আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, কী বলবো।" আমি আমার মাকে বললাম, "তুমিই কিছু বলো" তিনিও একই কথা বলেন, "আমি কী বলবো বুঝতে পারছি না।" একথায় আমি বলি, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে এবং তা মনের মধ্যে জমে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি নিরপরাধ-এবং আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন আমি নিরপরাধ- তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন না। আর যদি এমন একটি কথা আমি স্বীকার করে নিই যা আমি করিনি- আর আল্লাহ্ জানেন আমি করিনি- তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন। আমি সে সময় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করি কিন্তু নামটি মনে করতে পারিনি। শেষে আমি বলি, এ অবস্থায় আমার জন্য এ ছাড়া আর কী উপায় থাকে যে, আমি সেই একই কথা বলি যা ইউসুফের বাপ বলেছিলেন (এখানে সে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যখন ইয়াকুবের সামনে তার

ছেলে বিন ইয়াইমিনের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল, সূরা ইউসুফ ১০ রুকূ'তে একথা আলোচিত হয়েছে)। একথা বলে আমি শুয়ে পড়ি এবং অন্যদিকে পাশ ফিরি। সে সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ জানেন আমি গোনাহ করিনি, তিনি নিশ্চয়ই সত্য প্রকাশ করে দেবেন। যদিও একথা আমি কল্পনাও করিনি যে, আমার স্বপক্ষে অহী নাযিল হবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। আল্লাহ নিজেই আমার পক্ষ সমর্থন করবেন। এ থেকে নিজেকে আমি অনেক নিম্নতর মনে করতাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতার কথা জানিয়ে দেবেন। এরি মধ্যে রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যা অহী নাযিল হবার সময় হতো, এমন কি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর মুবারক চেহারা থেকে মুক্তোর মতো স্বেদবিন্দু টপকে পড়তে থাকতো। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। আমি তো ছিলাম একদম নির্ভীক। কিন্তু আমার বাপ-মার অবস্থা ছিল যেন কাটলে শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্তও পড়বে না। তারা ভয় পাচ্ছিল, না জানি আল্লাহ কী সত্য প্রকাশ করেন। যখন সে অবস্থা খতম হয়ে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি হেসে প্রথমে যে কথাটাই বলেন, সেটি ছিল, মুবারক হোক আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষতার কথা নাযিল করেছেন এবং এরপর নবী ﷺ দশটি আয়াত শুনান (অর্থাৎ ১১ নম্বর আয়াত থেকে ২০ নম্বর পর্যন্ত)। আমার মা বলেন, ওঠো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমি বললাম, "আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না, তোমাদের দু'জনের প্রতিও না; বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন। তোমরা তো এ মিথ্যা অপবাদ অস্বীকারও করনি।" (উল্লেখ্য, এটি কোনো একটি বিশেষ হাদীসের অনুবাদ নয়; বরং হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে এ সম্পর্কিত যতগুলো বর্ণনা আয়েশার (রা) উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলোর সার নির্যাস এখানে পরিবেশ করা হয়েছে)।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি সূক্ষ্ম কথা অনুধাবন করতে হবে। আয়েশা (রা)-এর নিরপরাধ হবার কথা বর্ণনা করার আগে পুরো একটি রুকূ'তে যিনা, কাযাফ ও লি'আনের বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে এ সত্যটির ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছেন যে, যিনার অপবাদ দেবার ব্যাপারটি কোনো ছেলেখেলা নয়, নিছক কোনো মাহফিলে হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য একে ব্যবহার করা যাবে না। এটি একটি মারাত্মক ব্যাপার। অপবাদদাতার অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে তাকে সাক্ষী আনতে হবে। যিনাকারী ও যিনাকারিণীকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে। আর অপবাদ যদি মিথ্যা হয় তাহলে অপবাদদাতা ৮০ ঘা বেত্রাঘাত লাভের যোগ্য, যাতে ভবিষ্যতে সে আর এ ধরনের কোনো কাজ করার দুঃসাহস না করে। এ অভিযোগ যদি স্বামী দিয়ে থাকে তাহলে আদালতে লি'আন করে তাকে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। একথাটি একবার মুখে উচ্চারণ করে কোনো ব্যক্তি ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। কারণ

এটা হচ্ছে একটা মুসলিম সমাজ। সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে যিনা কোনো আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হতে পারে না এবং এর আলোচনাও হাস্য রসালাপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে না।

যারা গুজব ছড়িয়েছিল : হাদীসে মাত্র কয়েকজন লোকের নাম পাওয়া যায়। তারা এ গুজবটি ছড়াচ্ছিল। তারা হচ্ছে আবদল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রিফা'আহ (এ ব্যক্তি সম্ভবত রিফা'আ ইবনে যায়েদ ইহুদী মুনাফিকের ছেলে), মিস্তাহ ইবনে উসাসাই, হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও হামনা বিনতে জাহশ। এর মধ্যে প্রথম দু'জন ছিল মুনাফিক এবং বাকি তিনজন মু'মিন। মু'মিন তিন জন বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে এ চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরা ছাড়া আর যারা কম বেশি এ গোনাহে জড়িয়ে পড়েছিল তাদের নাম হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে নজরে পড়েনি।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র কখনো স্থায়ী হয় না : মুনাফিকরা মনে করছে তারা তোমাদের ওপর একটা বিরাট আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ এটি উল্টো তাদের ওপরই পড়বে এবং তোমাদের জন্য ভালো প্রমাণিত হবে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের যে আসল ময়দান ছিল মুনাফিকরা সেখানেই তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য এ প্রপাগাণ্ডা শুরু করে। অর্থাৎ নৈতিকতার ময়দান। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার কারণে তারা প্রত্যেকটি ময়দানে নিজেদের প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করে চলছিল। আল্লাহ তাকেও মুসলমানদের কল্যাণের উপকরণে পরিণত করে দিলেন। এ সময় একদিকে নবী ﷺ, অন্যদিকে আবু বকর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তৃতীয় দিকে সাধারণ মু'মিনগন যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন তা থেকে একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা অসৎকর্ম থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, কতটা সংযম ও সহিষ্ণুতার অধিকারী, কেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও কী পরিমাণ ভদ্র ও রুচিশীল মানসিকতার ধারক। নবী ﷺ-এর ইজ্জতের ওপর যারা আক্রমণ চালিয়েছিল তাঁর একটি মাত্র ইংগিতই তাদের শিরশ্চেদের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এক মাস ধরে তিনি সবরের সাথে সবকিছু বরদাশ্‌ত করতে থাকেন এবং আল্লাহর হুকুম এসে যাবার পর কেবলমাত্র যে তিনজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কাযাফ তথা যিনার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ প্রমাণিত ছিল তাদের ওপর 'হদ' জারি করেন। এরপরও তিনি মুনাফিকদেরকে কিছুই বলেননি। আবু বকরের নিজের আত্মীয়, যার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ তিনি করতেন, সেও তাঁদের কলিজায় তীর বিঁধিয়ে দিতে থাকে কিন্তু এর জবাবে আল্লাহর এ নেক বান্দাটি না তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন, না তার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য-সহায়তা দেয়া বন্ধ করেন। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের একজনও সতীনের দুর্নাম ছড়াবার কাজে একটুও অংশ নেননি; বরং কেউ এ অপবাদের প্রতি নিজের সামান্যতমও সন্তোষ, পছন্দ অথবা মেনে নেয়ার মনোভাবও প্রকাশ করেননি। এমনিক যয়নবের সহোদর বোন হাম্না বিনতে জাহ্‌শ নিছক নিজের বোনের জন্য তার সতীনের দুর্নাম রটাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং সতীনের পক্ষে ভালো কথাই বলেন। আয়েশার নিজের বর্ণনা, রাসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে

সবচেয়ে বেশি আড়ি চলতো আমার যয়নবের সাথে। কিন্তু "ইফক"-এর ঘটনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ যখণ তাকে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা সম্পর্কে তুমি কী জানো? তখন এর জবাবে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি তার মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশার নিজের ভদ্রতা ও রুচিশীলতার অবস্থা এই ছিল যে, হাস্‌সান ইবনে সাবেত তাঁর দুর্নাম রটাবার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি সবসময় তাঁর প্রতি সম্মান ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। লোকেরা স্মরণ করিয়ে দেয়, ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটিয়েছিলেন। কিন্তু এ জবাব দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করে দেন যে, এ ব্যক্তি ইসলামের শত্রু কবি গোষ্ঠীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের পক্ষ থেকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। এ ঘটনার সাথে যাদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল এ ছিল তাদের অবস্থা। আর সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতা কতদূর পরিচ্ছন্ন ছিল তা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, আবু আইয়ুব আনসারীর স্ত্রী যখন তাঁর কাছে এ গুজবগুলোর কথা বললেন তখন তিনি বলেন, "আইয়ুবের মা! যদি সে সময় আয়েশার জায়গায় তুমি হতে, তাহলে তুমি কী এমন কাজ করতে? " তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন কাজ করতাম না।" আবু আইয়ুব বলেন, "তাহলে আয়েশা তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল। আর আমি বলে কি, যদি সাফওয়ানের জায়গায় আমি হতাম, তাহলে এ ধরনের কথা কল্পনাই করতে পারতাম না। সাফওয়ান তো আমার চেয়ে ভালো মুসলমান।" এভাবে মুনাফিকরা যা কিছু চেয়েছিল ফল হলো তার একেবারে উল্টো এবং মুসলমানদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব আগের তুলনায় আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

এ ঘটনার মধ্যে কল্যাণের দিক : এ ঘটনাটি ইসলামের আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তামাদ্দুনিক নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের উপলক্ষে পরিণত হয়। এর বদৌলতে মুসলমানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব নির্দেশ লাভ করে যেগুলো কার্যকর করে মুসলিম সমাজকে চিরকালের জন্য অসৎকর্মের উৎপাদন ও সেগুলোর সম্প্রসারণ থেকে সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে আর অসৎকর্ম উৎপাদিত হয়ে গেলেও যথাসময়ে তার পথ রোধ করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও এর মধ্যে কল্যাণের আরও একটি দিক ছিল। মুসলমানরা সকলেই একথা ভালোভাবে জেনে যায় যে, নবী ﷺ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন। যা কিছু আল্লাহ জানান তাই তিনি জানেন। এর বাইরে তাঁর জ্ঞান ততটুকুই যতটুকু জ্ঞান একজন মানুষের থাকতে পারে। একমাস পর্যন্ত আয়েশার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ব্যাপারে তিনি ভীষণ পেরেশান থাকেন। কখনো চাকরাণীকে জিজ্ঞেস করতেন, কখনো পবিত্র স্ত্রীগণকে, কখনো আলীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু), কখনো উসামাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। শেষ পর্যন্ত আয়েশাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করলেও এভাবে জিজ্ঞেস করেন যে, যদি তুমি এ গোনাহটি করে থাকো, তাহলে তাওবা করো আর না করে থাকলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার নিরপরাধ হওয়া প্রমাণ করেন দেবেন। যদি তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতেন তাহলে এ পেরেশানী, এ

জিজ্ঞাসাবাদ এবং এ তাওবার উপদেশ কেন? তবে আল্লাহর অহী যখন সত্য কথা জানিয়ে দেয় তখন সারা মাসে তিনি যা জানতেন না তা জানতে পারেন। এভাবে আকীদার অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধারণত লোকেরা নিজেদের নেতৃবর্গের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি ও আতিশয্যে শিকার হয়ে থাকে তা থেকে আল্লাহ সরাসরি অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বাঁচার ব্যবস্থা করেন। বিচিত্র নয়, এক মাস পর্যন্ত অহী না পাঠাবার পেছনে আল্লাহর এ উদ্দেশ্যটাও থেকে থাকবে। প্রথম দিনেই অহী এসে গেলে এ ফায়দা লাভ করা যেতে পারতো না।

সতী সম্ভ্রান্ত নারীর অপবাদ শুনে মুমিনদের করণীয়

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ . لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ . وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : যখন তারা এটা শুনলো তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করলো না এবং বলল না, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ'। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে সে জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো। (সূরা আন নূর : আয়াত : ১২-১৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : ইফকের ঘটনা সাজিয়ে মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ইসলামী সমাজের চরম বিরূপ চিত্র রটানোর অপচেষ্টা চলেছিল। স্বয়ং রাসূলের স্ত্রীর চরিত্রে কল্পিত কালিমা লেপনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের ভিত প্রকম্পিত করে চিরতরে ইসলামের আলো ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। মেহেরবান আল্লাহ সেই কঠিন বিপদ থেকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছিলেন প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিয়ে। উপরিউক্ত আয়াত ক'টিতে সেই অসহনীয় যন্ত্রণা ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ঈমানদারদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উড়ে চলা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে মুমিন নারী-পুরুষের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চলার জন্য রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন এসব আয়াতে।

একথাতো বিবেচনার যোগ্যই ছিল না। একথা শোনার সাথে সাথেই প্রত্যেক মুসলমানের একে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, মিথ্যা ও বানোয়াট কথা ও অপবাদ আখ্যা দেয়া উচিত ছিল। সম্ভবত কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারে, একথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুই বা প্রথম দিনই

একে মিথ্যা বলে দিলেন না কেন? কেন তারা একে এতটা গুরুত্ব দিলেন? এর জবাব হচ্ছে, স্বামী ও পিতার অবস্থা সাধারণ লোকদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের হয়। যদিও স্ত্রীকে স্বামীকে স্বামীর চেয়ে বেশি কেউ চিনতে বা জানতে পারে না এবং একজন সৎ, ভদ্র ও সভ্রান্ত স্ত্রী সম্পর্কে কোনো সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন স্বামী লোকদের অপবাদের কারণে খারাপ ধারণা করতে পারে না, তবুও যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তখন সে এমন এক ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় যার ফলে সে একে মিথ্যা অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করলে প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ হবে না; বরং তারা নিজেদের কণ্ঠ আরো এক ডিগ্রী উঁচুতে চড়িয়ে বলতে থাকবে, দেখো, বউ কেমন স্বামীর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সবকিছু করে যাচ্ছে আর স্বামী মনে করছে আমার স্ত্রী বড়ই সতী সাধ্বী। এ ধরনের সংকট মা-বাপের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। সে বেচারারা নিজেদের মেয়ের সতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে যদি মুখ খোলেও তাহলে মেয়ের অবস্থান পরিষ্কার হয় না। প্রচারণাকারীরা একথাই বলবে, মা-বাপ তো নিজের মেয়ের পক্ষ সমর্থন করবে না তো আর কি করবে। এ জিনিসটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর ও উম্মে রুমানকে ভিতরে ভিতরে শোকে-দুঃখে জর্জরিত ও বিহ্বল করে চলছিল। নয়তো আসলে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো তাঁর ভাষণে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং যে ব্যক্তির সম্পর্কে এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যেও না।

এখানে যেন কেউ এ ভুল ধারণার শিকার না হন যে, এ ক্ষেত্রে নিছক সাক্ষীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে অপবাদের মিথ্যা হবার যুক্তি ও ভিত্তি গণ্য করা হচ্ছে এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যেহেতু, অপবাদদাতা চার জন্য সাক্ষী আনেনি তাই তোমরাও শুধুমাত্র এ কারণেই তাকে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করো। বাস্তবে সেখানে যা ঘটেছিল, তার প্রতি দৃষ্টি না দিলে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। অপবাদদাতারা এ কারণে অপবাদ দেয়নি যে, তারা তাদের মুখ দিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছিল তারা সবাই বা তাদের কোনো একজন স্বচক্ষে তা দেখেছিল; বরং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং সাফ্ওয়ান পরে তাঁকে নিজের উটের পিঠে সওয়ার করে কাফেলার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন শুধুমাত্র এরি ভিত্তিতে তারা এতবড় অপবাদ তৈরি করে ফেলেছিল। কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি এ অবস্থায় আয়েশার এভাবে পিছনে থেকে যাওয়াকে নাউযুবিল্লাহ কোনো ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে ভাবতে পারতেন না। সেনা প্রধানের স্ত্রী চুপিচুপি কাফেলার পিছনে এ ব্যক্তির সাথে থেকে যাবে তারপর ঐ ব্যক্তিই তাকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ঠিক দুপুরে সময় সবার চোখের সামনে দিয়ে সেনা ছাউনিতে পৌঁছে যাবে, কোনো ষড়যন্ত্রকারী এভাবে ষড়যন্ত্র করে না। স্বয়ং এ অবস্থাটাই তাদের উভয়ের নিরপরাধ নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এ অবস্থা যদি অপবাদদাতারা নিজেদের চোখে কোনো ঘটনা দেখতো তাহলে কেবলমাত্র তারই ভিত্তিতে অপবাদ দিতে পারতো। অন্যথায় যেসব লক্ষণের ওপর কুচক্রীরা অপবাদের ভিত্তি রেখেছিল সেগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত যারা পবিত্র চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদ দেয়

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.

অর্থ : যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্‌বা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। সে দিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। (সূরা আন নূর : আয়াত : ২৩-২৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় পূর্বে বর্ণিত সূরা আন নূরের ৪ আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় একই বিষয়ের হুকুম পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটি বিরাট পার্থক্য। আর তাহলো পূর্বোক্ত আয়াতে (৪আয়াত) তাওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। অথচ এখানে (২৩ আয়াতে) কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ২৩ আয়াত সেসব লোকদের সাথে সম্পৃক্ত যারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তাওবা করেনি। এমনকি কুরআনে তাঁর দোষমুক্ত থাকার কথা নাযিল হওয়ার পরও তারা তাদের দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। উল্লেখ্য, এমন কাজ কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো মুমিন কুরআনের বিরোধিতা করতে পারে না। বিরোধিতা করলে সে আর মুমিন থাকতে পারে না। তাই এ আয়াতগুলো ঐসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা দোষ মুক্ততার আয়াতে নাযিল হওয়ার পরও এ অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফির মুনাফিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মূলে 'গাফেলাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে , সরলমনা ও ভদ্র মহিলারা, যারা ছল-চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল, কলুষমুক্ত ও পাক-পবিত্র, যারা অসভ্যতা ও অশ্লীল আচরণ কী ও কীভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহ আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিষ্কলুষ-সতী-সাধ্বী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া সাতটি "সর্বনাশা" কবীরাহ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাবারানীতে হুযাইফার বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন,

"একজন নিরপরাধ সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া একশ বছরের সৎকাজ ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট।"

মুসলিম সমাজে অন্যের ঘরে প্রবেশের বিধান

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো।

(সূরা আন নূর : আয়াত : ২৭-২৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : সূরার শুরুতে যেসব বিধান দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল সমাজে অসৎপ্রবণতা ও অনাচারের উদ্ভব হলে কীভাবে তার গতিরোধ করতে হবে তা জানাবার জন্য। এখন যেসব বিধান দেয়া হচ্ছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে অসৎবৃত্তির উৎপত্তিটাই রোধ করা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে শুধরানো যাতে করে এসব অসৎপ্রবণতা সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এসব বিধান অধ্যয়ন করার আগে দু'টি কথা ভালোভাবে মনের মধ্য গেঁথে নিতে হবে-

১. অপবাদের ঘটনার পরপরই এ বিধান বর্ণনা করা পরিষ্কারভাবে একথাই ব্যক্ত করে যে, রাসূলের স্ত্রীর ন্যায় মহান ও উন্নত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এত বড় একটি ডাহা মিথ্যা অপবাদের এভাবে সমাজের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচারলাভকে আল্লাহ আসলে একটি যৌন কামনাতাড়িত পরিবেশের উপস্থিতির ফল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশের বদলানোর একমাত্র উপায় এটাই ছিল যে, লোকদের পরস্পরের গৃহে নিসংকোচে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হবে, অপরিচিত নারী-পুরুষদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার পথ রোধ করতে হবে, মেয়েদের অতি নিকট পরিবেশের লোকজন ছাড়া গায়ের মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিতদের সামনে সাজসজ্জা করে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, পতিতাবৃত্তির পেশাককে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে, পুরুষদের ও নারীদের দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখা যাবে না, এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরও বিবাহ

দিতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, মেয়েদের পর্দাহীনতা ও সমাজে বিপুল সংখ্যক লোকের অবিবাহিত থাকাই আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী এমন সব মৌলিক কার্যকারণ যেগুলোর মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশ একটি অনুভূত যৌন কামনা সর্বক্ষণ প্রবাহমান থাকে এবং এ যৌন কামনার বশবর্তী হয়ে লোকদের চোখ, কান, কণ্ঠ, মন-মানস সবকিছুই কোনো বাস্তব বা কাল্পনিক কেলেংকারিতে (Scandal) জড়িত হবার জন্য সবসময় তৈরি থাকে। এ দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আলোচ্য পর্দার বিধিসমূহের চেয়ে বেশি নির্ভুল, উপযোগী ও প্রভাবশালী অন্য কোনো কর্মপন্থা আল্লাহর বিবেচনায় ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

২. এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না; বরং যেসব কার্যকারণ কোনো ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারের কাছে পৌছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোক্তাই (Prosecutor) নয়; বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্কৃতিলাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আলোচ্য আয়াতে حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا (অর্থাৎ যতক্ষণ না অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا বললে আয়াতের অর্থ হতো, "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا শব্দ ব্যবহার করেছেন।

اِسْتِئْنَاسٌ শব্দ اُنْسٌ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের ভাষায় এর মানে হয় পরিচিতি, অন্তরঙ্গতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন تَسْتَأْنِسُوْا শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরঙ্গ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে, "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরঙ্গ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে।

জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা 'সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা' বলতে বলতে নিঃসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এ হুকুমটি নাযিল হবার পর নবী ﷺ সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন নীচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো-

❖ নবী ﷺ ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং একে একটি সাধারণ অধীকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাহির থেকে চেয়ে দেখা এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। সওবান (নবী ﷺ-এর আজাদ করা গোলাম) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, "দৃষ্টি যখন একবার প্রবশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেবার দরকার কি?" (আবু দাউদ)

হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (আবু দাউদ) নবী করীমের ﷺ নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা লটকানো থাকত না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রাসূলুল্লাহর ﷺ খাদেম আনাস বলন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রাসূল ﷺ-এর কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগুনের মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে।" (আবুদ দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোনো গোনাহ হবে না।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।"

ইমাম শাফঈ এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি; বরং এটি এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোনো ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ায়ও সে নিরস্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোনো অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

❖ ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

❖ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি; বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হ্যাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব দিলেন, "তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর?" (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, "নিজেদের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রীর যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকেন তখনই আগেই এমন কোনো আওয়াজ করে দিতেন যাতেন তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

❖ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরি নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দেয়। যেমন- আগুন লাগে অথবা কোনো চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

❖ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আসে এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে 'আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?' নবী ﷺ তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এস, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? বলতে হবে।' (ইবনে জারির ও আবু দাউদ)

❖ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি? ' অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ)

❖ কালাদাহ ইবনে হাম্বল নামে এক ব্যক্তি কাজে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, বাইরে যাও এবং আস্সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। উমরের رضي الله عنه ব্যাপারে বর্ণিত আছে নবী করীমের ﷺ খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন,"আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রাসূল ! উমর কি ভেতরে যাবে? "(আবু দাউদ) অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম ﷺ বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী ﷺ নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি সা'দ ইবনে উবাদার বাড়িতে গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রাহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচু স্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয়; বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

❖ গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোনো ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতর প্রবেশ করা উচিত নয়।

❖ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকার জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত

কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোনো জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে

তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

অনুমতি না পাওয়ার কারণে নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি যদি করো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। অথবা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফকীহগণ 'ফিরে যাও' এর হুকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই; বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই।

নারী পুরুষর পরস্পর যেভাবে পর্দা করবে

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : আর মু'মিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আন নূর : আয়াত-৩১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে ভিন্ পুরুষদের দেখা উচিত নয়। ভিন্ পুরষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে

দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। এদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, উম্মে সালামাহ ও উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। নবী ﷺ উভয় স্ত্রীকে বললেন, "তার থেকে পর্দা করো।" স্ত্রীরা বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না।" বললেন, "তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না? " উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, এটা যখন পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি সে সময়কার ঘটনা।" (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে, আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। বলা হলো, আপনি এর থেকে পর্দা করছেন কেন? সে তো আপনাকে দেখতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহা এর জবাবে বললেন, "কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি।" অন্যদিকে আমরা আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ম হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী ﷺ নিজে আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম ﷺ বললেন, উম্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশি যাওয়া আসা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী করতেন।) কাজেই তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ওখানে থাকো। সে অন্ধ। তুমি তার ওখানে নিঃসংকোচে থাকতে পারবে।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা একত্র করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপার মহিলাদের ওপর তেমন বেশি কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোনো কোনো জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোনো যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম গাজ্জালী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদীসগুলো থেকে প্রায় এ একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ হুকুম দেয়া হয়না যে, তোমরাও

নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হুকুমের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।" তবুও মেয়েরা নিশ্চিন্ত পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনোক্রমেই জায়েয নয়।

অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপার মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতরে থেকে ফুটে উঠতে থাকে। আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, তাঁর বোন আসমা বিনতে আবু বকর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আসনে। তখন তিনি পাত্‌লা কাপড় পড়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, "হে আসমা! কোনো মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের কোনো অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।" (আবুদ দাউদ)

এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর কাছে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনুত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বলেন, "মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কব্জির ওপর হাত রেখে হাতের সীমানা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র একমুঠি পরিমাণ জায়গা খালি থাকে।'

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরে কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মীয়দের (যেমন বাপ-ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরে কেবলমাত্র ততটুকু অংশই খুলতে পারে। যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আস্তিন গুটনো অথবা ঘরের মেঝে ধুয়ে ফেলার সময় পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া।

আর মহিলদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের সতরের সীমা রেখার মতই। অর্থাৎ নাভী ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্ধ উলংগ থাকবে; বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাভী ও হাঁটুর মাঝাখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়।

এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়াত নারীদের কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই দাবী করেন না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজাত করা; বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশি কিছু দাবী করে। এ দাবী

পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়।

زِيْنَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে "সাজসজ্জা"। এর দ্বিতীয় আর একটি অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড় অলংকার এবং মাথা, মুখ, হাত পা, ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য "মেকআপ" (Makeup) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে আসছে।

প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ অর্থাৎ "তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে।" আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে إِلَّا শব্দটি বলে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে যাকে আলাদা তথা নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا "যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।' এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোনো আভরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত (যেমন ওপরে যে চাদরটি জড়ানো থাকে, কারণ কোনোক্রমেই তাকে লুকানো তো সম্ভব নয় আর নারীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নাখ্ঈ। পক্ষান্তরে কোনো কোনো মুফাসসির مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর অর্থ নিয়েছেন, 'মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়' এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে আংটি, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। হানাফী ফকীহদের একটি বিরাট অংশও অর্থ গ্রহণ করেছেন "প্রকাশ হওয়া" ও "প্রকাশ করার" মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং আমর দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে "প্রকাশ করার" থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে "প্রকাশ করা" পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধ যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হুকুম এসে যাবার পর মহিলারা মুখে খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পর্দাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ সতর ও

হিজাবের মধ্যে যমীন আসমান ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয়; বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরা বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকত। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকে অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার মেয়েদের মতো তাকে ভাঁজ করে পেঁচিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার প্রশংসা করে বলেন, সূরা নূর নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়।। আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ বাক্যাংশ শোনার পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সাথে সাথেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামাযের সময় যতগুলো মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়ানা পরা ছিল। এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন, মহিলারা পাত্‌লা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরি করলেন। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)

ওড়না পাত্‌লা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই আনসারদের মহিলারা হুকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরি করলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়াত প্রবর্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি; বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। দেহ্‌ইয়াহ্ কাল্বী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মিসরের তৈরি সূক্ষ্ম মল্মল্ (কাবাতী) এলো। তিনি তা থেকে একটুকরা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এখান থেকে কেটে এক খণ্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরি করে নাও এবং এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীরের গঠন ভেতর থেকে দেখা না যায়।" (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)।

যাদের মধ্য একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই থাক না কেন কোনো নারীর তার সামনে সাজগোজ করে আসা বৈধ নয়।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

বাক্যে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার অর্থ এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছেন তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়, তবে তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমা যোগ্য।

মূলে اٰبَاءٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয়; বরং দাদা ও দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার বাড়ির এসব মুরব্বীদের সামনেও।

ছেলের অন্তর্ভুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের সন্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন নিজের সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের সামনে করতে পারে।

ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল।

ভাই-বোনদের ছেলে বলতে তিন ধরনের ভাই-বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দোহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

নবী ﷺ এ হুকুমটিকে কেবলমাত্র অলংকারের ঝংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই তিনি মহিলাদেরকে খোশ্‌বু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। আবু হুরাইরার رضي الله عنه রেওয়ায়াত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশ্‌বু লাগিয়ে না আসে।' (আবু দাউদ ও আহমাদ) একই বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একটি মেয়ে খোশ্‌বু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দাসী! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো? সে বললো হ্যাঁ। বললেন, 'আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মেয়ে মসজিদে খোশ্‌বু মেখে আসে তার নামায ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ নাসাঈ)। আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে নারী

আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয় সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশবু ব্যবহার করা উঁচিত, যার রং প্রগাঢ় কিন্তু সুবাস হাল্কা। (আবু দাউদ)।

অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোনো প্রয়োজন নেই এবং কোনো দীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদের সুবহানাল্লাহ্ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের ওপর অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নিদের্শ দেয়া হয়েছে।

(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

প্রসংগত এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী ﷺ ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছি-

❖ মুহাররাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আত্মীয় হলেও) কোনো মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, " যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।" (তিরমিযী)

জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে , তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোনো মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোনো মুহাররাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিজের সতর্কতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একবার রাতের বেলা তিনি সাফিয়ার সাথে তাঁর গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোনো কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। আমার আশঙ্কা হলো সে আবার তোমাদের মনে কোনো কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)।

❖ কোনো পুরুষের হাত কোনো গায়ের মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বাই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধিত অবলম্বন করতেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী ﷺ-এর হাত কখনো কোনো ভিন্ মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।' (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)।

❖ তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় বলেন, "কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মুহাররাম না থাকে এবং কোনো মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোনো মুহাররাম তার সাথে থাকে।"

এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে চলে যাও।' এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশি দূরত্বের সফরের ওপর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনোটিতে একদিন, কোনোটিত এক দিন এক রাত, কোনোটিতে দু'দিন আবার কোনোটিতে তিন দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা খতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য থেকে কোনো একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। কারণ এ বিভিন্নতার একটি যুক্তিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ঘটনার যেমন অবস্থা রাসূল ﷺ-এর সামনে এসেছে সে অনুযায়ী তিনি তার হুকুম বর্ণনা করেছেন। যেমন কোনো মহিলা যাচ্ছেন তিনি দিনের দূরত্বের সফরে এবং এ ক্ষেত্র তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের সফরে যাচ্ছেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসল জিনিস নয়; বরং আসল জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোনো মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ ধরনের সফর করা উচিত নয়।

❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে এবং কার্যতও নারী ও পুরুষের মেলামেশা রোধ করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোনো ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুম্আকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায পড়ে নেয় তাহলে নবী ﷺ-এর উক্তি অনুযায়ী তার নামায গৃহীতই হয় না। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুকুত্নী ও হাকেম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী ﷺ জুম্আর নামায ফরয হওয়া থেকে মেয়েদেরকে বাদ রেখেছেন। (আবু দাউদ উম্মে আতীয়্যার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দারুকুত্নী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবু দাউদ ও হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে শরিক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনই নি; বরং এর অনুমতি দিয়েছে এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এ সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরাইরার রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।" (আবু দাউদ : ৫৬৫)

❖ অন্য রেওয়ায়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে উমর থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলি এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দাবলি সহকারে-

❖ اِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ ❖ "মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে আসার অনুমতি দাও।" (আবু দাউদ : ৫৬৮)

অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলি হচ্ছে-

لَا تَمْنَعُوْا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

"তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য ভালো।' (মুসলিম : ৪৪২)

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, "তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসিজদে নামায পড়ার চাইতে ভালো এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো।' (আহমাদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর উম্মে সালামার রাদিয়াল্লাহু আনহা রেওয়ায়াতে নবী ﷺ-এর শব্দাবলি হচ্ছে- "মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ।" (আহমদ, তাবারানী)

কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বনী উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, "যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন যেমনভাবে বনী ইসরাঈলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের শাসনামলে এ দরজা দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ই'তিযালুন নিসা ফিল মাসাজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা'আতে মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষেদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফেরার পর কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে চলে যেতে পারে। (আহমাদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্ঠতম লাইনটি হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী)লাইন এবং মেয়েদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং তাদের নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের (অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুষদের থেকে দূরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে গিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করতেন।

(আবু দাউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লার বর্ণনার মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর বাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দেখলেন, পথে নারী-পুরুষ এক সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরেক বললেন, "থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো।" এ কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। (আবু দাউদ)

এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী-পুরুষদের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের প্রকৃতির সাথে কত বেশি বেখাপ্পা! যে দীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় গোষ্ঠীকে পরস্পর মিশ্রিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ক্লাব-রেস্তরাঁ ও সভা-সমিতিতে তাদের মিশ্রে হওয়াকে বৈধ করে দেবে।

❖ নারীদেরকে ভারসাম্য সহকারে সাজসজ্জা করার তিনি কেবল অনুমতিই দেননি; বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোকে তিনি অভিশম্পাতযোগ্য এবং মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হিসেব গণ্য করেছেন-

- নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশি লম্বা ও ঘন দেখাবার চেষ্টা করা।
- শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উল্কি আঁকা ও কৃত্রিম তিল বসানো।
- ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভ্রূ নির্মাণ করা এবং লোম ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করা।
- দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা অথবা দাঁতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিদ্র তৈরি করা।
- জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরি করা।

এসব বিধান সিহাহ সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা, আবদুল্লাহু ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মুআবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূলের এসব পরিষ্কার নির্দেশ দেখার পর একজন মু'মিনের জন্য দু'টোই পথ খোলা থাকে।

➢ সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এমনসব নৈতিক অনাচার থেকে পবিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে এবং তাঁর রাসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন।

➢ যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুলোর মধ্য থেকে কোনোটির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে তাকে গোনাহ বলে স্বীকার করে নেবে এবং অনর্থক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল পাশ্চাত্য সমাজের পদ্বতি অবলম্বন করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং ইসলামে আদৌ পরদার কোনো বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকসুলভ ধৃষ্টতা দেখিয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোনো ভদ্র ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের চাইতেও দু'কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের এসব বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসলিম জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে। এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা

মুসলামন থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। যদি তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে তাদের নৈতিক সাহসের স্বীকৃতি দিতাম। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা পোষণা করেও তারা মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ সম্ভবত দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরনের চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকদের থেকে যে কোনো প্রকার জালিয়াতী, প্রতারণা, দাগাবাজী, আত্মসাত ও বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষের বিয়ের ব্যবস্থা করা সমাজ ও অভিভাবকের কর্তব্য

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ
يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. وَ لْيَسْتَعْفِفِ
الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَ الَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ
الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّ
اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۚ وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ
اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ
مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা 'অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আন নূর : আয়াত : ৩২-৩৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ বহুবচন। এর অর্থ যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই। আয়াতের তরজমায় 'জুড়িহীন' শব্দ দিয়ে একথাটি বুঝানো হয়েছে। শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে নারী বা পুরুষের এখনো বিয়ে হয়নি; অথবা বিয়ে হয়েছে; কিন্তু নারীটির স্বামী বা পুরুষটির স্ত্রী মারা গেছে; অথবা তালাক হয়ে গেছে। এসবের যে কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীবিহীন নর-নারীকে বিয়ে করানোর নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তেমনি ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। একদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর একদিকে মানুষকে অবৈধ পন্থায় নিজ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে স্বভাবগত চাহিদা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর বৈধ বিশুদ্ধ পথও বলে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর-নারীর মেলামেশার কোনো পন্থা প্রবর্তন করাটা যুক্তি ও শরীয়তের দাবী। কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় এ পন্থার নাম বিবাহ। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নর-নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে এদের বিবাহ সম্পাদন করা আদেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনূন তরিকা ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ, তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে– এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও অন্য ইমামের মতে এ বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নাত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া 'কুফু' সম্মত তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নাতের খেলাপ হওয়ার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য ইমামের মতে অভিভাবকদের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহও বাতিল গণ্য হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত সে ব্যাপারে নিরব। বিশেষত এ কারণেই যে اَيَامٰى শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই

অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থ ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ– কেউ এটাকে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ার কারণে উভয়কেই তিরস্কার করা হবে। (মাআরেফুল কুরআন)

আলোচ্য আয়াতে অভিভাবক ও মুসলিম সমাজকে আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিয়ে সম্পাদন করে দেয়। অধিকাংশ ইমাম তাফসীরকারের মতে এ আদেশ বাধ্যতামূলক নয়; বরং উপদেশ মূলক। তাদের প্রমাণ হলো রাসূলের যুগে অনেক লোক স্বামীহীন স্ত্রীহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে। তাদের তো বিয়ে দেয়া হয়নি। এ আয়াতের আদেশ বাধ্যতামূলক হলে তাদেরকে অবশ্যই বিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু তাফসীরে "ফী যিলালিল কুরআন"-এর লেখক সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর মতে এ আদেশ অবশ্যই বাধ্যতামূলক। তবে তা এ অর্থে নয় যে, রাষ্ট্র ও সরকার স্বামী-স্ত্রীহীন নর-নারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে; বরং তার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সতীত্ব ও শ্লীলতাকে নিরাপদ রাখা ও সংরক্ষণ করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজিব। কেননা বিয়ে হচ্ছে সতীত্বকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ এবং সমাজকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার পন্থা ও উপায়। সমাজকে ব্যভিচার থেকে পবিত্র রাখা যখন ওয়াজিব, তখন তার পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাও ওয়াজিব।

'আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন' এর অর্থ এ নয় যে, যারই বিয়ে হবে আল্লাহ তাকেই ধনাঢ্য করে দেবেন; বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ ব্যাপারে খুব বেশি হিসেবী না বনে যায়। এর মধ্যে মেয়ে পক্ষের জন্যও নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, সৎ ও ভদ্র রুচিশীল ব্যক্তি যদি তাদের কাছে পয়গাম পাঠায়, তাহলে নিছক তার দারিদ্র্য দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করা হয়। ছেলে পক্ষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন যুবককে নিছক এখনো খুব বেশি আয়-রোজগার করছে না বলে যেন আইবুড়ো করে না রাখা হয়। আর যুবকদেরকেও উপদেশ দেয়া হচ্ছে, বেশি সচ্ছলতার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারকে অযথা পিছিয়ে দিয়ো না। সামান্য আয় রোজগার হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিয়ে করে নেয়া উচিত। অনেক সময় বিয়ে নিজেই মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর সহায়তায় খরচপাতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব মাথার ওপর এসে পড়ার পর মানুষ নিজেও আগের চাইতেও বেশি পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অর্থকরী কাজে স্ত্রী সাহায্য করতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কার জন্য কী লেখা আছে তা কেউ জানতে পারে না। ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থায়ও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ভালো অবস্থায়। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবী হওয়া উচিত নয়।

'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে' এ প্রসংগে নবী ﷺ থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্য হতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেন, "হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে

বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার এবং মানুষের সততা ও সতীত্ব রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর যার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক বক্তি হচ্ছে, যে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেয়ার নিয়ত রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ।)

পিতা-মাতার ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে যে তিন সময় অনুমতি নিতে হবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো তখন এবং 'ইশার সালাতের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন নূর : আয়াত-৫৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সম্বোধন করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দাস-দাসী তথা চাকর-চাকরানীগণ আর তোমাদের যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছেনি অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা তোমাদের কক্ষে যেতে হলে এমন তিনটি সময় আছে যখন তারা তোমাদের কাছ থেকে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করবে। কারণ এ তিনটি সময় হচ্ছে তোমাদের পর্দার সময়। অর্থাৎ এ তিনটি সময় মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী একান্তবাস ও বিশ্রাম নেয়ার সময়। এ সময় মানুষ খোলামেলা থাকতে চায়, একান্তে এ সময়ে কখনো কখনো আবৃত অঙ্গও খুলে বা প্রয়োজন কেনো অঙ্গ খোলা হয়ে থাকে। তাই এমন তিনটি সময়ে নিজের চাকর-চাকরানী বা ছেলে মেয়েরা তোমাদের কক্ষে যেতে হলে অবশ্যই আগে তোমাদের অনুমতি নিতে হবে। এই তিনটি সময় হলো :

১. ফজরের নামাযের পূর্বে।
২. দুপুরে যখন তোমরা দেহের শিথিলতাকল্পে কিছুটা অনাবৃত হয়ে থাকে।
৩. ইশার নামাযের পর।

এ তিন সময় ছাড়া তাদের তোমাদের কাছে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। কেননা তোমাদের একে অন্যের কাছে বার বার আসা যাওয়া করতেই হয়। সুতরাং সবসময় অনুমতি চেয়ে প্রবেশ করা কষ্টকর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য এমনিভাবে বিধানাবলি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে ভাল হয়ে থাকতে পার। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। কাজেই মানষের জন্য কিসে কল্যাণ আর কিসে ক্ষতি তা তিনিই ভাল জানেন। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন। তিনিই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন মানুষের সার্বিক অবস্থা। আর সেভাবেই তিনি মানুষের জন্য হুকুম-আহকাম দিয়ে থাকেন।

মূলে 'আওরাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এ তিনটি সময় তোমাদের জন্য আওরাত।' আওরাত বলতে আমাদের ভাষায় মেয়েলোক বা নারী জাতি বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর মানে হয় বাধা ও বিপদের জায়গা এবং যে জিনিসের খুলে যাওয়া মানুষের জন্য লজ্জার ব্যাপার এবং যার প্রকাশ হয়ে পড়া তার জন্য বিরক্তিকর হয় এমন জিনিসের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কোনো জিনিসের অসংরক্ষিত হওয়া অর্থেও এর ব্যবহার হয়। এ অর্থগুলো সবই পরস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত এবং আয়াতের অর্থের সাথে কোনো না কোনো পর্যায়ে সংযুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে এ সময়গুলোতে তোমরা একাকী বা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এমন অবস্থায় থাকো যে অবস্থায় গৃহের ছেলে মেয়ে বা চাকর বাকরদের হঠাৎ নির্জন স্থানে আসতে চায় তখন তাদের পূর্বাহ্নে অনুমতি নেবার নির্দেশ দাও।

এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় নাবালক ছেলে মেয়েরা এবং গৃহস্বামীর ও গৃহকর্ত্রীর মালিকানাধীন গোলাম ও বাঁদীরা সবসময় নারীর ও পুরুষদের কাছে তাদের কামরায় বা নির্জন স্থানে বিনা অনুমতিতে যেতে পারে। এ সময় যদি তোমরা কোনো অসতর্ক অবস্থায় থাকো এবং তারা অনুমতি ছাড়াই এসে যায় তাহলে তাদের হুমকি ধমকি দেবার অধিকার তোমাদের নেই। কারণ কাজের সময় নিজেদেরকে এ ধরনের অসতর্ক অবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই বোকামী ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তবে যদি তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা সত্ত্বেও নির্জনবাসের এ তিন সময় তারা অনুমতি ছাড়াই আসে তাহলে তারা দোষী হবে। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই যদি তোমাদের সন্তান ও গোলামী-বাঁদীদের এ আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ শিক্ষা না দিয়ে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেরাই গোনাহগার হবে।

উপরিউক্ত তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময় ছোট ছেলে মেয়ে ও গোলাম-বাঁদীদের বিনা হুকুমে আসার সাধারণ অনুমতি দেবার এটিই হচ্ছে কারণ। এ থেকে উসূলে ফিক্হর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীয়াতের বিধানসমূহ কোনো না কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক হুকুমের পেছনে নিশ্চিতভাবেই কোনো না কোনো কার্যকারণ আছেই, তা বিবৃত হোক বা না হোক

বৃদ্ধাদের জন্য পর্দার বিধান

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِیْ لَا یَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِیْنَةٍ ؕ وَ اَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ.

অর্থ : বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আন নূর : আয়াত-৬০)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে নারীদের পর্দার একটা ব্যতিক্রম অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না, আর সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এমনভাবে শিথিল করা হয়েছে যে, একজন অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার জন্য মুহরিমের মত হয়ে। মুহরিমের সামনে যেসব অংগ আবৃত করা জরুরি নয়, এ বৃদ্ধার জন্য বেগানা পুরুষদের সামনেও সেসব অংগ আবৃত করা জরুরি নয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে قَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ অর্থাৎ "মহিলাদের মধ্য থেকে যারা বসে পড়েছে" অথবা "বসে পড়া মহিলারা।" এর অর্থ হচ্ছে, হতাশার বয়স অর্থাৎ মহিলাদের এমন বয়সে পৌঁছে যাওয়া যে বয়সে আর তাদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না। যে বয়সে তার নিজের যৌন কামনা মৃত হয়ে যায় এবং তাকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও কোনো যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। পরবর্তী বাক্য এ অর্থের দিকেই ইংগিত করেছে।

মূল শব্দ হচ্ছে یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ "নিজেদের কাপড় নামিয়ে রাখে।" কিন্তু এর অর্থ সমস্ত কাপড় নামিয়ে উলংগ হয়ে যাওয়া তো হতে পারে না। তাই সকল মুফাস্সিরে ও ফকীহ্ সর্বসম্মতভাবে এর অর্থ নিয়েছেন এমন চাদর যার সাহায্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার হুকুম সূরা আহযাবের یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

এখানে আরো বলা হচ্ছে غَیْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِیْنَةٍ অর্থাৎ "সৌন্দর্য সহকারে সাজসজ্জা প্রকাশকারী হয় না। تَبَرُّجٌ মানে হচ্ছে প্রকাশ ও প্রদর্শনী করা। بَارِجٌ বলা হয় এমন খোলা নৌকা বা জাহাজকে যার ওপর ছাদ হয় না। এ অর্থে মহিলাদের জন্য এ শব্দটি তখনই বলা হয় যখন তারা পুরুষদের সামনে তাদের নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রদর্শনী করে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে দেবার এ অনুমতি এমন সব বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শখ খতম হয়ে গেছে এবং যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি স্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে লাভবান হওয়া যেতে পারেনা।

১২. সূরা আল-ফুরকান (سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ)

আয়াত : ৭৭ রুকূ : ৬ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'ফুরকান' শব্দটিকেই এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূন ইত্যাটি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রাসূলের ﷺ মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী যাহহাক ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের একটি রেওয়ায়াত উদ্বৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময়টি হয় মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়। (ইবনে জারীর, ১৯ খণ্ড, ২৮-৩০ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কবীর, ৬ খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

কুরআন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত এবং তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পক্ষে থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হতো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে সত্যের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার খারাপ পরিণামও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে সূরা মু'মিনূনের মতো মু'মিনদের নৈতিক গুণাবলির একটি নকশা তৈরি করে সেই মানদণ্ডে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। একদিকে রয়েছে এমন চরিত্র সম্পন্ন লোকেরা যারা এ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং আগামীতে যাদেরকে তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রয়েছে এমন নৈতিক আদর্শ যা সাধারণ আরববাসীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আরববাসীরা এ দু'টি আদশের মধ্যে কোনটি পছন্দ করবে তার ফায়সালা তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। এটি ছিল একটি নিরব প্রশ্ন। আরবের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেয়া হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সমগ্র জাতি এর যে জবাব দেয় ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান হয়ে আছে।

মুত্তাকী হওয়ার জন্য দীনদার স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ও সন্তানের জন্য দোয়া

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

তারা প্রার্থনা করে থাকে, "হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।"

(সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৭৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের একটি বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৬৪ আয়াত থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে থাকে। এ চেষ্টার চূড়ান্ত অংশ হলো তারা পরস্পরের জন্য ও সন্তান-সন্ততির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে থাকে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানিয়ে দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারের নেতা এ ইমাম স্বাভাবিভাবেই হয়ে থাকেন। কাজেই এ দুআর সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন। তারা সবাই মুত্তাকী হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই লোক মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা বলে সাব্যস্ত হবেন।

তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের তাওফীক দান করো এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী করো কারণ একজন মু'মিন তার স্ত্রী ও সন্তানদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আয়েশ-আরাম থেকে নয়; বরং সদাচার ও সচ্চরিত্রতা থেকেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। দুনিয়ায় যারা তার সবচেয়ে প্রিয় তাদেরকে দোজখের ইন্ধনে পরিণত হতে দেখার চাইতে বেশি কষ্টকর জিনিস তার কাছে আর কিছুই নেই। এ অবস্থায় স্ত্রীর সৌন্দর্য ও সন্তানদের যৌবন ও প্রতিভা তার জন্য আরো বেশি মর্মজ্বালার কারণ হবে। কারণ সে সব সময় এ মর্মে দু:খ করতে থাকবে যে, এরা সবাই নিজেদের এসব যোগ্যতা ও গুণাবলি সত্ত্বেও আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

এখানে বিশেষ করে এ বিষয়টি দৃষ্টি সমক্ষে রাখা উচিত যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যার প্রিয়তম আত্মীয় কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে অবস্থান করছিল না। কোনো স্বামী ঈমান এনে থাকলে তার স্ত্রী তখনো কাফের ছিল। কোনো স্ত্রী ঈমান এনে থাকলে তার স্বামী তখনো কাফের ছিল। কোনো যুবক ঈমান এনে থাকলে তার মা-বাপ, ভাই, বোন সবাই তখনো কাফের ছিল। আর কোনো বাপ ঈমান এনে থাকলে তার যুবক পুত্ররা কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমান একটি কঠিন আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং

তার অন্তর থেকে যে দোয়া বের হচ্ছিল তার সর্বোত্তম প্রকাশ এ আয়াতে করা হয়েছে। "চোখের শীতলতা" শব্দ দু'টি এমন একটি অবস্থার চিত্র অংকন করেছে যা থেকে বুঝা যায়, নিজের প্রিয়জনদেরকে কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে এক ব্যক্তি এতই কষ্ট অনুভব করছে যেন তার চোখ ব্যথায় টনটন করছে এবং সেখানে খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে। দ্বীনের প্রতি তারা যে ঈমান এনেছে তা যে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারেই এনেছে- একথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা এমন লোকদের মতো নয় যাদের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলে যোগ দেয় এবং সব ব্যাংকে আমাদের কিছু না কিছু পুঁজি আছে এই ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে।

তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎকর্মশীলই হবো না; বরং সৎকর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতা প্রসারিত হবে। একথার মর্মার্থ এই যে, এরা এমন লোক যারা ধন-দৌলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয়; বরং আল্লাহভীতি ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এ আয়াতটিকেও নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "হে আল্লাহ! মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা এবং আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত করো।" বস্তুত, ক্ষমতা ও পদের প্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।

১৩. সূরা আন নামল (سُوْرَةُ النَّمْلِ)

আয়াত : ৯৩ রুকূ : ৭ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতে وَادِ النَّمْلِ এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থ্যাৎ এমন সূরা যাতে নামল এর কথা বলা হয়েছে। অথবা যার মধ্যে নামল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর দিক দিয়ে এ সূরা মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু ও জাবের ইবনে যায়েদের রাদিআল্লাহু বর্ণনা হচ্ছে, "প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ শু'আরা তারপর আন নামল এবং তারপর আল কাসাস।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরার দু'টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাষনটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণটি পঞ্চম রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম ভাষণটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের প্রথম নির্দেশনা থেকে একমাত্র তাঁরাই লাভবান হতে পারে এবং তার সুসংবাদসমূহ লাভের যোগ্যতা একমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে যারা এ কিতাব যে সত্যসমূহ উপস্থাপন করে সেগুলোকে এ বিশ্ব-জাহানের মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তারপর এগুলো মেনে নিয়ে নিজেদের বাস্তব জীবনেও আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু এ পথে আসার ও চলার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে আখেরাত অস্বীকৃতি। কারণ এটি মানুষকে দায়িত্বহীন, প্রবৃত্তির দাস ও দুনিয়াবী জীবনের প্রেমে পাগল করে তোলে। এরপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নত হওয়া এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনার ওপর নৈতিকতার বাঁধন মেনে নেয়া আর সম্ভব থাকে না। এ ভূমিকার পর তিন ধরনের চারিত্রিক আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

- একটি আদর্শ ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদারবৃন্দ ও লূতের জাতির বিদ্রোহীদের। তাদের চরিত্র গঠিত হয়েছিল পরকাল চিন্তা থেকে বেপরোয়া মনোভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে। তারা কোনো নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি আহবান জানিয়েছে তাদের তারা শত্রু হয়ে গেছে। যেসব অসৎকাজের জঘন্যতা ও কদর্যতা

কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে প্রচ্ছন্ন নয় সেগুলোকেও তারা আকড়ে ধরেছে। আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হবার এক মুহূর্ত আগেও তাদের চেতনা হয়নি।

- দ্বিতীয় আদর্শটি সুলাইমান আলাইহিস সালামের। আল্লাহ তাঁকে অর্থ-সম্পদ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা, পরাক্রম, মর্যাদা ও গৌরব এত বেশি দান করেছিলেন যে, মক্কার কাফেররা তার কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যেহেতু তিনি আল্লাহর সামনে নিজকে জবাবদিহি করতে হবে মনে করতেন এবং তাঁর মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, তিনি যা কিছুই লাভ করেছেন সবই আল্লাহর দান তাই তাঁর মাথা সবসময় প্রকৃত নিয়ামত দানকারীর সামনে নত হয়ে থাকতো এবং আত্ম অহমিকার সামান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপে পাওয়া যেতো না।
- তৃতীয় আদর্শ সাবার নারী। তিনি ছিলেন আরবের ইতিহাসের বিপুল খ্যাতিমান ধনাঢ্য জাতির শাসক। একজন মানুষকে অহংকার মদমত্ত করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তা সবই তাঁর ছিল। যেসব জিনিসের জোরে একজন মানুষ আত্মম্ভরী হতে পারে তা কুরাইশ সরদারদের তুলনায় হাজার লক্ষ গুণ বেশি তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একটি মুশরিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। পিতৃপুরুষের অনুসরণের জন্যও এবং নিজের জাতির মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যেও তাঁর পক্ষে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের পথ অবলম্বন করা সাধারণ একজন মুশরিকের জন্য যতটা কঠিন হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তখনই তিনি সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ পথে কেউ বাধা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখেত পারেনি। কারণ তাঁর মধ্যে যে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল নিছক একটি মুশরিকী পরিবেশে চোখ মেলার ফলেই তা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবৃত্তির উপাসনা ও কামনার দাসত্ব করার রোগ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাঁর বিবেক আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি শূন্য ছিল না। দ্বিতীয় ভাষণে প্রথমে বিশ্ব-জাহানের কয়েকটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের প্রতি ইংগিত করে মক্কার কাফেরদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছে, বলো, যে শিরকে তোমরা লিপ্ত হয়েছো এ সত্যগুলো কি তার সাক্ষ্য দেয় অথবা এ কুরআনে যে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সাক্ষ্য দেয়? এরপর কাফেরদের আসল রোগের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে জিনিসটি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে, যে কারণে তারা সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না এবং সবকিছু শুনেও কিছুই শোনে না সেটি হচ্ছে আসলে আখেরাত অস্বীকৃতি। এ জিনিসটিই তাদের জন্য জীবনের কোনো বিষয়েই কোনো গভীরতা ও গুরুত্বের অবকাশ রাখেনি। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই যখন ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাবে এবং দুনিয়ার জীবনের এসব সংগ্রাম-সাধনার কোনো ফলাফল প্রকাশ পাবে না তখন মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যা সব সমান। তার জীবন ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না অসত্যের ওপর, এ প্রশ্নের মধ্যে তার জন্য আদতে কোনো গুরুত্বই থাকে না।

কিন্তু আসলে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হতাশা নয়। অর্থাৎ তারা যখন গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে তখন তাদেরকে দাওয়াত দেয়া নিষ্ফল, এরূপ মনোভাব সৃষ্টি এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নিদ্রিতদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগানো। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকূ'তে একের পর এক এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মধ্যে আখেরাতের চেতনা জাগ্রত করে, তার প্রতি অবহেলা ও গাফিলতি দেখানোর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে এবং তার আগমনের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিত করে যেমন এক ব্যক্তি নিজের চোখে দেখা ঘটনা সম্পর্কে যে তা চোখে দেখেনি তাকে নিশ্চিত করে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে কুরআনের আসল দাওয়াত অর্থাৎ এক আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগীতে পেশ করে লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে তোমাদের নিজেদের লাভ এবং একে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। একে মেনে নেবার জন্য যদি আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করতে থাকো যেগুলো এসে যাবার পর আর না মেনে কোনো গত্যন্তর থাকবে না, তাহলে মনে রেখো সেটি চূড়ান্ত মীমাংসার সময়। সে সময় মেনে নিলে কোনো লাভই হবে না।

আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় নবীর স্ত্রী হয়েও যে নারী রক্ষা পায় নি

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

অর্থ : আর স্মরণ কর তখনকার কথা, যখন লূত তার জাতিকে বলল, "তোমরা জেনে বুঝে বদ কাম করছো? তোমাদের কি এটাই রীতি কাম তৃপ্তির জন্য তোমরা মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও? আসলে তোমরা ভয়ানক মূর্খতায় লিপ্ত হয়েছো।" কিন্তু সে জাতির এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিলনা যে, তারা বলল "লূতের পরিবারবর্গকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক পবিত্র সাজতে চাচ্ছে।" শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে নিলাম তবে তার স্ত্রীকে নয়। কারণ তার পেছনে থেকে যাওয়াটাই আমি স্থির করে দিয়েছিলাম।

(সূরা আন নামল : আয়াত : ৫৪-৫৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ভাই 'বারান-এর ছেলে। লূত আলাইহিস সালাম একবার যুদ্ধে রোমানদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লে ইবরাহীম তাকে বন্দীমুক্ত করে দেন। এক সময় সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু লূত

ﷺ-এর আশপাশের গ্রামগুলো ছিল কিছুটা সচ্ছল। ফলে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন সেখানে এসে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য ভিড়া জমাতো। অসভ্য গ্রামবাসীরা এতে হিংসার বশবর্তী হয়ে একটা অতি খারাপ ফন্দি আঁটলো। তারা খাদ্য সংগ্রহকারীদের সাথে কুকাজে (সমকামিতায়) লিপ্ত হতো। ফলে বাইরের লোকদের আগমন হ্রাস পেয়ে গেল। কিন্তু তারা এর সেই কু-অভ্যাস ছাড়তে পারলো না। অতঃপর যখনি তারা কোনো সুন্দর বালক পেতো নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুকাজে লিপ্ত হতো আর তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক একেবারেই ছেড়ে দিল। তাদের এহেন চরিত্র বিধ্বংসী অমানুসিক কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের জন্য লূত ﷺ-কে পাঠালেন। আলোচ্য আয়াতে وَلُوطًا শব্দ থেকে একথাই বুঝানো হয়েছে। (কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু)

সূরা আল আরাফের ৮০-৮২ আয়াতে বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে এভাবে, আমি লূত ﷺ-কে পাঠালে সে তার জাতিকে বললো তোমরা কি এমন লজ্জাহীনতার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, যে কাজে তোমাদের পূর্বে কোনো লোককে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি? তোমরা তো নারীর পরিবর্তে পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে স্থাপন করে সীমালংঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছ। এর কোনো সদুত্তর না দিয়ে তারা পরস্পরকে বলতো, এদেরকে– লূত ও তার সাথীদেরকে দেশ থেকে বের করে দাও, এরা তো বড্ড পবিত্র সেজে বসতে চায়।

সূরা আন নমলের আলোচ্য আয়াতে লূত ﷺ-এর কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর জাতি কীভাবে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অথচ তাঁর অপরাধটা কী ছিল? তিনি তাদের জঘন্য কুৎসিৎ ও অশ্লীল কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। তারা তাদের এ অপকর্মের ব্যাপারে এতোই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, এ ব্যাপারে সমগ্র জাতিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানব জাতি কেন, কোনো প্রাণি জগতের এ কাজের উদাহরণ পাওয়া যাবে না কোথাও; বরং এ ছিল আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিগত রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যেহেতু সৃষ্টিজগতের নিয়মনীতিতে জোড়ায় জোড়ায় জন্মানোই জীবনের ভিত্তি। অন্য কথায় জোড়া জোড়া হওয়া ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। সেহেতু আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণকে জন্মগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। এ আকর্ষণ শিখিয়ে দেয়ার বা উদ্বুদ্ধ করার অপেক্ষা রাখে না। এরূপ ব্যবস্থা ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক প্রাণির তার এ জন্মগত তাড়না চরিতার্থ করে আনন্দ পায়। প্রাণির দেহের ভিতরে সংরক্ষিত এ স্বাদ ও আনন্দের ভিতর দিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা আপন ইচ্ছা এমনভাবে বাস্তবায়িত করেন যে, তারা নিজেরাও তা টের পায় না। আর অন্য কেউ তাকে সে সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠন করেছেন যেন উভয়ের মিলন স্বাভাবিক আনন্দকে বাস্তবায়িত করে। এ সামঞ্জস্য বা সমন্বয় তিনি একই লিঙ্গের দুই ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সৃষ্টি করেননি। এ জন্মগত

বৈশিষ্ট্যের যেরূপ সর্বব্যাপী বিকৃতি লূত আলাইহিস সালাম-এর জাতির ভিতরে সংঘটিত হয়েছিল তা যথার্থই বিস্ময়কর ও স্বাভাবিক নিয়মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এজন্যেই লূত আলাইহিস সালাম জাতির এ অপকর্মের প্রতিবাদে বিস্ময় জড়িত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

তাদের বিকৃতির এ প্রতিবাদের জবাবে লূতের জাতি সঠিক জবাবদানের পরিবর্তে কেবল একথাই বলেছিল যে, লূত ও তার অনুসারীরা খুব সৎ ও পবিত্র মানুষ সাজতে চায়। ওদের স্থান এখানে নেই। ওদেরকে এদেশ থেকে বের করে দিতে হবে। লূত আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীরা তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কেবল তাঁর স্ত্রী ছাড়া। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এ মহিলাটি ছিল চরিত্রহীনা, সে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সমকামিতাকে সমর্থন করতো। তাই আল্লাহর ইনসাফের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য দুশ্চরিত্রের লোকদের সাথে লূত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীকেও ধ্বংস করে দেয়া হলো। (ফী যিলালিল কুরআন)

আল্লাহর বাণী

قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ

'তাকে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছি' কথা দ্বারা কেবল এটা বুঝানো হয়নি যে, লূত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী আল্লাহর নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং কথাটার অর্থ এও হতে পারে যে, এ পাথর বৃষ্টির শাস্তি তার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করা ছিল। এটা এ জন্যে যে, একজন নবীর স্ত্রীর হওয়া সত্ত্বেও যখন তার সহানুভূতি ছিল সেই অযোগ্য জাতির প্রতি তখন অন্যদের তুলনায় আল্লাহর আযাব তার প্রতি অধিক হওয়াই উচিত। কারণ আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি তার অনুকম্পা তাকে আল্লাহর গযবের অধিকতর যোগ্য করে তুলেছে। আল্লাহ যাকে শিক্ষা ও হেদায়াতের সুযোগ যত বেশি পরিমাণ সংস্থান করে দেবেন, সে তার যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা না দিলে তার প্রতি আল্লাহর শাস্তিও সেই হারেই হতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তো দায়িত্ব অনুপাতেই পারিতোষিক দিয়ে থাকেন। (তাদাব্বুরে কুরআন)

কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী কওমে লূতের প্রতি আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই নবীর সাথীগণকে লোকালয় থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। আর নির্দেশ ছিল কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়। এ নির্দেশ সবাই যথাযথ মেনে চলেছিল। কিন্তু লূত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী সকলের পেছনে থেকে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। পরিণামে সেও আল্লাহর আযাবগ্রস্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেল। সে তো একদিকে নবীর আদর্শ বিরোধীদের সহযোগী ছিল। আবার আল্লাহর আযাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে না দেখার আল্লাহর নির্দেশও অমান্য করেছিল। সুতরাং নবী স্বামীর আদর্শ বিচ্যুতির অপরাধের শাস্তি থেকে তাকে নবী স্বামীর স্ত্রী হওয়ার সম্পর্কে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

১৪. সূরা আল কাসাস (سُوْرَةُ الْقَصَصِ)

আয়াত : ৮৮ রুকু : ৯ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরাটির ২৫ নং আয়াতের 'আল কাসাস' শব্দটিকেই সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের হওয়ার সময়

সূরা নামলের ভূমিকায় ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে যায়েদের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছিল, সূরা শু'আরা, সূরা নামল ও সূরা কাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায় একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা শু'আরায় নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে মূসা বলেন, "ফেরাউনী জাতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য আমি দায়ী। এ কারণে আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে গেলেই তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" তারপর মূসা যখন ফেরাউনের কাছে যান তখন সে বলে, "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে ছোট্ট শিশুটি থাকা অবস্থায় লালন পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে কয়েক বছর থাকার পর যা করে গেছো তাতো করেছই। "এ দু'টি কথার কোনো বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে নেই। এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। অনুরূপভাবে সূরা নামলে এ কাহিনী সহসা একথার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে যে, মূসা তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আগুন দেখলেন। এটা কোন ধরনের সফর ছিল, তিনি কোথায় থেকে আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এর কোনো বিবরণ সেখানে নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ এ সূরায় পাওয়া যায়। এভাবেএ তিনটি সূরা মিলে মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, -এর রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব অজুহাত পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো নাকচ করে দেয়া।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে মূসার কাহিনী"। সূরা নাযিলের সময়কালীন অবস্থার সাথে মিলে এ কাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শ্রোতার মনে কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। যেমন-

১. আল্লাহ যা কিছু করতে চান সে জন্য তিনি সবার অলক্ষ্যে কার্যকারণ ও উপায়-উপরকণ সংগ্রহ করে দেন। যে শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের রাজরত্বের

অবসান ঘটবার কথা, তাকে আল্লাহ্ স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরাউন জানতে পারেনি সে কাকে প্রতিতপালন করছে। সেই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর মোকাবিলায় কার কৌশল সফল হতে পারে?

২. কোনো বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুওয়াত দান করা হয় না। তোমরা অবাক হচ্ছো, মুহাম্মাদ ﷺ কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুওয়াত লাভ করেন এবং ঘরে বসে বসে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে থাকো যে, ... (৪৮ আয়াত) তিনিও এভাবে পথে চলার সময় নবুওয়াত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কী ঘটনা ঘটে গেলো তা ঘূণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলো না। মূসা নিজেও এক সেকেন্ড আগে জানতেন না তিনি কী জিনিস পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

৩. যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ্ কোনো কাজ নিতে চান, কোনো দলবল সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোনো শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালারা শেষ পর্যন্ত তার মোকাবিলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে যে আনুপাতিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য ছিল মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতলো এবং কে হারলো।

৪. তোমরা বার বার মূসার বরাত দিয়ে থা কো। তোমরা বলে থাকো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মাদকে দেয়া হলো না কেন? অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছো, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মু'জিযাগুলো দেখাতে হবে যা মূসা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার অপেক্ষায় রয়েছো। কিন্তু যাদেরকে এসব মু'জিয়া দেখানো হয়েছিল তারা কী করেছিল তা কি তোমরা জানো? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনেনি। তারা নির্দ্বিধায় বলেছিল, এসব জাদু। কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছো। তোমরা কি ঐ ধরনের মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? তারপর তোমরা কি এ খবরও রাখো, যারা ঐ মু'জিযা দেখে সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি একই প্রকার হঠকারিতা সহকারে মু'জিযা দাবী জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাচ্ছো?

মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি মূসার এ কাহিনী শুনতো তার মনে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনা আপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কারণ সেসময় মুহাম্মাদ ﷺ ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল যেমন ইতোপূর্বে চলেছিল ফেরাউন ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে। এ অবস্থায় এ কাহিনী শুনাবার অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সম সাময়িক অবস্থার ওপর আপনা আপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যদি এমন একটি কথাও না বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে কাহিনীর কোন অংশটি সে সময়ের কোন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা জানা যায়, তাহলেও তাতে কিছু এসে যায় না।

এরপর পঞ্চম রুকূ' থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু হয়েছে। মুহাম্মাদ ﷺ উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর শহর ও তাঁর বংশের লোকেরা ভালোভাবেই জানতো, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোনো উপায় উপকরণ ছিল না। প্রথমে এ বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তারপর তাঁকে নবুওয়াত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ দেখাবার জন্য এ ব্যবস্থা করেন।

তারপর তারা বারবার "এই নবী এমন সব মু'জিযা আনছেন না কেন? যা ইতোপূর্বে মূসা এনেছিলেন।" এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়, মূসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছো যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে? তাহলে এখন এ নবীর মু'জিযার দাবী করছো কেন? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা বাসনার দাসত্ব না করো, তাহলে সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভুগতে থাকো, তাহলে যে কোনো মু'জিযা আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না।

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি ছিল, সে সময় বাহির থেকে কিছু খ্রিস্টান মক্কায় আসেন এবং নবী ﷺ-এর মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ নিয়ামত থেকে লাভবান তো হলোই না; উপরন্তু আবু জেহেল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে।

সবশেষে মক্কার কাফেররা নবী ﷺ-এর কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যে আসল ওযর পেশ করতো সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তারা বলতো, যদি আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে সহসাই এদেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছুবে যার ফলে আমরা আরবের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে বসবো এবং এ ভূ-খণ্ডে

আমাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্য বৈরিতার মূল উদ্যোক্তা। অন্যান্য সমস্ত সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজী। জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তারা সেগুলো সময়মতো তৈরি করে নিতো। তাই আল্লাহ্ সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন সমস্ত মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করতো।

অনৈসলামী সমাজে নারী-নিরাপত্তাহীনতার করুণ দৃষ্টান্ত

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

অর্থ : প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়। তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে লাঞ্ছিত করতো, তাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আসলে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা কাসাস : আয়াত-৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম হবার বছরের এ ঘটনাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আল বাকারার ৪৯ আয়াতেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

তৎকালীন মিশরের বাদশাদের উপাধী ছিল 'ফিরাউন'। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের সময়কার অবস্থা। সে সময়ে মিশরের যে অধিপতি ছিল, সে ছিল মিশরের দ্বিতীয় ফিরাউন একজন জালিম জঘন্য চরিত্রের রাজা। সে স্বপ্নে দেখলো যে, বনি ইসরাঈলের এক লোকের হাতে তার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। এ স্বপ্ন দেখার পর জালিম বাদশাহ্ রাজ্যের নবজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ জারি করে দিলো, কিন্তু কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিত। এভাবে সে তার বিভক্তিকৃত জনপদের একটি গোত্রকে পদানত করে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি; বরং সে সভ্যতা- সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এখানে কারো এ ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রেও তো মুসলিম ও জিম্মীর মধ্যে ফারাক করা হয় এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতাও সকল দিক দিয়ে

সমান রাখা হয়নি। এ সন্দেহ এজন্য সঠিক নয় যে, ফেরাউনী বিধানে যেমন- বংশ, বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণিগত বিভেদের উপর বৈষম্যের ভিত রাখা হয়েছে ইসলামী বিধানে ঠিক তেমনটি নয়; বরং ইসলামী বিধানে নীতি ও মতবাদের উপর এর ভিত রাখা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জিম্মী ও মুসলমানের মধ্যে আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে মোটেই কোনো ফারাক নেই। সকল পার্থক্য একমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আর এ পার্থক্যের কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে শাসকদল একমাত্র তারাই হতে পারে যারা হবে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমর্থক। এ দলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হতে পারে যে এ মূলনীতি মেনে নেবে না। এ পার্থক্য ও ফেরাউনী ধরনের পার্থক্যের মধ্যে কোনো মিল নেই। কারণ, ফেরাউনী পার্থক্যের ভিত্তিতে পরাধীন প্রজন্মের কোনো ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারে না। সেখানে পরাধীন প্রজন্মের লোকেরা রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকারও লাভ করে না। এমনকি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সেখানে কখনো পরাধীনদের জন্য কোনো অধিকারের জামানত দেয়া হয় না। সব ধরনের স্বার্থ, মুনাফা, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা একমাত্র শাসক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং এ বিশেষ অধিকার একমাত্র জাতির মধ্যে জন্মলাভকারী ব্যক্তিই লাভ করে।

এ থেকে জানা যায়, ইউসূফ (আ)-এর যুগ অতিক্রান্ত হবার পর মিসরে একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং কিবতীদের হাতে যখন পুনর্বার শাসন ক্ষমতা এসেছিল তখন নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার বনী ইসরাঈলের শক্তি নির্মূল করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের সেবাকর্ম নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি; বরং এ থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তাদের ছেলেদের হত্যা করে মেয়েদের জীবিত রাখার নীতি অবলম্বন করা হয়, যাতে করে তাদের মেয়েরা ধীরে ধীরে কিবতীদের অধীনে এসে যেতে থাকে এবং তাদের থেকে ইসরাঈলের পরিবর্তে কিবতীদের বংশ বিস্তার লাভ করে। তালমূদ এর আরো বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছে যে, ইউসূফ আঃ এর ইন্তিকালের সময় থেকে একশতকের কিছু বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর থেকে এ বিপ্লব আসে। সেখানে বলা হয়েছে, নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রথমে বনী ইসরাঈলকে তাদের উর্বর কৃষিক্ষেত্র, বাসগৃহ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদ থেকে বেদখল করে দেয়। এরপরও যখন কিবতী শাসকরা অনুভব করে যে, বনী ইসরাঈল ও তাদের সমধর্মবলম্বী মিশরীয়রা যথেষ্ট প্রভাবশালী তখন তারা ইসরাঈলীদেরকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতে থাকে এবং তাদের থেকে কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য পারিশ্রমিক বা বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ আদায় করতে থাকে। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, "তারা মিসরের অধিবাসীদের একটি গোষ্ঠিকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতো" এ বক্তব্য সেই উক্তির ব্যাখ্যা বিবেচিত হতে পারে। আর সূরা আল বাকারায় আল্লাহ যে বলেছেন, ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলদের কঠোর শাস্তি দিতো। এরও ব্যাখ্যা এটিই।

যে তিন নারীর মাধ্যমে আল্লাহ শিশু মূসাকে ফিরাউনের হাত থেকে রক্ষা করলেন

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۚ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ. فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : আমি মূসার মাকে ইশারা করলাম, "একে স্তন্যদান করো, তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে এবং কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না, তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করবো।" শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের পরিবারবর্গ তাকে (দরিয়া থেকে) উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং তাদের দুঃখের কারণ হয়। যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা (তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) ছিল বড়ই অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বললো, "এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়িয়েছে। কাজেই একে হত্যা করো না, বিচিত্র কি সে আমাদের জন্য উপকারী। ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। সে তার রহস্য প্রকাশ করে দিতো যদি আমি তার মন সুদৃঢ় না করে দিতাম, যাতে সে (আমার অংগীকারের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একজন হয়। সে শিশুর বোনকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। কাজেই সে তাদের (শত্রুদের) অজ্ঞাতসারে তাকে দেখতে থাকলো। আর আমি পূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্য দানকারিণীদের স্তন পান হারাম করে রেখেছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) সে মেয়েটি তাদেরকে বললো, "আমি তোমাদের এমন পরিবারের সন্ধান দেবো যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং এর কল্যাণকামী হবে?" এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়; কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না। (সূরা কাসাস : আয়াত-৭-১৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যে সময়ে মূসা-এর জন্ম হয়েছিল, সে সময়ে বনি ইসরাঈলের ছেলে সন্তানদের ধ্বংস করার স্কীম চলছিল খুব জোরে সোরে। প্রথমদিকে ফিরাউন ও তার সহায়তাকারীরা ধাত্রীদের মাধ্যমে এ কাজ আনজাম দিতো। কিন্তু তাওরাত থেকে জানা যায় যে, ধাত্রীগণ এ কাজে তেমন একটা সহায়তা করতো না। অবশেষে ফিরাউন কিবতীদের এ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে দিল যে, বনি ইসরাঈলীদের ঘরে যে ছেলে শিশু জন্ম নেবে, তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। ঠিক সেই ভয়াবহ সময়েই জন্মগ্রহণ করেন মূসা। তাঁর ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তিনজন মহিলা

১. মূসা-এর মা।

২. তাঁর বোন।

৩. ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

এদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পূরণ হয় আর ফিরাউনের সকল নীলনকশা ব্যর্থ হয়ে যায়। মূসা এতসব বাধা সত্ত্বেও বেঁচে যান।

মূসা-এর জন্ম হলে তাঁর মা সর্বক্ষণ আতংকে জড়ো হয়ে থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা মূসা-এর মায়ের অন্তরে সস্থিরতা ঢেলে দিলেন। বললেন, তুমি ওকে বুকের দুধ পান করাতে থাকো। যখন তার ব্যাপারে আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়, তখন শিশুটিকে বিনা দ্বিধায় সিন্দুকে ভরে নদীতে ছেড়ে দেবে। আর ওর জন্যে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা করবে না। আমি ওকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে দেব। তাছাড়া ভবিষ্যতে ওকে আমি রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করবো। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ তায়ালা মূসা-এর মাতাকে নিজ সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার নির্দেশ দানের মধ্যে যে রহস্য লুকায়িত আছে তাহলো ফিরাউন বনি ইসলাঈলদের ছেলে শিশুর জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, ঠিক সে পন্থায়ই তিনি মূসা-কে নাজাত দেয়ার জন্য স্থির করেছিলেন।

(তাদাব্বুরে কুরআন)

জন্মের সাথে সাথেই সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়নি; বরং বলা হয়, যতক্ষণ ভয়ের কারণ না থাকে শিশুকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেছে বলে মনে হবে এবং আশঙ্কা দেখা দেবে শিশুর আওয়াজ শুনে বা অন্য কোনোভাবে শত্রুরা তার জন্মের কথা জানতে পারবে অথবা স্বয়ং বনী ইসরাঈলীদের নীচ ব্যক্তি গোয়েন্দগিরী করবে, তখন নির্ভয়ে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। বাইবেলের বর্ণনা মতে জন্মের পর তিনমাস পর্যন্ত মূসার-এর মা তাকে লুকিয়ে রাখেন। তালমুদ এর উপর আরো বাড়তি খবর দিয়েছে যে, ফেরাউন সে সময় নারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল। তারা নিজেদের সাথে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে ইসরাঈলী পরিবারে যেতো এবং কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে সেখানে কাঁদাতো। এর ফলে কোনো ইসরাঈলী শিশু যদি সেখানে থাকত তবে শিশুর কান্না শুনে সেও কাঁদতো। এই নতুন ধরনের গোয়েন্দাগিরী মূসার মাকে পেরেশান করে দেয়। তিনি

নিজ পুত্রের প্রাণ বাচাঁনোর জন্য জন্মের তিনমাস পরে তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন। এ পর্যন্ত এ দুটি গ্রন্থের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। আর দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবার অবস্থাও তারা ঠিক একই ধরনের বর্ণনা করেছে যা কুরআনে বলা হয়েছে। সূরা তা-হা এ বলা হয়েছে "শিশুকে একটি সুন্দর সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও"। বাইবেল ও তালমূদ এরই সমর্থন করে। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, মূসার মাতা নলখাগড়ার একটি ঝুড়ি বানিয়ে তার গায়ে তৈলাক্ত মাটি আর আলকাতরা লেপন করে তাদের পানি থেকে সংরক্ষিত করে। তারপর মূসাকে তারমধ্যে শায়িত করে নীলনদে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, যা কোরআনে বণর্না করা হয়েছে তার কোনো উল্লেখ ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোতে নেই। অর্থাৎ মূসার মাতা আল্লাহর ইশারায় এ কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে পূর্বেই তাকে নিশ্চয়তা দান করেছিলেন যে, এভাবে কাজ করলে শুধু তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষাই পাবে তাই নয়; বরং আমি শিশুকে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং তোমার এ শিশুকে ভবিষ্যতে রাসূলের মর্যদাও দেয়া হবে।

প্রমাণিত হতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি। আর তারা (এর পরিণাম) জানতো না।

এ বর্ণনা থেকে বিষয়টির যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে এই যে, সিন্দুক বা ঝুড়ি নদীতে ভাসতে ভাসতে যখন ফেরাউনের প্রাসাদের কাছে চলে আসে তখন ফেরাউনের চাকর-বাকররা তা ধরে ফেলে এবং উঠিয়ে নিয়ে বাদশাহ এবং বেগমের সামনে পেশ করে। সম্ভবত বাদশাহ এবং বেগম সে সময় নদীর কিনারে ভ্রমণরত অবস্থায় ছিলেন এমন সময় ঝুড়িটি তাদের চোখে পড়ে এবং তাদের হুকুমে সেটিকে নদী থেকে উঠানো হয়। তার মধ্যে একটি শিশু রাখা আছে দেখে অতি সহজেই এ অনুমান করা যেত পারত যে, নিঃসন্দেহে এটি কোনো ইসরাঈলীর সন্তান হবে। কারণ ইসরাঈলী জনবসতির দিক থেকে ঝুড়িটি আসছিল এবং সে সময় তাদের পুত্র সন্তানদেরকেই হত্যা করা হচ্ছিল। তাদের সম্পর্কেই ধারণা করা যেতে পারত যে, কেউ তাদের সন্তানকে লুকিয়ে কিছুদিন লালন পালন করার পর এখন যখন দেখছে যে আর লুকানো যাবে না তখন এ আশায় নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে যে, হয়তো সে প্রাণে বেঁচে যাবে এবং তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করা হবে। এ কারণে কিছু অতি বিশ্বস্ত গোলাম এ পরামর্শ দেয় যে, হুজুর একে এখনই হত্যা করুন। এতো কোনো সাপেরই বাচ্চা। কিন্তু ফেরাইনের স্ত্রীতো ছিলেন একজন নারীই এবং নিঃসন্তান। তাছাড়া শিশুও ছিল বড়ই মিষ্টি চেহারার। যেমন সূরা ত-হা-য় আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলাম"। অর্থাৎ আমি তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দান করেছিলাম যে, দর্শনকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে আদর করতো। তাই মহিলা আত্ম সম্বরণ করতে পারেননি। তিনি বলে উঠলেন, একে হত্যা করো না; বরং উঠিয়ে নিয়ে প্রতিপালন করো। সে যখন আমাদের এখানে প্রতিপালিত হবে এবং আমরা তাকে নিজের পুত্র করে নেবো তখন সে যে ইসরাঈলী সে

কথা সে কেমন করে জানবে। সে নিজেকে ফেরাউন বংশেরই একজন মনে করবে এবং তার যোগ্যতাগুলো বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে আমাদের কাজে লাগবে।

বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে যে ভদ্র মহিলা মূসাকে লালন পালন করা ও পুত্রে পরিণত করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি ফেরাউনের স্ত্রী নন; বরং তার কন্যা ছিলেন। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলছে, "ফেরাউনের স্ত্রী"। আর একথা সুস্পষ্ট যে, শত শত বছর পরে মুখ ফুটে রটে যাওয়ায় লোককাহিনীর তুলনায় সরাসরি আল্লাহর বর্ণিত ঘটনাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

মেয়েটি এমনভাবে ঝুড়ির উপর নজর রাখে যারফলে ভাসমান ঝুড়ির সাথে সাথে সে চলতে থাকে এবং তার প্রতি নজরও রাখতে থাকে। আবার শত্রু যাতে না বুঝতে পারে তার কোনো সম্পর্ক ঝুড়ির শিশুটির সাথে আছে সেদিকেও খেয়াল রাখে। ইসলাঈলি বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় মূসার বোনের বয়স ছিল দশ বারো বছর। সে বড়ই সতর্কতার সাথে ভাইয়ের অনুসরণ করে এবং সে যে ফেরাউনের মহলে পৌঁছে গেছে তা বুঝতে পারে এবং তার তীব্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ থেকে জানা যায়, ভাই ফেরাউনের মহলে পৌঁছে যাবার পর বোন ঘরে বসে থাকে নি; বরং সে একই প্রকার সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহলের আশে পাশে চক্কর দিতে থাকে। তারপর যখন জানতে পারে শিশু কারো স্তন মুখে নিচ্ছে না এবং বাদশাহ-বেগম শিশুর পছন্দনীয় ধাত্রীর সন্ধান লাভের জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে তখন সেই বুদ্ধিমতি মেয়ে সোজা রাজমহলে পৌঁছে যায়। সে ঘটনাস্থালে গিয়ে বলে আমি একজন ভাল ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যে বড়ই স্নেহ ও মমতা সহকারে এই শিশুর লালন-পালন করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও বুঝে নিতে হবে, প্রাচীন কালে বড় ও অভিজাত বংশীয় লোকেরা নিজেদের শিশু সন্তান নিজেদের কাছে রেখেই তাদের লালন পালন করার পরিবর্তে সাধারণত ধাত্রীদের হাতে সোপর্দ করে দিতো এবং তারাই নিজেদের কাছে রেখেই তাদের লালন পালন করত। নবী ﷺ-এর জীবন কাহিনী এ কথার উল্লেখ আছে যে, মক্কার আসে পাশে মহিলারা মাঝে মাঝে মক্কায় আসতো ধনীর সেবা দান করার জন্য এবং সরদারদের সন্তানদেরকে মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধ পান করাবার জন্য নিয়ে যেতো। নবী ﷺ নিজেও হালীমা সাদীয়ার গৃহে মরুভূমির বুকে প্রতিপালিত হয়েছেন। মিসরেও ছিল এই একই রেওয়াজ। এ কারণে মূসার বোন একথা বলেননি, "আমি একজন ভালো ধাত্রী এনে দিচ্ছি; বরং বলেন, এমন গৃহের সন্ধান দিচ্ছি যার অধিবাসীরা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা কল্যাণকামিতার সাথে একে লালন পালন করবে।"

আর আল্লাহর এ কুশলী ব্যাবস্থার ফলে এ লাভটিও হয় যে, মূসা প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের শাহজাদা হতে পারেননি; বরং নিজের মা-বাপ-ভাই-বোনদের মধ্যে প্রতিপালিত হবার কারণে নিজের আসল পরিচয় তিনি ভালোভাবেই অবহিত থাকতে পেরেছেন। নিজের

পারিবিরিক ঐতিহ্য ও পিতৃ পুরুষের ধর্ম এবং নিজের জাতি থেকে তাঁর সম্পর্কচ্যূতি ঘটতে পারেনি। তিনি ফেরাউন পরিবারের একজন সদস্য হবার পরিবর্তে নিজের মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে বনী ইসরাঈলেরই একজন সদস্যে পরিণত হন। নবী ﷺ একটি হাদীসে বলেছন, "যে ব্যাক্তি নিজের রুজি রোজগারের জন্য কাজ করে এবং সে কাজে লক্ষ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তার দৃষ্টান্ত মূসার মায়ের মতো: তিনি নিজেরই সন্তানকে দুধ পান করান আবার তার বিনিময় লাভ করেন।" অর্থাৎ এ ধরনের লোক যদিও নিজের এবং নিজের সন্তানদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়ার জন্য কাজ করে কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈমানদারীর সাথে কাজ করে, যার সাথেই কাজ কারবার করে তার হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং হালাল রিজিকের মাধ্যমে নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণকে আল্লাহর ইবাদাত মনে করে, তাই নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্যেও সে আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়। অর্থাৎ একদিকে জীবিকাও উপার্জন করা হয় এবং অন্যদিকে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানও লাভ করা হয়।

১৫. সূরা আল আহযাব (سُوْرَةُ الْاَحْزَاب)

আয়াত : ৭৩ রুকূ : ৯ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

এ সূরাটির নাম ২০ নং আয়াতের 'আহযাব' বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

১. আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

২. বনী কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরীর যিল্‌কাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়।

৩. যয়নবের رضي الله عنها সাথে নবী ﷺ-এর বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিল্‌কাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদি ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মনে আশা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে। উহুদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে। উহুদ যুদ্ধের পরে দু'মাসও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেল যে, নজদের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী ﷺকে আবু সালামার সারীয়া বাহিনী পাঠানো হলো। (সীরাতের পরিভাষায় 'সারীয়া' বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী ﷺ শরীক ছিলেন না। আর 'গাযওয়া' বলা হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী ﷺ নিজে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।) তারপর ৪ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ্ গোত্রদ্বয় তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীন ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে কয়েকজন লোক চায়। নবী ﷺ ছ'জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী' (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে) নামক স্থানে পৌঁছে তারা হুযাইল গোত্রের কাফেরদেরকে এ নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে এবং দু'জনকে (হজরত খুবাইব ইবনে আদী ও যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো একটি প্রচার দল পাঠান। এ দলে ছিলেন চল্লিশ

জন (অন্য উক্তি মতে ৭০ জন) আনসারি যুবক। তাঁরা নজদের দিকে রওনা হন। কিন্তু তাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের 'উসাইয়া, বি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্রত্রয় বি'রে মা'উনাহ্ নামক স্থানে অকস্মাত তাদেরকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাযীর ইহুদি গোত্রটি সাহসি হয়ে ওঠে এবং একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী ﷺকে শহীদ করে দেয়ার ষরযন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্ফানের দু'টি গোত্র বনু সা'লাবাহ্ ও বনু মাহারিব মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার জন্য স্বয়ং নবী ﷺকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও প্রতাপে যে ধস নামে, ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে।

কিন্তু শুধুমাত্র মুহম্মাদ ﷺ-এর বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই আবস্থার গতি পাল্টে দেয়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। আশেপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। মদীনার মধ্যেই ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা মু'মিনগোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ নেয় যার ফলে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি; বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

আহ্যাব যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধগুলো

১. এর মধ্যে উহুদ যুদ্ধের পরপরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু গৃহে নিকটতম আত্মীয়দের শহাদাতবরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী ﷺও আহত ছিলেন এবং তার চাচা হাম্যার رضي الله عنه শাহাদাতবরণে ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসর্গীত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। নবী করীমের ﷺ এ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমণের জন্যে দৌড়ে আসবে। এ জন্য তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ৬৩০ জন উৎসর্গীত প্রাণ সাথী তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। মক্কার পথে হাম্রাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তিন দিন অবস্থান করেন। যেখানে একজন অমুসলিম শুভানাধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তারা যথার্থই

নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সেনা দল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশরা আগে বেড়ে যে হিম্মত দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি; বরং আশপাশের দুশমনরাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর ইংগিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত

২. যখনই বণী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, নবী করীম ﷺ এর গোয়েন্দারা যথাসময়ে তাদের সংকল্পের খবর তাঁর কানে পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি আবু সালামার (উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলা করার জন্য পাঠান। এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। অসচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

৩. এরপর আসে বনী নাযীরের পালা। যেদিন তারা নবী ﷺকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু'হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে। নজ্‌দ থেকে বনী গাত্‌ফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী ﷺকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, আপনার যা করার করবেন। নবী করীম ﷺ নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই তাদের ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে। এভাবে মদীনার শহরতলীর সমস্ত মহল্লা যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু মুসলমানদের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে।

৪. তারপর তিনি বনী গাত্‌ফানের দিকে নজর দেন। তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল। তিনি চার শত সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর রিকা' নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন। এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোনো যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের বাড়িঘর মাল-সামান সবকিছু ফেলে রেখে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

৫. এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য বের হয়ে পড়েন। উহুদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে সে নবী ﷺ ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিল : مِنْ مَّوْعِدُكُمْ بَدْرٌ لِّلْعَامِ الْمُقْبِلِ (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও তোমাদের মোকাবিলা হবে।) নবী করীম ﷺ জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেনঃ نَعَمْ هِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدٌ (ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো)। এ সিদ্ধান্ত আনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু মাররায যাহ্‌রান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত হয়নি। নবী করীম ﷺ আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তরবর্তীকালে ব্যবসায় করে মুসলমানরা বেশ দু'পয়সা কামাতে থাকে। এঘটনার ফলে উহুদে মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চাইতেও আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না।

৬. আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল জান্‌দাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যেখান থেকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুণ্ঠন করতো। নবী ﷺ ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মোকাবিলা করার সাহস করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মোকাবিলা করা এখন আর একটি দু'টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আহ্‌যাবের যুদ্ধ

এ অবস্থায় আহ্‌যাব যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এক

বিরাট বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমন করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতোপূর্বে আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয় উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার ইহুদিরা। এরা মদীনা থেকে বিতারিত হয়ে খয়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাত্ফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, মুররহা, আশজা', সা'আদ ও আসাদ ইত্যাদি)। দক্ষিন থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সমম্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ বারো হাজারের কম হবে না।

এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হত ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী ﷺ মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিস্ক্রিয় বসে ছিলেন না; বরং সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।এ বিসাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌঁছুবার আগেই ছ'দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং সাল্'আ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমাণ ছিল এত বেশি (এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোনো আক্রমণ চলানো সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার উপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিম দক্ষিণ কোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে পারতো একমাত্র উহুদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম ﷺ এদিকেই পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল নক্শায় আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য তৈরি হতে হয়। অথচ এ জন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি।

এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদি গোত্র বনী কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল এবং এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে নিজেদের পরিবার ছেলে মেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেনি। কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ করতে পারে। তাদের পক্ষ থেকে বনী নযীরের ইহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবকে বনী কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার

করে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদের ﷺ সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোনো ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখ্‌তাব তাদেরকে বললো, "দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছি। একে খতম করে দেবার এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর আর কোনো সুযোগ পাবে না" তখন ইহুদি জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

নবী ﷺ এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথা সময়ে এ খবর পেয়ে যান। সাথে সাথেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা'দ ইবনে উবাদাহ, সা'দ ইবনে মু'আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত করার এবং সেই সাথে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইংগিতে এ খবরটি দেবে যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মত হারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বনি কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে জানিয়ে দেয়

لَاعَقْدَ وَلَاعَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ

আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোন অংগীকার ও পতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইংগিতে নবী ﷺকে জানান 'আদল ও কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী' নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী কুরাইযা এখন তাই করছে।

এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ব্যপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু'দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শহরের যে অংশে তারা কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশি বেড়ে যায়। মু'মিনদের উৎসাহ-উদ্যম নিস্তেজ করে দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, "আমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে আমরা পেসাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা

করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ ﷺকে তাদের হাতে তুলে দাও। এটা এমন একটা কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল যার মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকি ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে।

এহেন নাজুক সময়ে নবী ﷺ গাত্‌ফানদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা ? অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের এটা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই ? না কি নিছক আমাদেরকে বাঁচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব দিচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাচাবার জন্য এ ব্যাবস্থা অবলম্বন করছি। কারণ আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।"একথায় উভয় সরদার এক কণ্ঠে বলেন, "যদি আপনি আমাদের জন্য এ চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার গৌরব অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে? আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি।

এ সময় গাত্‌ফান গোত্রের আশ্‌জা' শাখার না'ঈম ইবনে মাস'উদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবী ﷺ-এর সামনে আসেন। তিনি বলেন, এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোনো কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। নবী ﷺ বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো। একথায় তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশি। তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান তো অবরোধে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখনে বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না যতক্ষণ বাইরে থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তোমাদের কাছে যিম্মি হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা গোত্রসমূহের

সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিম্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও গাতফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিম্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং তাদেরকে মুহাম্মাদের ﷺ হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতকর্তার সাথে কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের লোকেরা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযার নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। আগামীকাল তোমরা ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই সঙ্গে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবো। বনী কোরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিম্মী স্বরূপ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা না'ঈমের কথা সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিম্মী দিতে অস্বীকার করে। ফলে বনী কুরাইযা বিশ্বাস করে না'ঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শত্রুশিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়।

এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। এত বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল। এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধূলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত্য, বজ্রপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে ওঠে ময়দানে একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী ﷺ ময়দান শত্রুশূন্য দেখে সাথে সাথেই বলেন, এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না এখন তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।" এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (Offensive) শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিবরাঈল ﷺ এসে হুকুম শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, "যে ব্যক্তিই শ্রবণ ও অনুগত্যের ওপর অবিচল আছো সে আসরের নামাজ ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ো না যতক্ষণ না বনী কুরাইযার আবাসস্থলে পৌঁছে যাও।" এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি আলীকে ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ

অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন ইহুদিরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহা অপরাধ করেছিল তার দন্ড থেকে এ গালাগালি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো? আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে করেছিল এরা এসেছে নিছক ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী ﷺ-এর নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছে গেল এবং তাদের জনবসতি ঘেরাও করে নেয়া হল তখন তাদের হুশ হলো। দু'তিন সপ্তাহের বেশি তারা অবরোধের কঠোরতা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না। অবশেষে তারা এ শর্তে নবী ﷺ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে মু'আয رضي الله عنه তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ আশায় সা'দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন যেমন ইতোপূর্বে বনী কাইনুকা' ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের লোকেরাও সা'দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবী করছিল। কিন্তু সা'দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু'টি ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কী ষড়যন্ত্রটাই না করেছিল সে ঘটনা এখনো তার সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেন, বনী কুরাইযার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনীকুরাইযার পল্লীতে। সেখানে তারা দেখলো, আহ্‌যাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত তলোয়ার, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। মুসলমানরা যদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ঠিক এমন এক সময় পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহার করা হতো যখন সামনে থেকে মুশরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশই থাকেনি যে, সা'দ ইহুদিদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা সঠিক ছিল কী-না।

সামাজিক সংস্কার

উহুদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দু'টি বছর যদিও এমন সংকট এবং গোলযোগে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী ﷺ ও তাঁর সহাবীগণ এক দিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ সমগ্র সময়-কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য বিষয় ছিল দত্তক গ্রহণ। আরবের লোকেরা যে শিশুকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মত মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও গর্ভধারিণী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারাম হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই স্ত্রীলোককে তার আপন ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল। আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোনো অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পথরোধ করতে চায় এ রীতি সেগুলোর বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে সাহয্য করছিল। কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো হতে পারে না। এসব কৃত্রিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারণে ইসলামের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবী হচ্ছে এই যে, দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু এ ধারণাটি এমন পর্যায়ের নয় যে, শুধুমাত্র একটি আইনগত হুকুম হিসেবে এতটুকু কথা বলে দেয়া হলো যে, "দত্তক ভিত্তিক আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়" এবং তারপর তা খতম হয়ে যাবে। শত শত বছরের অন্ধ কুসংস্কার নিছক মুখের কথায়

বদলে যাবে না। আইনগতভাবে যদি লোকেরা একথা মেনেও নিতো যে, এ আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়, তবুও পালক মা ও পালক পুত্রের মধ্যে, পালক ভাই ও পালক বোনের মধ্যে, পালক বাপ ও পালক মেয়ের মধ্যে এবং পালক শ্বশুর ও পালক পুত্রবধূর মধ্যে বিয়েকে লোকেরা মাকরূহই মনে করতে থাকতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাও কিছু না কিছু থেকে যেতো। তাই কার্যত এ রেওয়াজটি ভেঙে ফেলাই অপরিহার্য ছিল। আর ভেঙে ফেলার এ কাজটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতেই সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ যে কাজটি রাসূল নিজে করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমে করেছেন তার ব্যাপারে কোনো মুসলমানের মনে কোনো প্রকার অপছন্দনীয় হবার ধারণা থাকতে পারতো না। তাই আহযাব যুদ্ধের কিছু পূর্বে নবী ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা কর হয় যে, তুমি নিজের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিজেই বিয়ে করে নাও। বনী কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় তিনি এ হুকুমটি তামিল করেন। (সম্ভবত ইদ্দত খতম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই ছিল বিলম্বের কারণ। আবার এ সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের চাপও বেড়ে গিয়েছিল।)

যয়নবকে বিয়ে করার ফলে তুমুল অপপ্রচার

এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে অকস্মিত ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদী সবাই তাঁর ক্রমাগত বিজয়ে জ্বলে পুড়ে মরছিল। উহুদের পরে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ পর্যন্ত দু'টি বছর ধরে যেভাবে তারা একের পর একমার খেতে থেকেছে তার ফলে তাদের মনে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। এখন প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে আর কোনো দিন তাঁকে হারাতে পারবে, এ ব্যাপারেও তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিয়ের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এটি সুযোগ মনে করে এবং ধারণা করে যে, এবার আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর শক্তি ও তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব খতম করে দিতে পারবে। কাজেই গল্প ফাঁদা হয়, (নাউযুবিলআহ) মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পুত্রবুধকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। পুত্র এ প্রেমের কথা জানতে পেরে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আর এরপর তিনি পুত্রবধুকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ এটা ছিল একদম বাজে কথা। কারণ যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর ফুফাত বোন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হয় নবী করীম ﷺ-এর সামনে।

কোনো এক সময় তাঁকে দেখে আসক্ত হবার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? তারপর রাসূল ﷺ নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তাঁর বিবাহ দেন। কুরাইশ বংশের মতো সম্ভ্রান্ত গোত্রের একটি মেয়েকে একজন আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেবার ব্যাপারে তাঁর পরিবারের কেউই রাজী ছিল না। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেও এ বিয়েতে অখুশী ছিলেন। কিন্তু নবী কারীমের ﷺ হুকুমের সামনে সবাই যায়েদের রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে তাঁরা আরবে এ মর্মে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন

যে, ইসলাম একজন আযাদকৃত গোলামকে অভিজাত বংশীয় কুরাইশীদের সমপর্যায়ের নিয়ে এসেছে। সত্যিই যদি যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো আকর্ষণ থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে তাঁকে বিয়ে দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরোধীরা এসব নিরেট সত্যের উপস্থিতিতেও এ প্রেমের গল্প ফেঁদে বসে। খুব রঙ চড়িয়ে এগুলো ছড়াতে থাকে। অপ্রপ্রচারের অভিযান ক্রমে এত প্রবল হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের তৈরি করা গল্প ছড়িয়ে পড়ে।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের এ মনগড়া কাহিনী যে মুসলমানদের মুখ দিয়েও রচিত হতে বাধেনি, এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সমাজে যৌনতার উপাদান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। সমাজ জীবনে এ নোংরামিটা যদি না থাকতো তাহলে এ ধরনের পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মনগড়াকাহিনী মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা সেদিকে কারো বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করাও সম্ভবপর হতো না। যে সংস্কারমূলক বিধানটিকে "হিজাব' (পর্দা) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এটি ছিল ইসলামী সমাজে তার প্রবর্তন শুরু করার সঠিক সময়। এ সূরা থেকেই এ সংস্কার কাজের সূচনা করা হয় এবং এক বছর পরে যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের কদর্য অভিযানটি চালানো হয় তখনই সূরা নূর নাযিল করে এ বিধানকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়।

রাসূলের পরিবারিক জীবনের বিষয়াবলি

এ সময়ে আরো দু'টি বিষয় ছিল আকর্ষণ করার মত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারিবারিক জীবনের সাথে কিন্তু যে সত্তা আল্লাহর দীনকে সম্প্রসারিক ও বিকশিত করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রাম সাধনা করে চলছিলেন এবং নিজের সমস্ত দেহমন প্রাণ এ মহত কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন তাঁর জন্য পারিবারিক জীবনে শান্তি লাভ, তাকে মানসিক অস্থিরতা মুক্ত রাখা এবং মানুষের সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা ও স্বয়ং দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জরুরি ছিল। তাই আল্লাহ নিজেই সরাসরি এ দু'টি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

প্রথম বিষয়টি ছিল, সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন। প্রথম চার বছর তো তাঁর অর্থোপার্জনের কোনো উপায়-উপকরণ ছিল না। চতুর্থ হিজরীতে বনী নযিরকে দেশান্তর করার পর তাদের পরিত্যক্ত ভূমির একটি অংশকে আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু তাঁর পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এত বিরাট যে, তাঁর দেহমন ও মস্তিস্কের সমস্ত শক্তি এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজে ব্যয়িত হবার দাবী জানাচ্ছিল। ফলে নিজের অর্থোপার্জনের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও প্রচেষ্টা তিনি চালাতে পারতেন না। এ অবস্থায় তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের কারণে যখন তাঁর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতেন তখন তাঁর মনের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চেপে বসতো।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল যয়নবকে রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে করার আগে তাঁরা ছিলেন : সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মু'মিমীন যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর ফলে বিরোধীরা এ আপত্তি উঠালো এবং মুসলমানদের মনেও এ সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো যে, তাদের জন্য তো এক সংগে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা অবৈধ গণ্য করা হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ পঞ্চম স্ত্রী রাখলেন কেমন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরা আহ্‌যাব নাযিল হবার সময় এ সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে এবং এখানে এগুলোই আলোচিত হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে এর পটভূমি সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এ সমগ্র সূরাটি একটি ভাষণ নয়। একই সময় একই সংগে এটি নাযিল হয়নি; বরং এটি বিভিন্ন বিধান ও ফরমান সম্বলিত। এগুলো সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি প্রসঙ্গে একের এক নাজিল হয় তারপর সবগুলোকে একত্র করে একটি সূরার আকারে বিন্যস্ত করা হয়। এর নিম্নলিখিত অংশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

এক : প্রথম রুকু' । আহ্‌যাব যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ রুকু'টি পড়লে পরিষ্কার অনুভূত হবে,এ অংশটি নাযিল হবার আগেই যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দত্তক সম্পর্কিত জাহেলী যুগের ধারণা, সুকসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন অনুবভ করছিলেন। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে, লোকেরা "পালক" সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্রেফ আবেগের ভিত্তিতে যে ধরনের স্পর্শকাতর ও কঠোর চিন্তাধারা পোষণ করে তা কোনোক্রমেই কতম হয়ে যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে (অর্থাৎ নবী) অগ্রবর্তী হয়ে এ রেওয়াজটি খতম করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারেই বড় সন্দিহান ছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতেও ইতঃস্তত করছিলেন। কারণ যদি তিনি এ সময় যায়েদের তালাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে হাংগামা সৃষ্টি করার জন্য পূর্বে যেসব মুনাফিক, ইহুদি ও মুশিরিকরা তৈরি হয়ে বসেছিল তারা এবার এটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সময় প্রথম রুকু'র আয়াতগুলি নাযিল হয়।

দুই : দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকুতে আহ্‌যাব ও বণী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এ দু'টি রুকু যে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ দুটি হয়ে যাবার পর নাজিল হয়েছে এটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিন : চতুর্থ রুকূ' থেকে শুরু করে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তা দু'টি বিষয়বস্তু সম্বলিত । প্রথম অংশে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণকে নোটিশ দিয়েছেন। অভাব অনটনের যুগে তারা বেসবর হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা একদিনে দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে আল্লাহ,তাঁর রাসূল ও আখেরাতে এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নাও। যদি প্রথমটি তোমাদের কাঙ্ক্ষিত হয়

তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমাদেরকে একদিনের জন্য এ অনটনের মধ্যে রাখা হবে না বরং সানন্দে বিদায় করে দেয়া হবে। আর যদি দ্বিতীয়টি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে সবর সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সহযোগিতা করো। পরবর্তী অংশগুলোতে এমন সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার প্রয়োজনীতা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা মন-মগজের অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসংগে নবী (ﷺ) গৃহ থেকে সংস্কারে সূচনা করতে গিয়ে নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিহার করো। আত্মমর্যাদা নিয়ে গৃহে বসে থাকে। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করো। এ ছিল পর্দার বিধানের সূচনা।

চার : ৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে যয়নবের সাথে নবী ﷺ বিয়ে সম্পর্কিত। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠানো হচ্ছিল এখানে সেসবের জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মনে সেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেগুলো সবই দূর করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে নবীর ﷺ মর্যাদা কী তা জানানো হয়েছে এবং খোদ নবীকে ﷺ কাফের ও মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারণার মুখে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচ : ৪৯ আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত এসব ঘটনাবলি প্রসংগে কোনো এক সময় এটি নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয় : ৫০ থেকে ৫২ আয়াতে নবী ﷺ-এর জন্য বিয়ের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে নবীর ﷺ ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

সাত : ৫৩-৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠানো হয়েছে। এগুলো নিম্নলিখিত বিধান সম্বলিত নবী ﷺ-এর গৃহাজান্তরে বেগানা পুরুষদের যাওয়া আমার ওপর বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেবার নিয়ম-কানুন, নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এ আইন যে, গৃহাভ্যন্তরে কেবলমাত্র তাঁদের নিকটতম আত্মীয়রাই আসতে পারেন, বেগানা পুরুষদের যদি কিছু বলতে হয় বা কোনো জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বলতে ও চাইতে হবে নবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীদের ব্যাপারে এ হুকুম যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্য নিজদের মায়ের মতো হারাম এবং নবীর ﷺ পরও তাঁদের কারো সাথে কোনো মুসলমানদের বিয়ে হতে পারে না।

আট : ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে নবী ﷺ-এর বিয়ে ও তাঁর পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই সংগে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন শত্রুদের পরনিন্দা ও অন্যের ছিদ্রানেষণ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং নিজেদের নবীর ওপর দরুদ পাঠ করে। এছাড়া এ

উপদেশ দেয়া হয় যে, নবী তো অনেক বড় কথা, ঈমানদারদের তো সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া ও দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকা উচিত।

নয় : ৫৯ আয়াতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে সমগ্র মুসলিম নারী সমাজের যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এরপর থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়ানোর অভিযানের (whispering campaign) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ ও ভীতী প্রদর্শন করা হয়েছে। মুনাফিক, অকাটমূখ্য ও নিকৃষ্ট লোকেরা এ অভিযান চালাচ্ছিল।

মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُهٰجِرِیْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤی اَوْلِیٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِی الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا.

অর্থ : নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা আর আত্মীয়-স্বজন আল্লাহর বিধানে পরস্পর উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কিছু অনুগ্রহ করতে চাও করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা আহযাব : আয়াত-৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : নবী ﷺ-এর সাথে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের সাথে নবী ﷺ-এর যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। নবী ও মু'মিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত, অন্য কোনো আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোনো দিক দিয়ে সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী ﷺ মুসলমানদের জন্য তাদের বাপ-মায়ের, চাইতেও বেশি স্নেহশীল ও দয়াদ্র হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, তাদেরকে দিয়ে অন্যায় কাজ করাতে পারে, তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু নবী ﷺ তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন কাজই করতে পারেন যাতে তাদের সত্যিকারের সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে পারে, বোকামি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নবী ﷺ তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন এই তখন মুসলমানদের ওপরও নবী ﷺ-এর এ অধিকার আছে যে, তারা তাঁকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় মনে

করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসবে। নিজেদের মতামতের ওপর তার মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার চেয়ে তাঁর ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে। তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। বুখারি ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাদের হাদীসগ্রন্থে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, "তোমাদের কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশি প্রিয় হই।"

ওপরে বর্ণিত এ একই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নবী ﷺ-এর এও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মুসলমানদের নিজেদের পালক মাতা কখনো কোনো অর্থেই তাদের মা নয়; কিন্তু নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ ঠিক তেমনিভাবে তাদের জন্য হারাম যেমন তাদের আসল মা তাদের জন্য হারাম। এ বিশেষ বিধানটি নবী ﷺ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ শুধু মাত্র এ অর্থে মু'মিনদের মাতা যে, তাঁদেরকে সম্মান করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং তাঁদের সাথে কোন মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলমান তাদের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম ছিল এবং তাঁদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। তাঁদের মেয়েরা মুসলমানদের জন্য বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে পরে। তাঁদের ভাই ও বোনেরা মুসলমানদের জন্য মামা ও খালার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কোনো ব্যাক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস লাভ করে তাঁদের তরফ থেকে কোনো আত্মীয় মুসলমান সে ধরনের কোনো মীরাস লাভ করে না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ-এর সাথে তো মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন ছিল সবকিছু থেকে আলাদা। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে আত্মীয়দের অধিকার পরস্পরের ওপর সাধারণ লোকদের তুলনায় অগ্রগণ্য হয়। নিজের মা-বাপ, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোনদের প্রয়োজন পূর্ণ না করে বাইরে দান-খয়রাত করে বেড়ালে তা সঠিক গণ্য হবে না। যাকাতের মাধ্যমে প্রথমে নিজের গরীব আত্মীয় স্বজনদেরকে সাহায্য করতে হবে এবং তারপর অন্যান্য হকদারকে দিতে হবে। মীরাস অপরিহার্যভাবে তারাই লাভ করবে যারা হবে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। অন্যদেরকে সে চাইলে (জীবিতাবস্থায়) হেবা, ওয়াকফ বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের সম্পদ দান করতে পারে। কিন্তু এও ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সে সবকিছু অন্যদেরকে দিয়ে যেতে পারে না। হিজরাতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে নিছক দীনী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পরের ওয়ারিস হতেন, এ হুকুমের মাধ্যমে তাও রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ পরিষ্কার বলে দেন, মীরাস বণ্টন হবে আত্মীয়তার ভিত্তিতে। তবে হ্যাঁ কোনো ব্যক্তি চাইলে হাদীয়া, তোহ্‌ফা,উপঢৌকন বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোনো দীনী ভাইকে সাহায্য করতে পারেন।

রাসূলের স্ত্রীদের দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا . وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا .

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য চাও, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং সম্মানের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকাল চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ গুণসম্পন্ন, আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব : আয়াত : ২৮-২৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এমন ঘটনাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ছিল নবী করীম ﷺ-এর মর্জির পরিপন্থী, যাতে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ পান। তম্মধ্য হতে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত একটি ঘটনা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু-এর রেওয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ তার খেদমতে সমবেতভাবে হাজির হয়ে তাদের জীবিকা ও আনুসঙ্গিক খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাসসির আবু হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে বাহরে মুহীতে প্রদান করেন। তাহলো আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর ও বনু কুরাইযার বিজয় এবং গনীমতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ রাযিআল্লাহু আনহা ভাবলেন যে, মহানবী ﷺ হয়তো এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধগ্রহণাপত্র ও মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্যে রয়েছে অগণিত দাস-দাসী। আমাদের দারিদ্র্য-পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানী করে আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজা-বাদশাদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সৎসঙ্গ ও প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী-গ্রহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবী ﷺ যে দুঃখিত হবেন, তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মধ্যে কিছুটা প্রাচুর্যের অভিলাস উদয় হয়েছিল।

সহীহ মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সে যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে হাজির হয়ে দেখনে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন এবং তিনি কোনো কথা বলছেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি দেখতে পাচ্ছো, এরা আমার চারদিকে বসে আছে এবং আমার কাছে খরচপত্রের জন্য টাকা চাচ্ছে।" একথা শুনে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে ধমক দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা রাসূলল্লুাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছো এবং এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর কাছে নেই। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আর্থিক সংকট সে সময় কেমন ঘনীভূত ছিল এবং কুফর ও ইসলামের চরম দ্বন্দ্বের দিনগুলোতে খরচপাতির জন্য পবিত্র স্ত্রীগণের তাগাদা তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে কীভাবে বিচলিত করে তুলছিল।.

এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী ছিল চারজন। তাঁরা ছিলেন

১.সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা,

২.আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা,

৩.হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং

৪.উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তখনো যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা সাথে নবী করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে হয়নি।

(আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ১৯৫৮ সালে মিসর থেকে মুদ্রিত, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৩)

এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আয়েশার সাথে আলোচনা করেন এবং বলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, জবাব দেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তোমার বাপ-মায়ের মতামত নাও এবং তারপর ফায়সালা করো।" তারপর তিনি তাঁকে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ হুকুম এসেছে এবং তাঁকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। আয়েশা বলেন, "এ ব্যাপারটি কি আমি আমার বাপ-মাকে জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতকে চাই।" এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের প্রত্যেকের কাছে যান এবং তাঁদেরকে একই কথা বলেন। তারা প্রত্যেকে আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা মতো একই জবাব দেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও নাসাঈ)

ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "তাখঈর"। অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা। এই তাখঈর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ আল্লাহ তাঁকে এর হুকুম দিয়েছিলেন। যদি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ আলাদা হয়ে যাবার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে তিনি আপনা আপনিই আলাদা হয়ে যেতেন না; বরং নবী করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদা করে দেবার কারণে আলাদা হয়ে যেতেন যেমন আয়াতের শব্দাবলি থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে, "এসো আমি কিছু দিয়ে তোমাদের ভালোভাবে বিদায় করে দিই।" কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না করা নবী হিসেবে তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না।

আলাদা হয়ে যাবার পর বাহ্যত এটাই মনে হয়, মু'মিনের মাতার তালিকা থেকে তাঁর নাম কাটা যেতো এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর বিবাহ আর হারাম থাকতো না। কারণ তিনি দুনিয়া এবং তার সাজসজ্জার জন্যই তো রাসূলে করীমের ﷺ থেকে আলাদা হতেন এবং এর অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর একথা সুস্পষ্ট যে, অন্য কারো সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলে তাঁর এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো না। অন্যদিকে আয়াতে এটিও একটি উদ্দেশ্য মনে হয়, নবী করীমের ﷺ যে সকল স্ত্রী আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন তাঁদেরকে তালাক দেবার ইখতিয়ার নবীর আর থাকেনি। কারণ তাখঈরের দু'টি দিক ছিল। এক, দুনিয়াকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। দুই, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করলে তোমাদের আলাদা করে দেয়া হবে না। এখন একথা সুস্পষ্ট, এ দু'টি দিকের মধ্য থেকে যে কোনো একটি দিকই কোনো মাহিমান্বিতা মহিলা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় দিকটি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো।

ইসলামী ফিকহে "তাখঈর" আসলে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ স্বামী এর মাধ্যমে স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, সে চাইলে তার স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজহিহাদের মাধ্যমে ফকীহগণ যে বিধান বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ-

১. এ ক্ষমতা একবার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার পর স্বামী আর তা ফেরত নিতে পাবে না এবং স্ত্রীকে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেও পারে না। তবে স্ত্রীর জন্য তা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে যায় না। সে চাইলে স্বামীর সাথে থাকতে সম্মত হতে পারে, চাইলে আলাদা হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করতে পারে এবং চাইলে কোনো কিছুর ঘোষণা না দিয়ে এ ক্ষমতাকে এমনিই নষ্ট হয়ে যাবার সুযোগ দিতে পারে।

২. এ ক্ষমতাটি স্ত্রীর দিকে স্থানান্তরিত হবার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত স্বামী কর্তৃক তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তালাকের ইখতিয়ার দান করা চাই, অথবা তালাকের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় না বললেও এ ইখতিয়ার দেবার নিয়ত তার থাকা চাই। যেমন, সে যদি বলে, "তোমার ইখতিয়ার আছে" বা "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে আছে," তাহলে এ ধরনের ইংগিতধর্মী কথার ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত ছাড়া তালাকের ইখতিয়ার স্ত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হবে না। যদি স্ত্রী এর দাবী করে এবং স্বামী হলফ সহকারে বিবৃতি দেয় যে, এর মাধ্যমে তালাকের ইখতিয়ার সোপর্দ করার উদ্দেশ্য তার ছিল না তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। তবে স্ত্রী যদি এ মর্মে সাক্ষী হাজির করে যে, "অবনিবনা ঝগড়া বিবাদের পরিবেশে বা তালাকের কথাবার্তা চলার সময় একথা বলা হয়েছিল, তাহলে তখন তার দাবী বিবেচিত হবে। কারণ এ প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার দেবার অর্থ এটাই বুঝা যাবে যে, স্বামীর তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত ছিল।

দ্বিতীয়ত স্ত্রীর জানতে হবে যে, তাকে এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার কাছে এ খবর পৌঁছুতে হবে এবং যদি সে উপস্থিত থাকে, তাহলে

এ শব্দগুলো তার শুনতে হবে। যতক্ষণ সে নিজ কানে শুনবে না অথবা তার কাছে খবর পৌঁছুবে না ততক্ষণ ইখতিয়ার তার কাছে স্থানান্তরিত হবে না।

৩. যদি স্বামী কোনো সময় নির্ধারণ করা ছাড়াই শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দান করে, তাহলে স্ত্রী কতক্ষণ পর্যন্ত এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পাওয়া যায় একটি দল বলেন যে, বৈঠকে স্বামী একথা বললেই স্ত্রী তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। যদি সে কোনো জবাব না দিয়ে সেখান থেকে উঠে যায় অথবা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা একথাই প্রমাণ করে যে, সে জবাব দিতে চায় না, তাহলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ মত পোষণ করেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাবের ইবনে যায়েদ, আতা (র), মুজাহিদ (র), শা'বী (র) ইবরাহীম নাখঈ (র), ইমাম মালেক (র) ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আওযায়ী (র), সুফিয়ান সওরী (র) ও আবু সওর (র)। দ্বিতীয় দলগনের মতে, তার ইখতিয়ার ঐ বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তারপরও সে এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। এ মত পোষণ করেন হাসান বসরী (র), কাতাদাহ ও যুহরী।

৪. স্বামী যদি সময় নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, সে যদি বলে, এক মাস বা এক বছর পর্যন্ত তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম অথবা এ সময় পর্যন্ত তোমার বিষয় তোমার হাতে রইলো, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে এ ইখতিয়ার ভোগ করবে। তবে যদি সে বলে, তুমি যখন চাও এ ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারো, তাহলে এ অবস্থায় তার ইখতিয়ার হবে সীমাহীন।

৫. স্ত্রী যদি আলাদা হতে চায়, তাহলে তাকে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দাবলির মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। অস্পষ্ট শব্দাবলি, যার মাধ্যমে বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না, তা দ্বারা ইখতিয়ার প্রয়োগ কার্যকর হতে পারে না।

৬. আইনত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেবার জন্য তিনটি বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

- সে বলবে, "তোমার ব্যাপারটি তোমার হাতে রয়েছে।"
- সে বলবে, "তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে।"
- সে বলবে,"যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম।" এর মধ্যে প্রত্যেকটির আইনগত ফলাফল হবে ভিন্ন রকমের। যেমন-

- "তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে" এ শব্দগুলো যদি স্বামী বলে থাকে এবং স্ত্রী এর জবাবে এমন কোনো স্পষ্ট কথা বলে যা থেকে বুঝা যায় যে, সে আলাদা হয়ে গেছে, তাহলে হানাফী মতে এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরপর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর উভয়ে

আবার চাইলে পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে। আর যদি স্বামী বলে থাকে, "এক তালাক পর্যন্ত তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে," তাহলে এ অবস্থায় একটি 'রজঈ' তালাক অনুষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।) কিন্তু স্বামী যদি বিষয়টি স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করতে গিয়ে তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে অথবা একথা সুস্পষ্ট করে বলে থাকে, তাহলে সে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের ওপর তিন তালাক আরোপ করুক অথবা কেবলমাত্র একবার বলুক আমি আলাদা হয়ে গেলাম বা নিজেকে তালাক দিলাম, এ অবস্থার স্ত্রীর ইখতিয়ার তালাকের সমার্থক হবে।

- "তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম" শব্দগুলোর সাথে যদি স্বামী স্ত্রীকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে, তাহলে হানাফীদের মতে স্বামীর তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত থাকলেও একটি বায়েন তালাকই অনুষ্ঠিত হবে। তবে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর তালাকের ইখতিয়ারের মাধ্যমে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈর (র) মতে, যদি স্বামী ইখতিয়ার দেবার সময় তালাকের নিয়ত করে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়, তাহলে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। ইমাম মালেকের (র) মতে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হবে আর যদি সহবাস না করে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামী এক তালাকের নিয়তের দাবী করলে তা মেনে নেয়া হবে।
- "যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম" একথা বলার পর যদি স্ত্রী তালাকের ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাহলে বায়েন নয়; বরং একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে।

৭. যদি স্বামীর পক্ষ থেকে আলাদা হবার ইখতিয়ার দেবার পর স্ত্রী তার স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য নিজের সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে কোনো তালাক সংঘটিত হবে না। এ মত পোষণ করেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন। মাসরূক আয়েশাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং তাঁরা রসূলুল্লাহরই সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন। একে কি তালাক বলে গণ্য করা হয়?" এ ব্যাপারে একমাত্র আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যায়েদ ইবনে সাবেতের রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ উভয় মনীষীর অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁরাও এ ক্ষেত্রে কোনো তালাক সংঘটিত হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

পর্দা ও নারীর মর্যাদা রক্ষায় নবীর স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশাবলি

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا . وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ
رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيْرًا . وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
لَطِيْفًا خَبِيْرًا.

অর্থ : হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কোনো সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পরপুরুষের সাথে) কথা বলার সময় এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার (কুপ্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে- সে লালায়িত হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাথমিক অজ্ঞতা যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করবে। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ তোমাদের অপবিত্রতা থেকে দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখতে চান। আর তোমাদের বাড়িতে আল্লাহর সে আয়াতসমূহ ও জ্ঞানের কথা যা পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব : আয়াত : ৩২-৩৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পর্দা সংক্রান্ত বিধানের সূচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ সংশোধনীগুলো প্রবর্তন করা। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যখন নবী ﷺ-এর গৃহ থেকে এ পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিম গৃহের মহিলারা আপনা আপনিই এর অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এ গৃহটিই তাদের জন্য আদর্শ ছিল। এ আয়াতগুলোতে নবী ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন। এর মধ্যে কোনটি এমন যা শুধুমাত্র নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি মুসলমান নারীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়? কেবলমাত্র নবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ জীবন যাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরাই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারতো? যদি এ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে গৃহ

কোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহেলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং ভিন্ন পুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে কোনো ন্যায়সংগত যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও" এ বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া এবং ভিন্ন পুরুষদের সাথে খুব ঢলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত; বরং এ কথাটা কিছুটা এমনি ধরনের যেমন এক ভদ্রলোক নিজের সন্তানদেরকে বলে, "তোমরা বাজারের ছেলে মেয়েদের মত নও। তোমাদের গালাগালি না করা উচিত।" এ থেকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও বক্তা এ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে না যে, সে কেবলমাত্র নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য গালি দেয়াকে খারাপ মনে করে, অন্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে তার কোনো আপত্তি নেই।

প্রয়োজন হলে কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধা নেই কিন্তু এ সময় নারীর কথা বলার ভংগী ও ধরন এমন হতে হবে যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কখনো এ ধরনের কোনো চিন্তার উদয় না হয় যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে। তার বলার ভংগীতে কোনো নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোনো মনমাতানো ভাব থাকবে না। সে সজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোনো নারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহ ভীতি ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে। অন্যকথায় বলা যায়, এটা দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া নারীদের কথা বলার ধরন মু'মিন ও মুত্তাকী নারীদের নয়। এই সাথে সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটিও সামনে রাখা দরকার

(وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)

(আর তারা যেন যমীনের ওপর এমনভাবে পদাঘাত করে না চলে যার ফলে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের গোচরীভূত হয়।)

এ থেকে মনে হয় বিশ্ব-জাহানের রবের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অলংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষদেরকে না শোনায় এবং যদি প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে পূর্ণ সতর্কতা সহকারে বলতে হবে। এ জন্য নারীদের আযান দেয়া নিষেধ। তাছাড়া জামায়াতের নামাযে যদি কোনো নারী হাজির থাকে এবং ইমাম কোনো ভুল করেন তাহলে পুরুষের মতো তার সুবহানাল্লাহ বলার অনুমতি নেই, তার কেবলমাত্র হাতের ওপর হাত মেরে আওয়াজ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে দীন নারীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলার অনুমতি দেয় না এবং পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতেও তাদেরকে নিষেধ করে, সে কি কখনো নারীর মঞ্চে এসে নাচগান করা, বাজনা বাজানো ও রঙ্গরস করা পছন্দ করতে পারে? সে কি রেডিও-টেলিভিশনে নারীদের প্রেমের গান গেয়ে এবং সুমিষ্ট স্বরে অশ্লীল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি দিতে পারে? নারীরা নাটকে কখনো কারো স্ত্রীর এবং কখনো কারো প্রেমিকার অভিনয় করবে, এটাকে কি সে বৈধ করতে পারে? অথবা তাদেরক বিমানবালা (Air-hostess) করা হবে এবং বিশেষভাবে যাত্রীদের মন ভোলাবার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কিংবা ক্লাবে, সামাজিক উৎসবে ও নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠানে তারা চমকপ্রদ সাজ-সজ্জা করে আসবে এবং পুরুষদের সাথে অবাধে মিলেমিশে কথাবার্তা ও ঠাট্টা-তামাসা করবে, এসবকে কি সে বৈধ বলবে? এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন কুরআন থেকে? আল্লাহর নাযিল করা কুরআন তো সবার সামনে আছে। সেখানে কোথাও যদি এ সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে সেখানটা চিহ্নিত করা হোক।

দুই নারীদের স্বাভাবিক অবস্থান হবে তাদের গৃহে।

সূরা আহযাবের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে-

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

অর্থ : তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং প্রাচীন জাহেলীয়াতের নারীদের মত সাজগোজ করে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না।

এ আয়াতে মূলত নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিগত পার্থক্য সার্বিক সামর্থ ও জন্মগত কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব ক্ষেত্র বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নারীগণ তাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন ব্যাপদেশে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। এর অর্থ এ নয় যে, কোনো অবস্থাতেই তারা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। সঙ্গত কারণে শরয়ী প্রয়োজনে তারা বাইরেও বের হতে পারবে। তবে বের হওয়াটা অবশ্যই শালীনতা ও শরয়ী পর্দা সহকারে হতে হবে। যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগের মহিলাদের ন্যায় শরীরটাকে সাজগোজ করে আকর্ষণীয়রূপে বের না হয়। আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে– বলা হয়েছে-

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى অর্থাৎ পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে পরিপাটি হয়ে বেরুবে না। পরপুরুষদের সামনে রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। একথারই সামনে আরেকটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ 'সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" নারীগণ প্রয়োজনের তাগিদে বাড়ি থেকে বেরুবে, তবে যেন দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বের হয়। যেন বোরকা বা সমস্ত শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে এ সূরার ৬০ আয়াতে- বলা হয়েছে-

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের

উপর টেনে দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে টেনে দেয়ার নির্দেশনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে চেহারার উপরে নেকাব পরার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নেকাব ছাড়া শুধু বোরকা ও বড় চাদর ব্যবহার যথার্থ হতে পারে কিভাবে? বস্তুত নারী দেহের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ তো তাদের চেহারাতে ফুটে উটে। পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের কার্যকর ব্যবস্থা করা। যাবতীয় অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও যৌন অনাচার থেকে নারী সমাজের হেফাযত করা। আর এসবের সূচনা হয়ে থাকে সাধারণত নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে। আর এ আকর্ষণ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান নারী অঙ্গ হলো তাদের চেহারা। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রেখে বোরকা বা বড় চাদর পরিধান করা পর্দার উদ্দেশ্য সাধনের কতটুকু সহায়ক হতে পারে?

আয়াতে কুরআনীতে নারীদের সেজেগুঁজে আকর্ষণীয় রূপ পরিগ্রহ করে ঘরের বাইরে গিয়ে প্রদর্শনী করাকে আল্লাহর ভাষায় الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ প্রাচীন জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসের ভাষায় এসব নারীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তাদের অবস্থা হলো

كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ

অর্থাৎ পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে; রূপ-সৌন্দর্য ও সাজগোজ করে তারা পর-পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষিত করবে, আর ওরা নিজেরাও পর-পুরুষের প্রতি থাকবে আকর্ষিতা হয়ে। আল কুরআন একে 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' বলায় যা বুঝা যায় তাহলো :

❖ আখেরী নবীর নবুওয়াতপূর্ব সময়ে তা ছিল নারী সমাজের বেহায়াপনার চিত্র ও পশুত্বের বহিঃপ্রকাশ। যা ইসলামী শিক্ষার ফলে ইসলামী সমাজ থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তাই আল কুরআনের আহ্বান হলো মুসলিম নারী সমাজ যেন অনাগত কালেও ইসলামের এ তাহযীব- তমদ্দুন সমাজে জারি রাখে, আর পূর্বের সেই জাহেলী সংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন রোধে সোচ্চার থাকে।

❖ আল কুরআনের প্রাচীন জাহেলিয়াত অথবা প্রাথমিক জাহেলিয়াত বলার মধ্যে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই যুগের জাহেলিয়াত পরবর্তী কোনো এক যুগে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আজকের সমাজে নারী-প্রগতি ও নারী ক্ষমতায়নের নামে যে রকমের জাহেলিয়াত বিরাজ করছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করলে আল কুরআনের সেই শাশ্বত বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

❖ আজকের সমাজে মানবতা বর্জিত বল্গাহারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে 'প্রগতি' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর ইসলামের শাশ্বত বিধান ও চিরসুন্দর ব্যবস্থাকে চিত্রায়িত করা হচ্ছে সেকেলে, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, ইত্যাদি বিশ্লেষণে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলামী সংস্কৃতিই যে মানবজাতির জন্য উন্নতি, প্রগতি ও চিরকল্যাণের গ্যারান্টি- সর্বকালের সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করার একমাত্র ব্যবস্থা, যা বিশ্বস্রষ্টা তথা মানব স্রষ্টার অমোঘ বিধান। যার বিপরীতে

মানবরচিত ও মানব প্রচলিত যে কোনো রীতি প্রথাই উন্নতি ও প্রগতি পরিপন্থী; এটা নতুন আংগিকে নতুন খোলসে নতুন নামে নতুন সমাজে যতবার যতভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থে আখেরী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী জীবন বিধান ইসলামী রীতিনীতি ছাড়া বাকি সকল ব্যবস্থাই প্রগতি পরিপন্থী।

❖ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى বা 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' বলে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার জাহেলিয়াত খতম হয়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কারণ ইসলামপূর্ব সকল ব্যবস্থাই স্থায়ী হওয়ার অযোগ্য বলে প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়েছে। যদিও যুগে যুগে মুনাফিকরা আর ইসলাম বিদ্বেষীরা তাকে বুকে ধরে রেখে সেই জাহেলিয়াত প্রতিষ্ঠার মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর আর তার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম। আল কুরআনের ঘোষণা :

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

অর্থ : "সত্য সমাগত অসত্য বিতাড়িত, আর অসত্য তো স্থায়ী হবার অযোগ্যই বটে।"

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ অবিস্মরণীয় আয়াত প্রাচীন জাহেলী বা আদিম মূর্খ যামানার কদর্য ও ঘৃণিত রীতিনীতির দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলেছে, বাইরে বের হওয়ার সময় সাজগোজ করার অভ্যাসটি জাহেলিয়াতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এটা অনুসরণ আধুনিক জাহেলিয়াতের উপর আরও এক কদম এগিয়ে গেছে এবং তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি সব প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকেই গৃহীত।

❖ বস্তুত জাহেলিয়াত (মূর্খতা-অজ্ঞতা) কোনো একটি নির্দিষ্ট যামানার বৈশিষ্ট্য নয় যে তা একটি নির্দিষ্ট কালে বা কোনো এক নির্দিষ্ট দেশে থাকবে। আসলে এ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা, এর পেছনে জীবনের এক নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা সক্রিয় রয়েছে। হতে পারে এ অবস্থা আবারও আসবে, এ চিন্তা আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে। পূর্বের জাহেলিয়াত তখন নব্য জাহেলিয়াতের জন্য দিশারী হিসেবে কাজ করবে– তা যখন যেভাবে এবং যেখানেই হোক না কেন।

❖ আধুনিক বিশ্বের প্রতি তাকালে দেখা যায় মানুষ এখন এক অন্ধ জাহেলিয়াতের দিকে এগিয়ে চলছে। যা ভালমন্দ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, যা স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্থুল অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলছে। যার চিন্তাধারার মধ্যে পাশবিকবৃত্তিই অধিক ক্রিয়াশীল। এটি মানব জাতিকে মানবতাবোধ থেকে সরিয়ে নিয়ে হীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য বদ্ধপরিকর। (ফী যিলালিল কুরআন)

নির্দিষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নারী-পুরুষের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও পুরস্কার

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ রোযাদার নারী, স্বীয় লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও স্বীয় লজ্জাস্থান হিফাযতকারিণী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারিণী নারী- এদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আদম সন্তান পুরুষ ও নারী-দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত। মানব বংশ সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য এতদোভয়ের সৃষ্টি, উভয়ের দৈহিক মানসিক গঠন পার্থক্য এবং তদানুযায়ী উভয়ের মধ্যে কর্মবণ্টন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি রহস্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকবিশেষ। আল্লাহ্ তায়ালার এ বিধানের পরিবর্তন-পদক্ষেপ তাঁর সৃষ্টি রহস্যের স্বাভাবিক নীতি বা প্রাকৃতিক বিধান ধ্বংস করারই নামান্তর। এ জাতীয় পদক্ষেপ মানব জাতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বা পরিণামের দিক থেকে কখনো কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি– আর তা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও বিভ্রান্ত মানব বংশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এমনি কর্মকাণ্ডের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সদাতৎপর। অথচ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোনো মনোভাবই তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে দেখা যায় না। ফলে এরা গোটা মানব জাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে চলছে অহরহ। নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন ও ফলপ্রসূ পর্যালোচনা করে প্রকৃত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো মনোভাবের উদ্রেক হচ্ছে না তাদের। ফলে তারা ধাবিত হচ্ছে মানব জীবনের সার্বিক বিপর্যয়ের পথে; আর রুদ্ধ করে দিচ্ছে মানজাতির প্রকৃত কল্যাণের রাজতোরণ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে নারীদের সান্তনা ও স্বস্তি প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎকার্যাবলি, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া বা নারী হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (মাআরেফুল কুরআন)

এসব আয়াতে নারীদের স্মরণ করানো হয়েছে যে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং ইসলামের নির্দেশসমূহ পালন করার মাধ্যমে নারীদেরকে পুরুষদের সাথে সমানভাবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর সকল অধিকার ও সুযোগ রয়েছে।

মুসলিম জাতি সত্তার বিশাল প্রাসাদটি গড়ে উঠার মত ভিত্তির জন্য যেসব গুণাবলির প্রয়োজন, এ আয়াতে ওসব গুণাবলির বহু মূল্যবান নির্দেশিকা বর্ণিত হয়েছে। আর সেসব গুণাবলি হলো, ইসলাম, ঈমান, আনুগত, সত্যবাদীতা, সবর, বিনয়-নম্রতা, দানশীলতা, সিয়াম সাধনা, চরিত্রের হেফাযত এবং আল্লাহ্ তায়ালার বেশি বেশি স্মরণ। এসব কটি গুণই আল্লাহতে আত্মসর্পণকারী মুসলিম জাতি সত্তার বিশাল প্রাসাদের এক একটি মূল্যবান ইট। পুরুষ নারী নির্বিশেষে উক্ত গুণাবলির অধিকারী সকল মুসলিমের জনই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে এসব গুণাবলিতে সুসজ্জিত সকল পুরুষ-নারীর স্ব স্ব ভূমিকা পালন উন্নতির সোপানরূপে কার্যকরী হতে পারে।

আয়াতে উল্লিখিত গুণাবলি সম্পর্কিত প্রতিটি পরিভাষাই আজকের মুসলিম সমাজে অহরহ ব্যবহৃত হতে দেখা গেলেও এসবের যথার্থরূপ ও এসবের প্রকৃত ধারণা না থাকায় মুসলিম নর-নারীর মাঝে এসবের প্রভাব পড়তে দেখা যায় না–ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভও সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং আজকের মুসলিম উম্মার জন্য বর্ণিত গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচিতিমূলক আলোচনা দরকার বলে মনে করি।

মুসলিম : অর্থাৎ যারা নিজেদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এখন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এ বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে। অন্য কথায়, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোনো রকমের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র নেই; বরং তারা তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ অবলম্বন করেছে।

ঈমান ও আনুগত্য : অর্থাৎ যাদের এ আনুগত্য নিছক বাহ্যিক নয়, গত্যন্তর নেই, মন চায় না তবুও করছি, এমন নয়; বরং মন থেকেই তারা ইসলামের নেতৃত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। চিন্তা ও কর্মের যে পথ কুরআন ও মুহাম্মাদ ﷺ দেখিয়েছেন সেটিই সোজা ও সঠিক পথ এবং তারই অনুসরণের মধ্যে আমাদের সাফল্য নিহিত, এটিই তাদের ঈমান। যে জিনিসকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভুল বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মতেও সেটি নিশ্চিতই ভুল। আর যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মন-মস্তিষ্কও তাকেই সত্য বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের চিন্তা ও মানসিক অবস্থা এমন নয় যে, কুরআন ও সুন্নাত থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হয় তাকে তারা অসংগত মনে করতে পারে এবং এ চিন্তার বেড়াজালে এমনভাবে আটকে যেতে পারে যে, কোনো প্রকারে তাকে পরিবর্তিত করে নিজেদের মন মাফিক করে নেবে

অথবা দুনিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাকে ঢালাইও করে নেবে আবার এ অভিযোগও নিজেদের মাথায় নেবে না যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম কাটছাঁট করে নিয়েছি। হাদীসে নবী ﷺ ঈমানের সঠিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

ذَاقَ طَعَمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِا الْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا "ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার রব, ইসলামকে তার দীন এবং মুহাম্মাদকে তার নবী বলে মেনে নিতে রাজি হয়ে গেছে।" (মুসলিম : ২৬২৩)

অন্য একটি হাদীসে তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, "তোমাদের কোনো ব্যক্তি মু'মিন হয় না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অনুগত হয়ে যায়।"(শারহুস সুন্নাহ)

সত্যবাদিতা : অর্থাৎ নিজেদের কথায় যেমন সত্য তেমনি ব্যবহারিক কার্যকলাপেও সত্য। মিথ্যা, প্রতারণা, অসৎ উদ্দেশ্য, ঠগবৃত্তি ও ছলনা তাদের জীবনে পাওয়া যায় না। তাদের বিবেক যা সত্য বলে জানে মুখে তারা তাই উচ্চারণ করে। তাদের মতে যে কাজ ঈমানদারীর সাথে সত্য ও সততা অনুযায়ী হয় সে কাজই তারা করে। যার সাথেই তারা কোনো কাজ করে বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথে করে।

সবর বা ধৈর্য : অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত সোজা সত্য পথে চলার এবং আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যে বাধাই আসে, যে বিপদই দেখা দেয়, যে কষ্টই সহ্য করতে হয় এবং যে সমস্ত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, দৃঢ়ভাবে তারা তার মোকাবিলা করে। কোনো প্রকার ভীতি, লোভ ও প্রবৃত্তির কামনার কোনো দাবী তাদেরকে সোজা পথ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

বিনয়-নম্রতা : অর্থাৎ তারা দম্ভ, অহংকার ও আত্মম্ভরীতামুক্ত। তারা এ সত্যের পূর্ণ সচেতন অনুভূতি রাখে যে, তারা বান্দা এবং বন্দেগীর বাইরে তাদের কোনো মর্যাদা নেই। তাই তাদের দেহ ও অন্তরাত্মা উভয়ই আল্লাহর সামনে নত থাকে। আল্লাহ ভীতি তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আত্মঅহমিকায় মত্ত আল্লাহভীতি শূন্য লোকদের থেকে যে ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হয় এমন কোনো মনোভাব কখনো তাদের থেকে প্রকাশিত হয় না। আয়াতের বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে এ সাধারণ আল্লাহভীতি মূলক মনোভাবের সাথে বিশেষ ভাবে "খুশু" বা বিনত হওয়া শব্দ ব্যবহার করায় এর অর্থ হয় নামায। কারণ এরপরই সাদকাহ ও রোযার কথা বলা হয়েছে।

দানশীলতা : এর অর্থ কেবল ফরয যাকাত আদায় করাই নয়; বরং সাধারণ দান-খয়রাতও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে তারা কসুর করে না। কোনো এতিম, রুগ্ন, বিপদাপন্ন, দুর্বল, অক্ষম, গরীব ও অভাবী ব্যক্তি তাদের লোকালয়ে তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। আর আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হলে তার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা কখনো কার্পণ্য করে না।

সাওম : ফরয ও নফল উভয় ধরনের রোযা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। রোযাদার বা সিয়াম সাধনাকারী নারী-পুরুষকে তার সিয়াম পালন আত্ম নিয়ন্ত্রণের শক্তি পয়দা করে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে এনে দেয়। সে বা তারা সিয়ামের মাধ্যমে বৈধ ভোগবস্তু পরিত্যাগ করার সেই কষ্টসাধ্য কাজটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। এ মহান গুণটির প্রধানতম তাৎপর্য হচ্ছে মানব দেহের চাহিদার উপর মনের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ লাভ, জীবনের প্রধান প্রধান চাহিদাকে নিজের আয়ত্বে আনার শক্তি অর্জন, ইচ্ছা শক্তিকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবতাকে পাশববৃত্তির উপর বিজয়ী করা। মানুষের দেহ ও রূহের সমন্বিত শক্তি সিয়াম পালনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সিয়াম পালন আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ফলেমানুষের প্রধান অংশ বা উপাদান 'রূহ' বিশুদ্ধতা লাভে ধন্য হতে পারে। এ ব্যাপারেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো তারতম্য নেই।

লজ্জাস্থানের হেফাযত : এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে, তারা যিনা থেকে দূরে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা উলংগতাকে এড়িয়ে চলে। এই সাথে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র মানুষের পোশাক না পরে উলংগ হয়ে থাকাকে উলংগতা বলে না; বরং এমন ধরনের পোশাক পরাও উলংগতার অন্তর্ভুক্ত, যা এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, তার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় অথবা এমন চোস্ত ও আটসাঁট হয় যার ফলে তার সাহায্যে দৈহিক কাঠামো ও দেহের উঁচু-নীচু অংগ সবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল্লাহকে অধিক স্মরণ : আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোনো কথা বললে বা কোনো কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে "বিসমিল্লাহ" বলে শুরু করবে। আহার শেষ করবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তার রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তার দিকে মুখ ফিরাবে। কোনো খারাপ কাজের সুযোগ এল তাঁকে ভয় করবে। কোনো ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোটকথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন এ জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ। অন্য যে কোনো ইবাদাতের জন্য কোনো না

কোনো সময় নির্ধারিত থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারী থাকে এবং এটিই আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগীর সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে। মানুষের মন কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয়; বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার কণ্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকলেই এরি মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দীনী কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ইবাদাত ও দীনী কাজ ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে জীবন আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্মরণ শূন্য থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দীনী কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণ এ বেঁচে থাকে। একথাটিই নবী ﷺ একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"মু'আয ইবনে আনাস জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করবে। আবার তিনি একই ভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জাবাবে নবী করীম ﷺ বলেন, "যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর দরবারে কোন গুণাবলিকে আসল মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হয় এ আয়াতে তা বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ। একটি বাক্যে নারীর মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কাজের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে উভয় দলের কর্ম ক্ষেত্রে আলাদা। পুরুষদের জীবনের কিছু বিভাগে কাজ করতে হয়। নারীদের কাজ করতে হয় ভিন্ন কিছু বিভাগে। কিন্তু এ গুণাবলি যদি উভয়ের মধ্যে সমান থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে উভয়ের মর্যাদা সমান এবং উভয়ের প্রতিদানও সমান হবে। একজন রান্নাঘর ও গৃহস্থালী সামলালো এবং অন্যজন খেলাফতের মসনদে বসে শরীয়তের বিধান জারী করলো আবার একজন গৃহে সন্তান লালন-পালন করলো এবং অন্যজন যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আল্লাহ তাঁর দীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলেন এ জন্যে উভয়ের মর্যাদা ও প্রতিদানে কোনো পার্থক্য দেখা দেবে না।

আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত এলে তা নারী পুরুষের জন্য অবশ্য পালনীয়

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যয়নবের সাথে নবী -এর বিবাহ প্রসঙ্গে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল এখান থেকেই তা শুরু হচ্ছে।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরামাহ ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়েছিল যখন নবী যায়েদের জন্য যয়নবের সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন এবং যয়নব ও তার আত্মীয়রা তা নামঞ্জুর করেছিলেন। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, নবী যখন এ পয়গাম দেন তখন যয়নব বলেন, "আমি অভিজাত কুরাইশ পরিবারের মেয়ে, তাই আমি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।" তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশও এ ধরনের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এর কারণ ছিল এই যে, যায়েদ নবী -এর আযাদ করা গোলাম ছিলেন এবং যয়নব ছিলেন তাঁর ফুফু (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব)-এর কন্যা। এত উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাও আবার যাতা পরিবার নয়, নবীর নিজের ফুফাত বোন এবং তার বিয়ের পয়গাম তিনি দিচ্ছিলেন নিজের আযাদ করা গোলামের সাথে একথা তাদের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। এজন্য এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত শুনতেই যয়নব ও তাঁর পরিবারের সবাই নির্দ্বিধায় আনুগত্যের শির নত করেন। এরপর নবী তাদের বিয়ে পড়ান। তিনি নিজে যায়েদের পক্ষ থেকে ১০ দীনার ও ৬০ দিরহাম মোহরানা আদায় করেন, কনের কাপড় চোপড় দেন এবং কিছু খাবার দাবারের জিনিসপত্র পাঠান।

এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ সময়ে নাযিল হয় কিন্তু এর মধ্যে যে হুকুম বর্ণনা করা হয় তা ইসলামী আইনের একটি বড় মূলনীতি এবং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। এর দৃষ্টিতে যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার কোনো অধিকার নেই। মুসলমান হবার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে নিজের স্বাধীন ইখতিয়ার বিসর্জন দেয়া। কোনো ব্যক্তি বা জাতি মুসলমানও হবে আবার নিজের জন্য এ ইখতিয়ারটিও সংরক্ষিত রাখবে। এ দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী-এ দুটি কাজ এক

সাথে হতে পারে না। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দু'টি দৃষ্টিভংগীকে একত্র করার ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আনুগত্যের শির নত করতে হবে। আর যে মুসলমান নয়। যদি সে না মানে তাহলে নিজেকে মুসলমান বলে যত জোরে গলা ফটিয়ে চিৎকার করুক না কেন আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে মুনাফিকই গণ্য হবে।

রাসূল ﷺ কর্তৃক যয়নবকে বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কারের অপনোদন

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا.

অর্থ : আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।" লোকের ভয়ে আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর উচিত ছিল। তারপর যায়িদ যখন জায়নাবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মু'মিনদের কোনো সমস্যা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (আহযাব : আয়াত-৩৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এখান থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়বস্তু এমন সময় নাযিল হয় যখন নবী ﷺ যয়নবকে (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একে ভিত্তি করে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা রাসূলের বিরুদ্ধে তুমূল অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। এ আয়াত গুলো অধ্যায়ন করার সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যে শত্রুরা নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেই দুর্নাম রটাবার এবং নিজেদের অন্তরজ্বালা মিটাবার জন্য মিথ্যা, অপবাদ, গালমন্দ ও নিন্দাবাদের অভিযান চালাচ্ছিল তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলো বলা হয়নি; বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ অভিযানের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষ করা এবং ছড়ানো সন্দেহ-সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখা। একথা স্পষ্ট, আল্লাহর কালাম অস্বীকারকারীদেরকে নিশ্চিন্ত করতে পারতো না। এ কালাম যদি কাউকে নিশ্চিন্ত করতে পারতো, তাহলে তারা হচ্ছে এমন সব লোক যারা একে আল্লাহর কালাম বলে জানতো এবং সে হিসেবে একে মেনে চলতো। শত্রুদের আপত্তি কোনোভাবে তাদের মনেও সন্দেহ-সংশয় এবং তাদের মস্তিষ্কেরও জটিলতা ও সংকট সৃষ্টিতে সক্ষম না হয়ে পড়ে, সম্ভাব্য সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন

অন্যদিকে মুসলমানদেরকেও এবং স্বয়ং নবী ﷺ কেও এ ধরনের অবস্থায় তাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা জানিয়ে দিয়েছেন।

এটা সে সময়ের কথা যখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যয়নবের রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি বারবার অভিযোগ করার পর শেষ পর্যন্ত নবী ﷺ এর কাছে নিবেদন করেন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা যদিও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু নিজের মন থেকে এ অনুভূতিটি তিনি কখনো মুছে ফেলতে পারেননি যে, যায়েদ একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাদের নিজোদের পরিবারের অনুগ্রহে লালিত এবং তিনি নিজে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের একজন নিম্নমানের লোকের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অনুভূতির কারণে দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো যায়েদকে নিজের সমকক্ষ ভাবেননি। এ কারণে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। এক বছরের কিছু বেশি দিন অতিবাহিত হতে না হতেই অবস্থা তালাক দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

কেউ কেউ এ বাক্যটির উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছেন এভাবে, নবী ﷺ নিজেই যয়নবকে রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর মন চাচ্ছিল যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিক। কিন্তু যখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন, আমি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তখন তিনি নাউযুবিল্লাহ আসল কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে কেবলমাত্র মুখেই তাকে নিষেধ করলেন। একথায় আল্লাহ বলছেন, তুমি মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রাখছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। অথচ আসল ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যদি এ সূরার ১,২,৩,ও ৭ আয়াতের সাথে এ বাক্যটি মিলিয়ে পড় হয়, তাহলে পরিষ্কার অনুভূত হবে যে, যায়েদ ও তার স্ত্রীর মধ্যে যে সময় তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল সে সময়ই আল্লাহ নবী ﷺ কে এ মর্মে ইংগিত দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে তখন তোমাকে তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আরবের সে সমাজে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার অর্থ কী তা নবী ﷺ জানতেন এবং তাও এমন এক অবস্থায় যখন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান ছাড়া বাকি সমগ্র আরব দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ধনুকভাঙাপণ করে বসেছিল- এ অবস্থায় তিনি এ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইতঃস্তত করছিলেন। এ কারণে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন স্ত্রীকে তালাক দেবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। তার উদ্দেশ্য ছিল, যায়েদ যদি তালাক না দেন, তাহলে তিনি এ বিপদের মুখোমুখী হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। নয়তো যায়েদ তালাক দিলেই তাকে হুকুম পালন করতে হবে এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় ও অপপ্রচারের ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকার যে উচ্চমর্যাদার আসনে দেখতে চাচ্ছিলেন সে দৃষ্টিতে নবী করীমের ﷺ ইচ্ছা করে যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখ নিম্নমানের কাজ বিবেচিত হয়। তিনি আসলে ভাবছিলেন যে, এর ফলে তিনি

এমন কাজ করা থেকে বেঁচে যাবেন যাতে তাঁর দুর্নামের আশঙ্কা ছিল। অথচ আল্লাহ একটি বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে দিয়ে সে কাজটি করাতে চাচ্ছিলেন। "তুমি লোক ভয় করছ অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিকতর সংগত"- এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাই বলেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা আপনার স্ত্রী মধ্যে শামিল হতে যাচ্ছেন। কিন্তু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এসে তাঁর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রী ত্যাগ করো না। এ কথায় আল্লাহ বলেলেন, আমি তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি তোমাকে যয়নবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি অথচ তুমি যায়েদের সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ যেকথা প্রকাশ করতে চান তা গোপন করছিলে।

(ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

আল্লামা আলূসীও তাফসীর রুহুল মা'আনীতে এর একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটি হচ্ছে শ্রেয়তর কাজ পরিত্যাগ করার জন্য ক্রোধ প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ থাকতেন অথবা যায়েদকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তুমি যা চাও করতে পারো, এ অবস্থায় এটিই ছিল শ্রেয়তর। অভিব্যক্তি ক্রোধের সারৎসার হচ্ছে তুমি কেন যায়েদকে বললে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না? অথচ আমি তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যয়নব তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবে।"

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তার ইদ্দত পুরা হয়ে গেলো। প্রয়োজন পূর্ণ করলো শব্দগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, তাঁর কাছে যায়েদের আর কোনো প্রয়োজন থাকলো না। কেবলমাত্র তালাক দিলেই এ অবস্থাটির সৃষ্টি হয় না। কারণ স্বামীর আর কোনো আকর্ষণ থেকে গেলে ইদ্দতের মাঝখানে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার কথা জানতে পারার মধ্যেও স্বামীর প্রয়োজন থেকে যায়। তাই যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায় একমাত্র তখনই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

আল্লাহ এ কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এমন একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য করিয়েছিলেন যা এ পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনোভাবে সম্পাদিত হতে পারতো না। আরবে পালক পুত্রদের সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যাপারে যে সমস্ত ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর রাসূল নিজে অগ্রসর হয়ে না ভাঙলে সেগুলো ভেঙে ফেলার ও উচ্ছেদ করার আর কোনো পথ ছিল না। কাজেই আল্লাহ নিছক নবীর গৃহে আর একজন স্ত্রী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এ বিয়ে করিয়েছিলেন।

পালক পুত্রের স্ত্রী প্রকৃত পুত্রবধূ নয়

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

অর্থ : মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব : আয়াত-৪০)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : বিরোধীরা নবী ﷺ-এর এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠাচ্ছিল এ একটি বাক্যের মাধ্যমে সেসবের মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে।

তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন, অথচ তাঁর নিজের শরীয়াতেও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুত্রই ছিলেন না, কাজেই তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন? তোমরা নিজেরাই জানো মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদতে কোনো পুত্র সন্তানই নেই। তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, ঠিক আছে, পালক পুত্র যদি আসল পুত্র না হয়ে থাকে তাহলেও তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা বড় জোর বৈধই হতে পারতো কিন্তু তাকে বিয়ে করার এমন কী প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে বলা হয়েছে, "কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল।" অর্থাৎ রাসূল হবার কারণে তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছিল যে তোমাদের রসম রেওআজ যে হালাল জিনিসটিকে অযথা হারাম গণ্য করে রেখেছে সে ব্যাপারে সকল রকমের স্বার্থপ্রীতির তিনি অবসান ঘটিয়ে দেবেন এবং তার হালাল হাবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই রাখবে না।

আবার অতিরিক্ত তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে, "এবং তিনি শেষ নবী।" অর্থাৎ যদি কোনো আইন ও সামাজিক সংস্কার তাঁর আমলে প্রবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরে আর কোনো রাসূল তো দূরের কথা কোনো নবীই আসবেন না। কাজেই তিনি নিজেই জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করে যাবেন, এটা আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এরপর আরো বেশি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ প্রত্যেটি বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন, এ সময় মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করা কেন জরুরি ছিল এবং এমনটি না করলে কী মহা অনর্থ হতো। তিনি জানেন, এখন আর তাঁর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসবেন না, কাজেই নিজের শেষ নবীর মাধ্যমে এখন যদি তিনি এ রসমটিকে উৎখাত না করেন তাহলে এমন দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই যিনি এটি ভঙ্গ করলে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্য থেকে চিরকালেন জন্য এটি মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। পরবর্তী সংস্কারকগণ যদি এটি ভাঙেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে আরো কর্মও তাঁর ইন্তিকালের পরে এমন কোনো বিশ্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না যার ফলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের লোকেরা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কারো ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নিজের মধ্যে এমন কোনো পবিত্রতার বাহন হবে না যার ফলে তাঁর কোনো কাজ নিছক তাঁর সুন্নাত হবার কারণে মানুষের মন থেকে অপছন্দনীয়তার সকল প্রকার ধারণার মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে।

মুমিন-নারী-পুরুষকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি

وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : আর অপরাধবিহীন মু'মিনাহ নারীকে যারা কষ্ট দেয় তারা তো বহন করে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৮)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে কোনো মুসলিম পুরুষ অথবা নারীকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ দেয়ার চরম পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। মদীনায় এক শ্রেণির লোকেরা মুসলিম নর-নারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অপবাদ আরোপ করতো যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নর-নারীগণ করতেন না। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও অপবাদ রটাতো দেখা যায়। বিবৃত ও গর্হিত রুচীর মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের এমন ধরনের দুরভিসন্ধির কবলে পড়ে মুসলিম নারী-পুরুষ সর্বত্রই হেস্তনেস্ত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জবাব দেন এবং তাদের অপবাদ খণ্ডন করেন।

(ফী যিলালিল কুরআন)

মুনাফিকদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের এ হচ্ছে এক জঘন্যতম আচরণ। মদীনার ঐসব মুনাফিকদের অন্তরে সার্বক্ষণিক জ্বালা এই ছিল যে, মুসলিম নারী-পুরুষের নৈতিক মান অন্য সকল জাতির তুলনায় ছিল মহান ও সুউচ্চ। আর এতে করে ইসলামের দাওয়াতের প্রভাব ছিল প্রচুর এবং এর ফলাফল প্রমাণিত হচ্ছিলো ব্যাপকতরভাবে। তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে মুসলিম নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাতে আরম্ভ করলো। এভাবে মুসলিম জাহানের নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত ভেঙে দিতে পারলেই ওদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে প্রচারিত ইফকের ঘটনাটিও উদ্দেশ্যেই সাজানো হয়েছিল। এখানে তাদের এহেন মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি ও করুণ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এখনো যদি তারা এহেন অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তাহলে এর পরিণতি তারা স্বচক্ষে দেখতে হবে। (তাদাব্বুরে কুরআন)

মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সকল মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই প্রকারের কষ্ট পেতেন। তাদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুই প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করতো এবং কখনো কখনো দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করতো। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন। তাদের দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল, তারা সর্বাদা মিথ্যা খবর রটনা করতো। যেমন তারা বলে বেড়াতো এক্ষণে অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। প্রথম প্রকারের নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র ফুটিয়ে

তোলা। কারণ মুনাফিকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্যক্ত করারসাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের মধ্যে প্রয়োজন বশত একটি পার্থক্য ও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মুহরিম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য ঘরের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ, প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এজন্যে তাকে প্রয়োজনে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখাবয়ব ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও তা বার বার হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা, তাদের জন্য কঠিন নয়। তাই স্বাধীন নারীদের জন্য নির্দেশ রয়েছে তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখাবয়বের সামনে ঝুলিয়ে নেয়। যাতে পর-পুরুষের দৃষ্টিতে মুখাবয়ব না পড়ে। বলা হয়েছে

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।

(মাআরেফুল কুরআন)

মুসলিম নারীদের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাওয়ার বিধান

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়; এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে তারা লাঞ্ছিতা হবে না।আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৯)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : নারী-পুরুষের মাঝে, কর্মবণ্টন অনুযায়ী নারীগণের প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার। পরিবারিক কার্যাবলি সম্পাদন বাড়ির অভ্যন্তরে হলেও কখনও প্রয়োজনে বাড়ির বাইরেও তাদেরযাতায়াত আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। মুসলিম নারীগণ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কার্যক্রমে বাড়ীর বাইরে যেতে কুরআন ও হাদীস নিষেধ করে নি। তবে তারা বের হবে পর্দা করে শালীনতা সহকারে। এ বিষয়ে সূরা আল আহযাবের ৩৩ আয়াতে এ মহিলাদের জন্য সাধারণ ঘরে পারিবারিক বিষয়াদিকেই প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে ঘরের বাইরে তাদের বিচরণ কীরূপ হবে সে বিষয়েও সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর স্ত্রী-কন্যা ও মুসলিম মহিলাদের প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে যাওয়া সময় সমস্ত শরীর, মাথা ও বুকের খোলা অংশ আচ্ছাদিত করার আদেশ দেন। সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনকারী একটা জিলবাব বা বড় চাদর দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে নিতে হবে। এ পোশাক তাদেরকে অন্যান্য নারীদের মধ্য থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিবে আর দুষ্কৃতকারী ও বখাটে লোকদের উত্যক্তি থেকে রক্ষা করবে। কেননা মহিলাদেরকে উত্যক্তকারী বখাটেরা আপাদমস্তক আবৃত মহিলাদেরকে দেখলে তাদেরকে দীনদগার পরহেজগার নারী হিসেবে চিনতে পেরে লজ্জা ও সংকোচবোধ করে এবং সংযত আচরণ করে। সূরা আল আহযাবের আলোচ্য ৫৯ নং আয়াতটিতে 'জিলবাব' পরিধানের নির্দেশ লক্ষ্যণীয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, মদীনার কিছু পাপাচারী বখাটে লোক রাতের আঁধার নেমে এলেই মদীনার অলিগলিতে বেরিয়ে পড়তো এবং মেয়েদের খোঁজ করতো। মদীনা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। তাই রাত হলে মহিলারা প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে বাইরে বেরিয়ে যেতো, আর পাপচারী বখাটেরা এ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। তবে কোনো মহিলাকে চাদর দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত দেখলে তারা বলতো এতো 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা'। কাজেই যারা বড় চাদর দিয়ে না ঢেকেই বেরিয়েছে, তখন তারা বলতো, এতো দাসী-বাঁদী বা নিম্নস্তরের মহিলা। এই বলেই তারা মহিলার উপর আক্রমণ চালাতো।

মুজাহিদ বলেছেন, 'জিলবাব' বা বড় চাদর পরিধানের আদেশ দেয়া হয়েছে এজন্যে, যেন বুঝা যায় তারা স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। ফলে কোনো অপরাধপ্রবণ লোক তাদের কোনোভাবে উত্যক্ত করতে চেষ্টা করবে না। আর 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু'– একথার অর্থ হলো অজ্ঞতাবশত জাহেলী যুগে যেসব অন্যায় হয়ে গেছে, তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আরবের সামাজিক পরিবেশকে পবিত্র করার জন্য যে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ফেতনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধ জারি করা হচ্ছিল এবং যাবতীয় বিশৃংখলা ও দুর্নীতিকে সংকীর্ণতম গণ্ডীতে সীমিত করার জন্য যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছিল এসব কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গোটা মুসলিম সমাজের উপর ইসলামী নিয়ম-বিধি ও ঐতিহ্যের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা। (ফী-যিলালিল কুরআন)

"চিনে নেয়া যায়" এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রাভ্রান্ত পরিবারের পূত-পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোনো অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "না কষ্ট দেয়া হয়" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে একবার একথাটি অনুবাধন করার চেষ্টা করুন যে, কুরআনের এ হুকুম এবং এ হুকুমের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন তা ইসলামী সমাজ বিধানের কোন ধরনের প্রাণ শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে। ইতিপূর্বে সূরা নূরের ৩১ আয়াতে এ নির্দেশ আলোচিত হয়েছে যে; মহিলারা তাদের সাজসজ্জা অমুক অমুক ধরনের পুরুষ ও নারীদের ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করবে না। "আর মাটির ওপর পা দাপিয়ে চলবে না, যাতে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে লোকেরা যেন তা জেনে না ফেলে"। এ হুকুমের সাথে যদি সূরা আহযাবের এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়া হয় তাহলে পরিষ্কার জানা যায় যে, এখানে চাদর দিয়ে ঢাকার যে হুকুম এসেছে অপরিচিতদের থেকে সৌন্দর্য লুকানোই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন চাদরটি হবে সাদামাটা। নয়তো একটি উন্নত নকশাদার ও দৃষ্টিনন্দন কাপড় জড়িয়ে নিলে তো উলটো এ উদ্দেশ্য আরো খতম হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ কেবল চাদর জড়িয়ে সৌন্দর্য ঢেকে রাখার হুকুম দিচ্ছেন না; বরং একথাও বলছেন যে, মহিলারা যেন চাদরের একটি অংশ নিজেদের ওপর লটকে দেয়। কোনো বিচক্ষণ বিবেকবান ব্যক্তি এ উক্তিটির এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ করতে পারেন না যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘোমটা দেয়া যাতে শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য ঢাকার সাথে সাথে চেহারাও ঢাকা পড়বে। তারপর আল্লাহ নিজেই এ হুকুমটির 'ইল্লাত' (কার্যকারণ) এ বর্ণনা করেছেন যে, এটি এমন একটি সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি যা থেকে মুসলমান মহিলাদেরকে চিনে নেয়া যাবে এবং তারা উত্যক্ত হবার হাত থেকেও বেচে যাবে। এ থেকে আপনা-আপনিই একথা প্রকাশ হয়ে যায় যে, এ নিদের্শ এমন সব মহিলাকে দেয়া হচ্ছে যারা পুরুষদের হাতে উত্যক্ত হবার এবং তাদের দৃষ্টিতে পড়ার ও তাদের কামনা-লালসার বস্তুতে পরিণত হবার ফলে আনন্দ অনুভব করার পরিবর্তে একে নিজেদের জন্য কষ্টদায়ক লাঞ্ছনাকর মনে করে, যারা সমাজে নিজেদেরকে বে-আবরু মক্ষিরাণী ধরনের মহিলাদের মধ্যে গণ্য করাতে চায় না; বরং সতী-সাধ্বী গৃহ প্রদীপ হিসেবে পরিচিত হতে চায় এ ধরনের শরীফ ও পূত চরিত্রের অধিকারিণী সৎকর্মশীলা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যদি সত্যিই তোমরা এভাবে নিজেদেরকে পরিচিত করাতে চাও এবং পুরুষদের যৌন লালসার দৃষ্টি সত্যিই তোমাদের জন্য আনন্দাদায়ক না হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য তোমরা খুব ভালোভাবে সাজসজ্জা করে বাসর রাতের কনে সেজে ঘর থেকে বের হয়ো না এবং দর্শকদের লালসার দৃষ্টির সামনে নিজেদের সৌন্দর্যকে উজ্জল করে তুলে ধরোনা। কেননা এটা এর উপযোগী পদ্ধতি নয়; বরং এ জন্য সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি এই হতে পারে যে, তোমরা একটি সাদামাটা চাদরে নিজেদের সমস্ত সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা ঢেকে বের হবে, চেহারা ঘোমটার আড়ালে রাখবে এবং এমনভাবে চলবে যাতে অলংকারের রিনিঝিনি আওয়াজ লোকদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে না। বাইরে বের হবার আগে যেসব মেয়ে সাজগোজ করে নিজেদেরকে তৈরি করে এবং ততক্ষণ ঘরের বাইরে পা রাখে না যতক্ষণ অপরূপ সাজে নিজেদেরকে সজ্জিতা না করে

নেয়, তাদের এর উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা সারা দুনিয়ার পুরুষদের জন্য নিজেদেরকে দৃষ্টিনন্দন করতে চায় এবং তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। এরপর যদি তারা বলে, দর্শকদের ভ্রূভংগী তাদেরকে কষ্ট দেয়, এরপর যদি তাদের দাবী হয় তারা "সমাজের মক্ষিরাণী" এবং "সর্বজনপ্রিয় মহিলা" হিসেবে নিজেদেরকে চিত্রিত করতে চায় না; বরং পূত-পবিত্রা গৃহিণী হয়েই থাকতে চায়, তাহলে এটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের কথা তার নিয়ত নির্ধারণ করে না; বরং কাজের মাধ্যমেই তার আসল নিয়ত প্রকাশ করে। কাজেই যে নারী আকর্ষনীয়া হয়ে পর পুরুষের সামনে যায়, তার এ কাজটির পেছনে কোন ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করছে সেটা ঐ কাজ দ্বারাই প্রকাশ পায়। কাজেই এসব মহিলাদের থেকে যা আশা করা যেতে পারে ফিতনাবাজ লোকেরা তাদের থেকে তাই আশা করে থাকে। কুরআন মহিলাদেরকে বলে, তোমরা একই সঙ্গে "গৃহপ্রদীপ" ও "সমাজের মক্ষিরাণী" হতে পারো না। গৃহপ্রদীপ হতে চাইলে সমাজের মক্ষিরাণী হবার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা পরিহার করো এবং এমন জীবনধারা অবলম্বন করো যা গৃহপ্রদীপ হতে সাহায্য করতে পারে।

১৬. সূরা আশ শূরা (سُوْرَةُ الشُّوْرٰى)

আয়াত : ৫৩ রুকু : ৫ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

৩৮ নং আয়াতের 'শূরা' শব্দকেই এই সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়ঃ

নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময় কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি সূরা 'হা-মীম সাজদাহ' নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে। কারণ, এ সূরাটিকে সূরা হা-মীম আস সাজদার এক রকম সম্পূরক বলে মনে হয়। যে ব্যক্তিই মনোযোগ সহকারে প্রথমে সূরা হা-মীম আস সাজদা পড়বে এবং তারপর এ সূরা পাঠ করবে সে-ই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে : তোমরা আমার নবীর পেশকৃত বক্তব্য শুনে এ কেমন আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? কোনো ব্যক্তির কাছে অহী আসা এবং তাকে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দেয়া কোনো নতুন বা অদ্ভুত কথা নয় কিংবা কোনো অগ্রহণযোগ্য ঘটনায় নয় যে, ইতিহাসে এই বারই সর্বপ্রথম এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে আল্লাহ্ নবী-রাসূলদের কাছে এ রকম দিক নির্দেশনা দিয়ে একের পর এক অনুরূপ অহী পাঠিয়েছেন। আসমান ও যমীনের অধিকর্তাকে উপাস্য ও শাসক মেনে নেয়া অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। তাঁর বান্দা হয়ে, তাঁর আল্লাহর অধীনে বাস করে অন্য কারো প্রভু মেনে নেয়াটাই বরং অদ্ভুত ও অভিনব ব্যাপার। তোমরা তাওহীদ পেশকারীর প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছো। অথচ বিশ্ব জাহানের মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তো এমন মহা অপরাধ যে আকাশ যদি তাতে ভেঙে পড়ে তাও অসম্ভব নয়। তোমাদের এই ধৃষ্টতা দেখে ফেরেশতারাও অবাক। তারা এই ভেবে সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত যে না জানি কখন তোমাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে!

এরপর মানুষকে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে নিয়োজিত করা এবং সেই ব্যক্তির নিজেকে নবী বলে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর সৃষ্টির ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেই দাবী নিয়েই সে মাঠে নেমেছে। সবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্ নিজের হাতেই রেখেছেন। নবী এসেছেন শুধু গাফিলদের সাবধান এবং পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। তাঁর কথা অমান্যকারীদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া এবং তাদেরকে আযাব দেয়া বা না দেয়া আল্লাহর নিজের কাজ। নবীকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই তোমাদের সমাজের কথাকথিত ধর্মীয় নেতা ও পীর ফকীররা যে

ধরনের দাবী করে অর্থাৎ যে তাদের কথা মানবে না, কিংবা তাদের সাথে বে-আদবী করে তারা তাকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নবী এ ধরনের কোনো দাবী নিয়ে এসেছেন বলে মনে করে থাকলে সে ভ্রান্ত ধারণা মন-মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলো। এ প্রসঙ্গে মানুষকে একথাও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অমঙ্গল কামনার জন্য আসেননি; বরং তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমদের নিজেদের ধ্বংস রয়েছে, তিনি শুধু এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করছেন।

অতঃপর আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে সুপথগামী করে কেন সৃষ্টি করেননি এবং মতানৈক্যের এই সুযোগ কেন রেখেছেন, যে কারণে মানুষ চিন্তা ও কর্মের যে কোনো উল্টা বা সোজা পথে চলতে থাকে, এ বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এ জিনিসের বদৌলতেই মানুষ যাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করতে পারে সে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ইখতিয়ার বিহীন অন্যান্য সৃষ্টিকূলের জন্য এ সুযোগ নেই। এ সুযোগ আছে শুধু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী সৃষ্টি কূলের জন্য যারা প্রকৃতিগতভাবে নয়; বরং জ্ঞানগতভাবে বুঝে শুনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে। যে মানুষ এই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেন এবং সৎ কাজের তাওফীক দান করে তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ভুল পন্থায় ব্যবহার করে যারা প্রকৃত অভিভাবক নয় এবং হতেও পারে না তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা এই রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের ও গোটা সৃষ্টিকূলের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। অন্যরা না প্রকৃত অভিভাবক, না আছে তাদের প্রকৃত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা। মানুষ তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজের অভিভাবক নির্বাচনে ভুল করবে না এবং যে প্রকৃতই অভিভাবক তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ওপরই তার সফলতা নির্ভর করে।

তারপর মুহাম্মাদ ﷺ যে দীন পেশ করছেন তা প্রকৃতপক্ষে কী সে বিষয় বলা হয়েছে :

সেই দীনের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ যেহেতু বিশ্ব জাহান ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রকৃত অভিভাবক তাই মানুষের শাসনকর্তাও তিনি। মানুষকে দীন ও শরীয়ত (বিশ্বাস ও কর্মের আদর্শ) দান করা এবং মানুষের মধ্যোকার মতানৈক্য ও মতদ্বৈধতার ফায়সালা করে কোনটি হক এবং কোনটি নাহক তা বলে আল্লাহর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন সত্তার মানুষের জন্য আইনদাতা ও রচয়িতা হওয়ার আদৌ কোনো অধিকার নেই। অন্য কথায় প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বের মত আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্বও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া মানুষ বা অন্য কোনো সত্তা এই সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর এই সার্বভৌমত্ব না মানে তাহলে তার আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব মানা অর্থহীন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য প্রথম থেকেই একটি দীন নির্ধারিত করেছেন। সে দীন ছিল একটিই। প্রত্যেক যুগে সমস্ত

নবী-রসূলকে ঐ দীনটিই দেয়া হতো। কোনো নবীই স্বতন্ত্র কোনো ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রথম দিন হতে ঐ দীনটিই নির্ধারিত হয়ে এসেছে এবং সমস্ত নবী-রসূল ছিলেন সেই দীনেরই অনুসারী ও আন্দোলনকারী।

শুধু মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্য সে দীন পাঠানো হয়নি; বরং পৃথিবীতে সেই দীনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত থাকবে এবং যমীনে আল্লাহর দীন ছাড়া অন্যদের রচিত দীন যেন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সবসময় এ উদ্দেশ্যেই তা পাঠানো হয়েছে। শুধু এ দীনের তাবলীগের জন্য নবী-রাসূলগণ আদিষ্ট ছিলেন না; বরং কায়েম করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। এটিই ছিল মানব জাতির মূল দীন। কিন্তু নবী-রাসূলদের পরবর্তী যুগে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা আত্মপ্রীতি, স্বেচ্ছাচার এবং আত্মম্ভরিতার কারণে স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে নতুন নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম দেখা যায় তার সবই ঐ একমাত্র দীনকে বিকৃত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তিনি যেন বহুবিধ পথ, কৃত্রিম ধর্মসমূহ এবং মানুষের রচিত দীনের পরিবর্তে সেই আসল দীন মানুষের সামনে পেশ করেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তোমরা যদি আরো বিগড়ে যাও এবং সংঘাতের জন্য তৎপর হয়ে ওঠো তাহলে সেটা তোমাদের অজ্ঞতা। তোমাদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে নবী তাঁর কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেবেন না। তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনার ভূমিকায় অটল থাকেন এবং যে কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পাদন করেন। যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং জাহেলী রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা ইতোপূর্বে আল্লাহর দীনকে বিকৃত করা হয়েছে তিনি তোমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দীনের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করবেন তোমরা তাঁর কাছে এ প্রত্যাশা করো না।

আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন ও আইন গ্রহণ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে কত বড় ধৃষ্টতা সে অনুভূতি তোমাদের নেই। নিজেদের দৃষ্টিতে তোমরা একে দুনিয়ার সাধারণ ব্যাপার মনে করছো। তোমরা এতে কোনো দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা জঘন্যতম শিরক এবং চরমতম অপরাধ। সেই সব লোককে এই শিরক ও অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের দীন চালু করেছে এবং তাদের দীনের অনুসরণ ও আনুগত্য করেছে।

এভাবে দীনের একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার পথে নিয়ে আসার জন্য যেসব উত্তম পন্থা সম্ভব ছিল তা কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদের

কাছে প্রকৃত সত্য পেশ করছে। অপর দিকে মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সংগী-সাথীদের জীবন তোমাদের সামনে বর্তমান, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাবের দিক নির্দেশনায় কেমন মানুষ তৈরি হয়। এভাবেও যদি তোমরা হিদায়াত লাভ করতে না পার তাহলে দুনিয়ার আর কোনো জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম নয়। কাজেই এখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যে গোমরাহীতে ডুবে আছো তার মধ্যেই ডুবে থাকো এবং এ রকম পথভ্রষ্টদের জন্য আল্লাহর কাছে যে পরিণতি নির্ধারিত আছে সেই পরিণতির মুখোমুখি হও।

এসব সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষেপে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়েছে, দুনিয়া পূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখেরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফেরদের সেই সব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে যা তাদের আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মূল কারণ ছিল। তার পর বক্তব্যের সমাপ্তি পর্যায়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে :

১. মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর কিতাব কী-এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং ঈমান ও ঈমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন। তারপর হঠাৎ এ দুটি জিনিস নিয়ে তিনি, মানুষের সামনে এলেন। এটা তাঁর নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. তাঁর পেশকৃত শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথাবার্তা বলার দাবীদার। আল্লাহর এই শিক্ষা অন্য সব নবী-রাসূলদের মত তাঁকেও তিনটি উপায়ে দেয়া হয়েছে। এক- অহী, দুই- পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া এবং তিন- ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যাতে বিরোধীরা এ অপবাদ আরোপ করতে না পারে যে, নবী ﷺ আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথা বলার দাবী করছেন। সাথে সাথে ন্যায়বাদী মানুষেরা যেন জানতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মানুষটিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কোন কোন উপায় ও পন্থায় দিক নিদের্শনা দেয়া হয়।

কন্যা সন্তান, পুত্রসন্তান, নিঃসন্তান সব আল্লাহর ইচ্ছাধীন

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

অর্থ : যমীন ও আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সবকিছু করতে সক্ষম। (সূরা আশ শূরাঃ আয়াত-৪৯-৫০)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যারা কুফর ও শিরকের নির্বুদ্ধিতায় ডুবে আছে তারা যদি বুঝানোর পরও না মানতে চায় না মানুক, সত্য যথা স্থানে সত্যই। যমীন ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার তথাকথিত বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও নেতাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কোনো নবী, অলী দেবী বা দেবতার তাতে কোনো অংশ নেই, আল্লাহ একাই তার মালিক। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী না নিজের শক্তিতে বিজয়ী হতে পারে, না সেই সব সত্তার কেউ এসে তাকে রক্ষা করতে পারে যাদেরকে মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে আল্লাহর ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহের মালিক মনে করে বসে আছে।

এটা আল্লাহর বাদশাহীর নিরংকুশ(Aboslute) হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোনো মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেওয়ানো তাতো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোনো ওষুধ, কোনো চিকিৎসা এবং কোনো তাবীজ কবজ দ্বারা সন্তান ওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ যাকে শুধু পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোনোভাবেই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায় । এসব দেখে শুনেও যদি কেউ আল্লাহর প্রভুত্বে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে সেটা তার নিজের অদূরদর্শিতা যার পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোনো কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যের সামান্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।

১৭. সূরা হুজরাত (سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ)

আয়াত : ১৮ রুকু : ২ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার ৪ নং আয়াতের 'আল হুজরাত' শব্দ নিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

বিভিন্ন রেওয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন উপলক্ষে এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। আলোচ্য বিষয়ে মিল থাকায় সবক'টি একটি সূরার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আরো বোঝা যায় যে, মাদানী যুগের শেষভাগেই এর বেশির ভাগ হুকুম নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া যা তাদের ঈমানদারসূলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে যেসব আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোনো কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়, যদি কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোনো খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোনো তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দুটি দল যদি কোনো সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কী হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যে গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনতিও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতঃপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা, এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব

অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, 'সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত করা হয়েছে পারস্পারিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোনো বৈধ ভিত্তি নেই।'

সবশেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়; বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যকার মু'মিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোনো মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান, হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

কাউকে মন্দ নামে ডাকা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবৈধ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! কোনো একদল পুরুষ যেন অপর পুরুষদের ঠাট্টা না করে, হতে পারে যে তারা এদের চেয়ে ভালো। কোনো এক দল মহিলাও যেন অপর মহিলাদেরকে ঠাট্টা না করে, হতে পারে তারা এদের চেয়ে ভালো। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে খারাপ নাম নিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা জঘন্য কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে ফিরে না আসে তারাই যালিম। (সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদর পারস্পরিক লড়াই জরুরি নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরেকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে

অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদিসসমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন-বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এ ক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানীর অভিযোগ পেশ করে নিজের মার্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ চালানোর অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওপর আক্রমণ করা হয়, জনসমক্ষে তার কোনো সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ অপমান করার যদি কোনো শরীয়াতসম্মত বৈধতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

বিদ্রূপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়; বরং কারো কোনো কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোনো ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তর্ভুক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনোভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ্য না বানায়। কারণ, এ ধরনের হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরের অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষনীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রূপের লক্ষ্য বানানো এবং নারীদের পুরুষদের হাসি-তামাসার লক্ষ্য বানানো জায়েয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করে না। যেখানে নারী অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত একজন আরেকজনকে হাসি তামাসার লক্ষ্য বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী পুরুষ কোনো মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজের একটি মজলিসে পুরুষ কোনো নারীকে উপহাস ও বিদ্রূপ করবে কিংবা নারী কোনো পুরুষকে বিদ্রূপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্যও মনে করা হয়নি।

মূল আয়াতে لَمْزٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রূপ ও কুৎস ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমন- উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ

বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইংগিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষায় চমৎকারিত্ব এই যে, لَا يَلْمِزْ بَعْضُكَ بَعْضًا একে অপরকে বিদ্রূপ করো না।) বলার পরিবর্তে لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ (নিজেকে নিজে বিদ্রূপ করো না)। কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই একথা ইংগিত পাওয়া যায় যে, অন্যদের বিদ্রুপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রূপ ও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ না করো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদের ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষস্থল বানিয়েছে সে-ও পাল্টা তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে।

এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিকে এমন নামে ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা-বাপের অথবা বংশের কোনো দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া। মুসলমান হওয়ার পর তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মের কারণে ইহুদী বা খ্রিস্টান বলা। কোনো ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠির এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান। তবে যেসব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা কারো নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়; রবং ঐ উপাধি দ্বারা যাদের সম্বোধন করা হয় তা তাদের পরিচয়ের সহায়ক এমন সব উপাধি এ নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" (হাদীসের রাবীদের পরিচয় মূলক) শাস্ত্রে সুলায়মান আল আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) এর মত নামের উল্লেখ রেখেছেন। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোনো উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে। যেমন-আবদুল্লাহ নামের যদি কয়েকজন লোক থাকে আর তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনা সুবিধানর জন্য আপনি অন্ধ আবদুল্লাহ বলতে পারেন। অনুরূপ এমন সব উপাধী বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যত অমর্যাদা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালবাসা ও স্নেহবশতই রাখা হয় এবং যাদেরকে এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে। যেমন- আবু হুরাইরা এবং আবু তুরাব।

ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে কটুভাষী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কোনো কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা কিংবা বেছে বেছে বিদ্রুপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষ্যত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাত বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তাহলে তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

একজন পুরুষ ও নারী থেকে মানব সৃষ্টি জাতি ও গোত্র বিভক্তি পরিচিতি মাত্র। মানব মর্যাদার মূল ভিত্তি তাকওয়া।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পদনির্দেশের প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে সেসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এখন এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে একটি বিরাট গোমরাহীর সংশোধন করা হচ্ছে যা আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপেক্ষা করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপন জন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোনো যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি; বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। কোথাও এর ভিত্তি একই খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠিতে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও একই ভৌগলিক এলাকায় কিংবা এক বিশেষ বর্ণ অথবা একটি বিশেষ ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। তাছাড়া এসব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আপন ও পরের বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ মানদণ্ডে যাদেরকে আপন বলে মনে করা হয়েছে পরের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এ বিভেদনীতি ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও

অবমাননা এবং যুলুম ও নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সমর্থনে দর্শন রচনা করা হয়েছে। মতও বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়েছে। আইন তৈরি করা হয়েছে। নৈতিক নীতিমালা রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র এটিকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তবে অনুসরণ করেছে। এর ভিত্তিতেই ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানে পর্যন্ত অইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যাদা ইসরাঈলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মনদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র ঠাওরানো হয়েছে এবং শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই; বরং আজ এ শতাব্দীতেই প্রতিটি মানুষ তার নিজ চোখে দেখতে পারে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইন্ডিয়ান জাতি গোষ্ঠির সাথে যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য কায়েম করে তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার গভীরেও এ ধ্যান-ধারণাই কার্যকর ছিল যে, নিজের দেশ ও জাতির গণ্ডির বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান-মাল ও সম্ভ্রম নষ্ট করা তাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে লুট করা, ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তারা জঘন্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই দেখা গিয়েছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানাদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা স্মরণ রাখলে যে কোনো ব্যক্তি অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গোমরাহী। এ গোমারাহীর সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন,

১. তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোনো ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছো। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোনো পবিত্র বা মূল্যবান

উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোনো অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদানের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছো। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।

২. মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারতো না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবন যাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভূখণ্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবী এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিন্যের দাবী করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত করেছিলেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রকৃতি যেসব জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায় বানিয়েছিল শুধু শয়তানী মূঢ়তা ও মূর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

৩. মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে তাহলে তা হচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা-মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির কোনো বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি-গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা-সাধনার কোনো দখল নেই।

একদিক দিয়ে কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর মর্যাদালাভের কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। এরূপ ব্যক্তি যে কোনো বংশ, যে কোনো জাতি এবং যে কোনো দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলির কারণে সম্মান ও মর্যদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থাই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে তাতে কিছু এসে যায় না।

এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেন,

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অংহকার দূরে করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক, নেক্কার ও পরহেজগার- যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দূরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায়, সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (বায়হাকী -ফী শুআবিল ঈমান, তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী ﷺ বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন,

"হে লোকজন! সাবধান! তোমাদের আল্লাহ একজন। কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের ও কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠতাব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।" (বায়হাকী)

একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।" (বাযাযার)।

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশি আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।" (ইবনে জারীর)।

আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছে- "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।"

(মুসলিম ও ইবনে মাজাহ)

এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম ঈমানদারদের একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে বর্ণ, বংশ ভাষা দেশ ও জাতীয়তার কোনো ভেদাভেদ নেই, যেখানে উচ্চ নীচ, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই এবং যে কোনো জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরীক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলামের বিরোধীদেরও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোনো ধর্ম ও আদর্শে কখনো তার কোনো নজির পরিলক্ষিত হয়নি। একমাত্র ইসলাম সেই আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মিলিয়ে একটি জাতি বানিয়ে দিয়েছে।

এ পর্যায়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করাও অত্যন্ত জরুরি। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে ইসলামী আইন 'কুফ্‌ু' বা 'সমবংশ' হওয়ার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করে, কিছু লোক তার অর্থ গ্রহণ করে এই যে, কিছুসংখ্যক জাতি গোষ্ঠী আছে কুলীন ও অভিজাত এবং কিছু সংখ্যক ইতর ও নীচ। তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী আইন অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের প্রত্যেক মুসলমান নারীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সফলতা স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'কুফ্‌ু' বা সমবংশ হওয়ার মূল লক্ষ্য এটিই। যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে অনেক বেশি দূরত্ব হবে সেখানে জীবনব্যাপী বিস্তৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বনিবনার আশা কমই করা যায়। তাই ইসলামী আইন এ রকম দাম্পত্য বন্ধনকে পছন্দ করে না। এখানে আশরাফ ও আতরাফের কোনো প্রশ্নই নেই; বরং উভয়ের অবস্থার মধ্যে যদি স্পষ্ট পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলির দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যদার মানুষ তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উচ্চ নীচের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়; বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলি আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলি সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

১৮. সূরা আল হাদীদ (سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ)

আয়াত : ২৯ রুকু : ৪ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার ২৫ নং আয়াতের 'হাদীদ' শব্দ থেকে এ নাম গৃহীত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ লোহা।

নাযিল হওয়ার সময়

সর্ব সম্মাত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না; বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐ সব লোকদের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বের জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(যারা ঈমান আনে আল্লাহর স্বরণে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নি?) সূরা হাদীদ : আয়াত-১৬

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তের সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয়; বরং

আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মোকাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোনো মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলবদ্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাব পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষমেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোনো অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময় আসে যখন যে, কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের মোকিবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দুটি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাত সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোনো পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও

আখেরাতে তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহ্‌লে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে, পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহ্‌র কথা শুনে যার হৃদয়ের বিগলিত হয় না এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহ্‌র নিকট 'সিদ্দিক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোনো রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোয়ার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা, এখাকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায় সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষ ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও বিপদ আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম আয়েশ ও সুখ-শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে উঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ডসহকারে তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতোপূর্বেও একের পর এক নবী রাসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে

গিয়েছে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মাত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে। এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাত আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তার আছে। এ হচ্ছে এ সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

কিয়ামত দিবসে ঈমানদার নারী-পুরুষের কাছে মুনাফিক নারী পুরুষরা নূর ভিক্ষা চাইবে

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰاكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنَافِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

অর্থ : যেদিন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে, তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে। (তাদেরকে বলা হবে) "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ।" জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝরনাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা। সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এই যে, তারা মু'মিনদের বলবে, আমাদের প্রতি একটু লক্ষ্য কর যাতে তোমাদের 'নূর' থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি। কিন্তু তাদের বলা হবে, পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের 'নূর' তালাশ কর। অতঃপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব। (সূরা হাদীদ : আয়াত : ১২-১৩)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই 'নূর' থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে, সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে। যেখানে আলো যেটুকু হবে তা

সৎ আকীদা-বিশ্বাস ও সৎ আমলের। ঈমানের সততা এবং সৎচরিত্র ও কর্মের পবিত্রতাই 'নূরে' রূপান্তরিত হবে যার কারণে সৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব ঝলমলিয়ে উঠবে। যার কর্ম যতটা উজ্জ্বল হবে তার ব্যক্তিসত্তার আলোক রশ্মিও তত বেশি তীব্র হবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবে তখন তার 'নূর' বা আলো তা আগে আগে ছুটতে থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে কাতাদা বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস। উক্ত হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কারো কারো 'নূর' এত তীব্র হবে যে, মদীনা থেকে "আদন"-এর সম পরিমাণ দূরত্ব পৌঁছতে থাকবে। তাছাড়া কারো 'নূর' পৌঁছবে মদীনা থেকে সান'আ পর্যন্ত কারো তার চেয়েও কম এমনকি এমন মুমিন থাকবে যার নূর তার পায়ের তলা থেকে সামনে যাবে না" (ইবনে জারীর) অন্য কথায় যার মাধ্যমে পৃথিবীর যত বেশি কল্যাণ হবে তার 'নূর' তত বেশি উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে তার কল্যাণ পৌঁছবে হাশরের ময়দানেও তার নূরের আলো ততটা দূরত্ব পর্যন্ত দৌড়াতে থাকবে।

এখানে একটি প্রশ্ন মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, নূর বা আলোক রশ্মির আগে আগে দৌড়ানোর ব্যাপারটি বোধগম্য হয়। কিন্তু শুধু ডান পাশে নূর দৌড়ানো অর্থ কী। তবে কি তাদের বাঁ দিকে অন্ধকার থাকবে। এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, কেউ যদি তার ডান হাতে আলো নিয়ে পথ চলতে থাকে তাহলে তার বাঁ দিকটাও কিন্তু আলোকিত হবে। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, আলো আছে তার ডান হাতে। আবু যার ও আবুদ দারদা কর্তৃক বর্ণিত নবী ﷺ-এর একটি হাদীস থেকে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নবী ﷺ বলছেন, "আমি সেখানে আমার উম্মতের নেককার লোকদের তাদের নূরের সাহায্যে চিনতে পারবো- যে নূর তাদের সামনে ডানেও বাঁয়ে দৌড়াতে থাকবে" (হাকেম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)।

মু'মিনগণ যখন জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখন আলো থাকবে তাদের সামনে আর মুনাফিকরা পেছনে অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। সে সময় তারা ঈমানাদারদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে। আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও যাতে আমরাও কিছু আলো পেতে পারি। কারণ এ মুনাফিরকরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের সাথে একই মুসলিম সমাজে বসবাস করতো।

জান্নাতবাসীগণ ঐ দরজা ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। দরজার এক দিকে থাকবে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আর অপরদিকে থাকবে জাহান্নামের আযাব। যে সীমারেখার জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে আড়াল হয়ে থাকবে মুনাফিকদের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

১৯. সূরা আল মুজাদালাহ (سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ)

আয়াত : ২২ রুকূ : ৩ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'তুজাদিলু' শব্দ থেকে নামটি চয়ন করা হয়েছে। 'মুজাদালাহ' অর্থ বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ।

নাযিল হওয়ার সময়

মদীনার খাজরায গোত্রের খাওলা বিনতে সালাবা নামক এক আনসার মহিলা সাহাবী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে 'যিহার' করার অভিযোগ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর সাথে তর্ক করছিলেন। ঐ 'যিহার' নামক কুপথা সম্পর্কে এ সূরার শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। এ ঘটনাটি থেকে এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় ঠিকভাবে জানা যায়।

এ সূরাটি যে খন্দক যুদ্ধের পর নাযিল হয় সে কথাও 'যিহার' সম্পর্কে দেওয়া বিধান থেকে বোঝা যায়। খন্দকের যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয়। তাতে এটুকু মন্তব্য করা হয়েছিল যে, যিহার দ্বারা স্ত্রী মা হয়ে যায় না। যিহার সম্পর্কে আল্লাহর কী হুকুম তা এ সূরায় নেই। এ সূরায় সে হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই নিশ্চিতভাবে জানা গেল, খন্দক যুদ্ধের পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। হিজরী পাঁচ সনের শাওয়ালে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সেসময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ সূরায় সেসব সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু থেকে ৬ নং আয়াত পর্যন্ত যিহারের শরয়ী হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। সে সাথে মুসলমানদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর জাহেলী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করা অথবা তা মেনে চলতে অস্বীকার করা অথবা তার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা মাফিক অন্য নিয়ম নীতি ও আইন কানুন তৈরি করে নেয়া ঈমানের চরম পরিপন্থী কাজ ও আচরণ। এর শাস্তি হচ্ছে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা। এ ব্যাপারে আখেরাতেও কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

৭ থেকে ১০ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা পরস্পর গোপন সলা পরামর্শ করে নানারূপ ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করতো। তাদের মনে যে গোপন হিংসা বিদ্বেষ ছিল তার কারণে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺকে ইহুদীদের মত এমন কায়দায় সালাম দিতো যা দ্বারা দোয়ার পরিবর্তে বদ দোয়া প্রকাশ পেতো। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এই বলে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের ঐ সলা পরামর্শ তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজেদের কাজ করতে থাক। সাথে সাথে তাদেরকে এই নৈতিক শিক্ষাও দেয়া

হয়েছে যে, গোনাহ জুলুম বাড়াবাড়ি এবং নাফরমানীর কাজে সলা পরামর্শ করা ঈমানদারদের কাজ নয়। তারা গোপনে বসে কোনো কিছু করলে তা নেকী ও পরহেজগারীর কাজ হওয়া উচিত।

১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু মজলিসী সভ্যতা ও বৈঠকী আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু সামাজিক দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা মানুষের মধ্যে আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কোনো মজলিসে যদি বহু সংখ্যক লোক বসে থাকে এমতাবস্থায় যদি বাইরে থেকে কিছুলোক আসে তাহলে মজলিসে পূর্ব থেকে বসে থাকা ব্যক্তিগণ নিজেরা কিছুটা গুটিয়ে বসে তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও রাজী হয় না। ফলে পরে আগমনকারীগণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা দহলিজে বসতে বাধ্য হয় অথবা ফিরে চলে যায় অথবা মজলিসে এখনো যথেষ্ট স্থান আছে দেখে উপস্থিত লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে আসেন। নবী ﷺ-এর মজলিসে প্রায়ই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হাদিয়াত বা নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মজলিসে আত্মস্বার্থ এবং সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিও না; বরং খোলা মনে পরবর্তী আগমনকারীদের জন্য স্থান করে দাও।

অনুরূপ আরো একটি ত্রুটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কেউ কারো কাছে গেলে বিশেষ করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলে জেঁকে বসে থাকে এবং এদিকে মোটেই লক্ষ্য করে না যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নেয়া তার কষ্টের কারণ হবে। তিনি যদি বলেন, জনাব এখন যান তাহলে সে খারাপ মনে করবে। তাকে ছেড়ে উঠে গেলে অভদ্র আচরণের অভিযোগ করবে। ইশারা ইংগিতে যদি বুঝাতে চান যে, অন্য কিছু জরুরি কাজের জন্য তার এখন কিছু সময় পাওয়া দরকার তাহলে শুনেও শুনবে না। নবী ﷺ নিজেও মানুষের এ আচরণের সম্মুখীন হতেন আর তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহর বান্দারা মোটেই খেয়াল করতেন না যে, তারা অতি মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কষ্টদায়ক বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, যখন বৈঠক শেষ করার জন্য উঠে যাওয়ার কথা বলা হবে তখন উঠে চলে যাবে।

মানুষের মধ্যে আরো একটি বদঅভ্যাস ছিল। তা হচ্ছে, কেউ হয়তো নবীর ﷺ সাথে অযথা নির্জনে কথা বলতে চাইতো অথবা বড় মজলিসে তাঁর নিকটে গিয়ে গোপনীয় কথা বলার ঢংয়ে কথা বলতে চাইতো। এটি নবীর ﷺ জন্য যেমন কষ্টদায়ক ছিল। তাই যে ব্যক্তিই নির্জনে একাকী তাঁর কথা বলতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কথা বলার আগে সাদকা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দিলেন। লোকজনকে তাদের এ বদঅভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। যাতে তারা এ বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

সুতরাং এ বাধ্যবাধকতা মাত্র অল্প দিন কার্যকর রাখা হয়েছিল। মানুষ তাদের কার্যধারা ও অভ্যাস সংশোধন করে নিলে এ নির্দেশ বাতিল করে দেয়া হলো।

মুসলিম সমাজের মানুষের মধ্যে নিঃস্বার্থ ঈমানদার, মুনাফিক এবং দোদুল্যমান তথা সিদ্ধান্তহীনতার রোগে আক্রান্ত মানুষ সবাই মিলে মিশে একাকার হয়েছিল। তাই কারো সত্যিকার ও নিঃস্বার্থ ঈমানদার হওয়ার মানদণ্ড কী তা ১৪ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তা স্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণির মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, সে যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করে নিজের স্বার্থের খাতিরে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম সন্দেহ-সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়। তবে যেহেতু তারা মুসলমানদের দলে অর্ন্তভুক্ত তাই ঈমান গ্রহণের মিথ্যা স্বীকৃতি তাদের জন্য ঢালের কাজ করে। আরেক শ্রেণির মুসলমান তাদের দীনের ব্যাপারে অন্য কারো পরোয়া করা তো দূরের কথা নিজের বাপ, ভাই, সন্তান-সন্ততি এবং গোষ্ঠীকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। তাদের অবস্থা হলো, যে আল্লাহ, রাসূল এবং তার দীনের শত্রু তার জন্য তার মনে কোনো ভালবাসা নেই। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন প্রথম শ্রেণির এই মুসলমানরা যতই শপথ করে তাদের মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা দিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের দলের লোক। সুতরাং শুধু দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানগণই আল্লাহর দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তারাই খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই লাভ করবে সফলতা।

যে নারীর অভিযোগ আল্লাহর কাছে পৌঁছেছে এবং গৃহীত হয়েছে

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ.

অর্থ : আল্লাহ অবশ্যই ঐ স্ত্রী লোকটির কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করছিল, আর আল্লাহর দরবারেও অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথা-বার্তা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (আল মুজাদালাহ : আয়াত-১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যে মহিলার ব্যাপার সম্পর্কে এ আয়াত ও তৎপরবর্তী ক'টি আয়াত নাযিল হয়েছিল তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের খাওলাহ্ বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল আওস ইবনে সামেত আনসারী। মহিলার স্বামী 'যিহার' করেছিলেন। 'জিহার' শব্দ 'জাহরুন' শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ পিঠ। তৎকালীন আরব সমাজে প্রায় এমন ঘটতো যে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদ হলে স্বামী রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলতো,

اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের তুল্য। একথার তাৎপর্য হলো, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য নিজের মায়ের সাথে সহবাস করার সমান। অর্থাৎ তুমি আমার জন্য হারাম।

অনুবাদকগণ সাধারণভাবে এ স্থানে অনুবাদ করেছেন, মহিলা ঝগড়া করছিল, অভিযোগ করছিল। আর এ অনুবাদ পড়ে পাঠক এ অর্থ গ্রহণ করে যে, মহিলাটি তার অভিযোগ

পেশ করে হয়তো চলে গিয়েছিল এবং পরে কোনো এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অহী নাযিল হয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি সে মহিলার কথা শুনেছি, যে তোমার কাছে অনুনয় বিনয় ও ফরিয়াদ করছিল। সে সময় আমি তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলাম। কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে হাদীসসমূহে যেসব বর্ণনা আছে তার অধিকাংশ বর্ণনাতেই বলা হয়েছে, যে সময় সেই মহিলা তার স্বামীর "যিহারের" ঘটনা শুনিয়ে নবীর ﷺ কাছে বারবার এ বলে আবেদন করছিল যে তাদের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক এ সময়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো।

আল্লাহর দরবারে এ সাহাবিয়ার অভিযোগে গৃহীত হওয়া এবং আল্লাহর তরফ থেকে সাথে সাথে তাঁর অভিযোগের প্রতিকার করে নির্দেশ নাযিল হওয়া ছিল এমন একটি ঘটনা যার কারণে সাহাবী কিরামের মধ্যে তিনি বিশেষ একটি সম্মান ও মর্যাদার স্থান লাভ করেছিলেন। ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, একবার 'উমর رضي الله عنه কিছুসংখ্যক সংগী-সাথীর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলার সাথে দেখা হলে সে তাঁকে থামতে বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। মাথা নিচু করে দীর্ঘ সময় তার কথা শুনলেন এবং সে নিজে কথা শেষ না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সংগীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ বুড়ীর জন্য আপনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এত সময় থামিয়ে রেখেছেন কেন? তিনি বললেন, সে কে তা কি জান? এ যে, খাওলা বিনতে সা'লাবা। এ তো সে মহিলা, সাত আসমানের ওপরে যার অভিযোগ গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাহলে আমি সারা রাতই দাঁড়িয়ে থাকতাম। শুধু নামাযের সময় ওযর পেশ করতাম। ইবনে আব্দুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে কাতাদার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাস্তায় উমরের رضي الله عنه সাথে এ মহিলার সাক্ষাত হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন। সালামের জবাব দেয়ার পর তিনি বলতে থাকলেন, "ওহ্ উমর এমন এক সময় ছিল যখন আমি তোমাকে "উকাযের" বাজারে দেখেছিলাম। তখন তোমাকে উমায়ের বলে ডাকা হতো। তখন তুমি লাঠি হাতে নিয়ে বকরী চরিয়ে বেড়াতে। এর অল্প দিন পর তোমাকে "উমর' নামে ডাকা হতে থাকলো। অতঃপর এমন এক সময় আসলো যখন তোমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করা শুরু হলো। প্রজাদের ব্যাপারে অন্তত কিছুটা আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যে আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত সাবধানবাণীকে ভয় পায় দূরের মানুষও তাঁর নিকটাত্মীয়ের মত হয়ে যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় পায় তার ব্যাপারে আশঙ্কা হয় যে, সে এমন জিনিসও হারিয়ে ফেলবে যা সে রক্ষা করতে চায়"। উমরের رضي الله عنه সাথে ছিলেন জারুদ আবদী। একথা শুনে তিনি বললেন, হে নারী! তুমি আমীরুল মু'মিনের সাথে অনেক বে-আদবী করেছো। 'উমর বললেন, তাকে বলতে দাও। তুমি কি জান সে কে? তাঁর কথা তো সাত আসমানের ওপরে গৃহীত হয়েছিল। 'উমরকে رضي الله عنه তো তাঁর কথা শুনতেই হবে। 'ইমাম বুখারীও তাঁর লিখিত ইতিহাস (আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া গ্রন্থে সংক্ষেপে এ ঘটনার প্রায় অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

স্ত্রীকে মায়ের মত বললে স্ত্রী মা হয়ে যায় না

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে যিহার করে (তারা জেনে রাখুক), তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছেন। তারা তো একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা কথাই বলছে। আর আল্লাহ তো অতীব গুনাহ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত-২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আরবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে স্বামী রাগান্বিত হয়ে বলতো اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ এর আভিধানিক অর্থ হলো, "তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত" কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আমার তোমার সাথে সহবাস ঠিক আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। এযুগেও বহু নির্বোধ মানুষ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তাদের মা, বোন ও মেয়ের মত বলে ফেলে। এর স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় স্বামী এখন আর তাকে স্ত্রী মনে করে না; বরং যেসব স্ত্রীলোক তার জন্য হারাম তাদের মত মনে করে। এরূপ করাকেই "যিহার" বলা হয়। যিহার আরবী ভাষায় রূপক অর্থে বাহনকে বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সওয়ারী জন্তুকে যিহার বলা হয়। কেননা, মানুষ তার পিঠে আরোহণ করে। মানুষ যেহেতু স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো যে, যিহার বানানো আমার জন্য আমার মাকে যিহার বানানোর মতই হারাম। সুতরাং তাদের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারণ করাকেই তাদের ভাষায় "যিহার" বলা হতো। জাহেলী যুগে আরবদের কাছে এটা তালাক বা তার চেয়ে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ছিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করছে না; বরং তাকে নিজের মায়ের মত হারাম করে নিচ্ছে। এ কারণে আরবদের মতে তালাক দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যেতো। কিন্তু "যিহার" প্রত্যাহার করার কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকতো না।

এটা যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রথম ফায়সালা। এর অর্থ হলো, কেউ যদি মুখ ফুটে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বসে তাহলে তার বলার কারণ, স্ত্রী তার মা হতে পারে না। কোনো মহিলার কারো মা হওয়া একটা সত্য ও বাস্তব প্রমাণ ব্যপার। কারণ, সে তাকে প্রসব করেছে। এ কারণে সে স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যে নারী তাকে প্রসব করেনি, শুধু মৌখিক কথাতেই সে কীভাবে তার মা হয়ে যাবে? বুদ্ধি-বিবেক, নৈতিকতা এবং আইন-কানুন যে কোনো বিচারেই হোক সে কীভাবে প্রকৃত প্রসবকারিণী মায়ের মত হারাম হবে? আল্লাহ তা'আলা এভাবে এ কথাটি ঘোষণা করে সেসব জাহেলী আইন-কানুনকে বাতিল করে দিয়েছেন যার ভিত্তিতে যিহারকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো এবং স্ত্রীকে স্বামীর জন্য মায়ের মত অলংঘনীয় হারাম মনে করা হতো।

স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলন করা প্রথমত এমন একটি অর্থহীন ও লজ্জাজনক কথা যা মুখে উচ্চরণ করা তো দূরের কথা কোনো পবিত্র মানুষের যার কল্পনাও করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এটি একটি মিথ্যা কথাও বটে। কারণ, যে এরূপ কথা বলছে সে যদি এর দ্বারা বুঝিয়ে থাকে যে, তার স্ত্রী এখন তার মা হয়ে গিয়েছে তাহলে সে মিথ্যা বলছে। আর সে যদি এ কথাটি তার সিদ্ধান্ত হিসেবে শুনিয়ে থাকে যে, আজ থেকে সে তার স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দান করেছে তাহলেও তার এ দাবী মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ তাকে অধিকার দেননি যে, যতদিন ইচ্ছা সে একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে এবং যখন ইচ্ছা তাকে মায়ের মর্যাদা দান করবে। সে নিজে আইন রচয়িতা নয়; বরং আইন রচয়িতা হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা প্রসবকারিণী মায়ের সাথে দাদী, নানী, শাশুড়ি, দুধ মা এবং নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণকেও মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন। নিজের স্ত্রীকে তো দূরের কথা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোনো নারীকেও এ মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার কারোরই নেই। একথা থেকে আরো একটি আইনগত বিধান যা পাওয়া যায় তাহলো, 'যিহার' করা একটি গুরুতর গোনাহ এবং হারাম কাজ। যে এ কাজ করবে সে শাস্তির উপযুক্ত।

এটি এমন একটি কাজ যে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী যে, তিনি প্রথমত যিহারের ব্যাপারে জাহেলী আইন-কানুন বাতিল করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়ত এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তার সবচেয়ে বড় মেহেরবানী এই যে, জেল খাটা বা মারপিট আকারে এ অপরাধের শাস্তি বিধান করেননি; বরং এমন কিছু ইবাদত ও নেকীর কাজকে এ অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত করেছেন যা তোমাদের প্রবৃত্তির সংশোধন করে এবং সমাজে কল্যাণ ও সুকৃতির বিস্তার ঘটে। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বুঝা উচিত যে, কোন কোন অপরাধ এ গোনাহর জন্য যেসব ইবাদতকে কাফ্ফারা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ইবাদতের চেতনাবিহীন নিরেট শাস্তি নয়। আবার নিছক এমন ইবাদতও নয় যে, তার মধ্যে শাস্তির কষ্টকর কোনো দিক আদৌ নেই। এর মধ্যে ইবাদাত ও শাস্তি উভয়টিই একত্রিত করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তি যুগপত কষ্টও ভোগ করে এবং সাথে সাথে একটি ইবাদাত ও নেকীর কাজ করে তার কৃত গোনাহরও প্রতিকার করে।

যিহারের বিধি-বিধান

وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, পরে তারা প্রত্যাহার করতে চায় যা তারা বলেছে, তাদের দায়িত্ব একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়া। এ আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে নসীহত করা যাচ্ছে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। তবে যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে। আর যে ব্যক্তি এতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে। এ নির্দেশ এজন্য যে, তোমরা যেন ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত : ৩-৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এখান থেকে যিহারের আইনগত আদেশ নিষেধ শুরু হয়েছে। এসব বিধি-বিধান সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নবী ﷺ-এর পবিত্র যুগে যিহারের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা সামনে থাকা জরুরি। কেননা, যিহারের বিধি-বিধান সম্পর্কিত এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে নবী ﷺ যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান গৃহীত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে আওস ইবনে সামেত আনসারীর ঘটনাই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত সর্ব প্রথম ঘটনা। তাঁর স্ত্রী খাওলার ফরিয়াদের জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে মুহাদ্দিসগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাতে অনেক খুঁটি-নাটি মতভেদ আছে। তবে আইনগত গুরুত্ব বহন করে এরূপ উপাদান সম্পর্কে সবাই প্রায় একমত। এসব বর্ণনার সার কথা হলো, বৃদ্ধাবস্থায় আওস ইবনে সামেত কিছুটা খিটমিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে তার মধ্যে কতকটা পাগলামী ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য বর্ণনাকারীগণ كَانَ بِهٖ لَمَمٌ বাক্য ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় لَمَمٌ শব্দ দ্বারা পাগলামী বুঝানো হয় না; বরং এমন একটি অবস্থাকে বুঝানো হয় যাকে আমরা বাংলায়, "রাগে পাগল হয়ে যাওয়া" কথাটি দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। এ অবস্থায় তিনি পূর্বেও কয়েকবার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তার দ্বারা পুনরায় এ ঘটনা

সংঘটিত হওয়া ছিল ইসলামে সর্ব প্রথম ঘটনা। এ ঘটনার পর তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির হয় এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং আমার সন্তানাদির জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কোনো অবকাশ আছে কি? নবী ﷺ এর জওয়াব দিয়েছিলেন বিভিন্ন বর্ণনাকারী তা বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনার ভাষা হলো, "এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাকে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি।" কোনো কোনো বর্ণনার ভাষা হলো, "আমার ধারণা তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো। "আবার কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।"এ জবাব শুনে তিনি কাকুতি ও আহাজারী করতে শুরু করলেন। তিনি বারবার নবীকে ﷺ বললেন, সে তো তালাকের শব্দ বলেনি। আপনি এমন কোনো পন্থা বলুন যার দ্বারা আমি আমার সন্তানাদি এবং বুড়ো স্বামীর জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু নবী ﷺ প্রতিবার তাকে একই জবাব দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে নবীর ﷺ ওপর অহী নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখা দিল এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এরপর তিনি তাকে বললেন, কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে তার স্বামীকে ডেকে বললেন, একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। সে এতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে বললেন, লাগাতার দুইমাস রোযা রাখতে হবে। সে বললো তার অবস্থা এমন যে, দিনে তিনবার পানাহার না করলে তার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণতর হতে থাকে। তিনি বললেন, তাহলে ৬০জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। সে বললো তার সে সামর্থ নেই। তবে আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে পারবো। তিনি তাকে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বার খাওয়ানের মত খাদ্য দিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে প্রদত্ত এ খাদ্যের বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ যে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন খাওলা নিজেও তার স্বামীকে সে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন যাতে তিনি কাফ্ফারা আদায় করতে পারেন। (ইবনে জারীর, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

যিহারের দ্বিতীয় ঘটনা ছিল সালামা ইবনে সাখার বায়দীর ঘটনা। তাঁর যৌন শক্তি ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি। রমযান মাস আসলে সে আশঙ্কায় রমযানের শেষ অবধি সময়ের জন্য স্ত্রীর সাথে যিহার করলো যাতে রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় অধৈর্যের কাজ করে না বসে। কিন্তু সে নিজের এ সংকল্প রক্ষা করতে পারেনি। এক রাতে সে স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তারপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব কিছু খুলে বলে। তিনি বললেন, একজন ক্রীতদাস মুক্ত করো। সে বললো, আমার কাছে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই যাকে আমি মুক্ত করতে পারি। তিনি বললেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখো। সে বললো, রোযা অবস্থায় অধৈর্য হয়েই তো আমি এ মসিবতে জড়িয়ে পড়েছি। নবী ﷺ বললেন, তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দাও। সে বললো, আমি এত দরিদ্র যে, উপোস করে রাত কাটিয়েছি। তখন নবী ﷺ বনী যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট থেকে তাকে এতটা খাদ্য দিলেন যাতে সে তা ৬০ জন মিসকীনকে বণ্টন করে দিতে পারে এবং নিজের সন্তানাদির প্রয়োজন পূরণ করার জন্যও কিছু রাখতে পারে। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নাম উল্লেখ না করে তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো এবংকাফ্ফারা আদায় করার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করলো। পরে নবী ﷺ এর কাছে এ বিষয়ের সমাধান জানতে চাইলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকো।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

চতুর্থ ঘটনাটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বোন সম্বোধন করে ডাকছে। এতে তিনি রাগান্বিতভাবে বললেন, সে কি তোমার বোন? তবে এটাকে তিনি যিহার হিসেবে গণ্য করলেন না। (আবু দাউদ)

এ চারটি ঘটনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন মজীদের 'যিহার' সম্পর্কিত যে নির্দেশ আছে সব হাদীসের সাহায্যে তা ভালভাবে বুঝা যেতে পারে।

মূল আয়াতাংশ হচ্ছে, يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا একথাটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তারা যা বলেছে যদি সেদিকে ফিরে যায়" কিন্তু আরবী ভাষা ও বাক্যরীতি অনুসারে এর অর্থ নিরূপণে বড় রকমের মতভেদ হয়েছে।

এর একটি অর্থ হতে পারে, যিহারের শব্দাবলি একবার মুখ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় তা বলবে। জাহেরিয়া, বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ এবং ইয়াহইয়া ইবনে যিহাদ আল ফাররা এ অর্থের সমর্থন। আতা ইবনে আবী রাবাহর একটি মতও এর সমর্থন করে বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মতে একবার যিহার করলে তা ক্ষমার যোগ্য। তবে কেউ যদি বার বার তা করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে দুটি কারণে এ ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভুল। একটি কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যিহারের অর্থহীন ও মিথ্যা কথা ঘোষণা করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এখন একথা কি কল্পনা করা যায় যে, কেউ একবার মিথ্যা এবং অর্থহীন কথা বললে তা মাফ হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার বললে শাস্তির উপযুক্ত হবে? এটি ভুল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিহারকারী কোনো লোককেই একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, সে একবার যিহার করেছে না দুইবার।

এ আয়তাংশের দ্বিতীয় অর্থ হলো, জাহেলী যুগে যেসব লোক এ কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল তারা যদি ইসলামের যুগেও তা করে তাহলে এটা হবে তাদের শাস্তি। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে যিহার করা মূলত একটা শাস্তিযোগ্য কাজ। যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মুখ থেকে যিহারের শব্দাবলি উচ্চারণ করবে সে পরে তার স্ত্রীকে তালাক দিক বা তার স্ত্রী মারা যাক কিংবা সে তার স্ত্রীর সাথে দম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সংকল্প করুক তাকে কিছু আসে যায় না। সর্বাবস্থায় তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। ফকীহদের মধ্যে তাউস, মুহাজিদ, শা'বী যুহরী, সুফিয়ান সাওরী এবং কাতাদা এমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে যিহার করার পর স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধীকারী হবে না।

এ আয়াতাংশের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, যিহারের শব্দাবলি মুখ থেকে উচ্চারণের পর ব্যক্তি যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে এবং যদি তার প্রতিকার করতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ অর্থ সে যদি তার কথা থেকে ফিরে যায়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো, যিহার করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জন্য যে জিনিস হারাম করে নিয়েছিল তা যদি আবার নিজের জন্য হালাল করে নিতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হারাম করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখন সে পুনরায় তা হালাল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ শেষোক্ত দুটি অর্থের মধ্যে যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অন্য কথায় তোমাদেরকে শিষ্ট ও ভদ্র আচরণ শিখানোর জন্য এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যাতে মুসলিম সমাজের মানুষ এ জাহেলী কু-আচরণ পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে কেউই যেন এ অর্থহীন কাজ না করে। যদি স্ত্রীর সাথে বিবাদ না করে কোনো উপায় না থাকে তাহলে সভ্য ও রুচিশীল মানুষের মত বিবাদ করো। যদি তালাকই দিতে হয় তাহলে সরাসরি তালাক দিয়ে দাও। স্ত্রীর সাথে বিবাদ হলে তাকে মা অথবা বোন বানিয়ে ছাড়তে হবে এটা কী ধরনের ভদ্রতা?

কেউ যদি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে চুপে চুপে যিহার করে বসে এবং পরে কাফ্‌ফারা আদায় করা ছাড়াই স্বামী স্ত্রির মধ্যে আগের মতই দাম্পত্য সম্পর্ক চলতে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুনিয়াতে কেউ অবহিত থাক আর না থাক আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই তা জানেন। তার জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

মুসলিম ফিক্‌হবিদগণ এ আয়াতের শব্দাবলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তসমূহ এবং ইসলামের সাধারণ নীতিমালা থেকে এ বিষয়ে যেসব আইন-কানুন রচনা করেছেন তার বিস্তারিত বিরবণ নিম্নরূপ-

১. আবর জাহেলিয়াতের যেসব রসম-রেওয়াজ অনুসারে যিহার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিত এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেতো যিহার সম্পর্কিত এসব ইসলামী আইন-কানুন তা বাতিল করে দেয়। অনুরূপভাবে যেসব আইনকানুন ও রসম-রেওয়াজ যিহারকে অর্থহীন ও প্রতিক্রিয়াহীন মনে করে এবং স্ত্রীকে মা কিংবা বিয়ে করা হারাম এমন মহিলাদের সাথে তুলনা করা সত্ত্বেও স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ করে দেয় ইসলামী আইন-কানুন সে সবকেও বাতিল করে দেয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মা এবং বিয়ে করা হারাম এমন অন্য সব মহিলার হারাম হওয়ার ব্যাপারটা মামুলি কোনো বিষয় নয়। তাই স্ত্রী এবং তাদের মধ্য তুলনা করার বিষয়টা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা তা কল্পনাও করা যায় না। এ ব্যাপারে দুটি চরম পন্থার মধ্যে ইসলামী আইন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

- প্রথম ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়না; বরং মহিলা যথারীতি স্বামীর স্ত্রীই থাকে।

- দ্বিতীয় ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়।
- তৃতীয় ভিত্তি হলো, স্বামী কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত এই 'হুরমত' অবশিষ্ট থাকে এবং শুধু কাফ্ফারাই এই 'হুরমত' রহিত করতে পারে।

২. যিহারকারী স্বামী সম্পর্কে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে স্বামী সুস্থ বুদ্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ ও সজ্ঞানে যিহারের শব্দাবলি মুখ থেকে উচ্চারণ করবে কেবল তার যিহার গ্রহণযোগ্য হবে। শিশু ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া যিহারের শব্দাবলি উচ্চারণের সময় যার বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুস্থ নেই তার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- কেউ ঘুমন্ত অবস্থা অস্ফুট স্বরে কিছু বললো অথবা কোনো প্রকার সংজ্ঞানহীনতায় আক্রান্ত হলো। এগুলো ছাড়া নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহে ফিক্‌হবিদদের মতভেদ আছে।

❖ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যিহারকারী সম্পর্কে চার ইমামসহ ফিক্‌হবিদদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত হচ্ছে, কেউ যদি জেনে শুনে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তাহলে তালাকের মত তার যিহারও আইনত সঠিক বলে ধরে নেয়া হবে। কারণ সে নিজেই নিজের ওপর এ অবস্থা চাপিয়ে নিয়েছে। তবে কেউ যদি রোগের জন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা নেশা ও মাদকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে অথবা তীব্র পিপাসায় জীবন রক্ষার জন্য শরাব পান করতে বাধ্য হয়ে থাকে তবে এভাবে সৃষ্ট নেশার কারণে তার যিহার ও তালাক কার্যকর করা হবে না। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। সাধারণভাবে সাহাবা কিরামের মতও এটিই ছিল। পক্ষান্তরে উসমানের (রা) মত হলো, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তালাক ও যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম তাহাবী (র) ও কারখী (র) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং ইমাম শাফেয়ীদের (র) একটি মতও এর সমর্থন করে। মালেকীদের মতে ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে বিচার বুদ্ধি খুইয়ে না বসে; বরং সংলগ্ন ও সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলতে থাকে এবং কী বলেছে সে উপলব্ধি থাকে তাহলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে।

❖ ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমাম মালেকের (র) মত কেবল মুসলমান স্বামীর যিহারই গ্রহণযোগ্য হবে। যিহার সম্পর্কিত এসব বিধি-নিষেধ যিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ কুরআন মাজীদে اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ বলে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মাজীদে যিহারের যে তিন প্রকার কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রোযাও অন্তর্ভুক্ত আছে। একথা সুস্পষ্ট যিম্মিদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের মতে এসব আদেশ নিষেধ যিম্মী ও মুসলমান উভয়ের যিহারের

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে যিম্মীদের রোযা রাখতে হবে না। তারা শুধু একজন ক্রিতদাসকে মুক্ত করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দেবে।

❖ পুরুষের মত নারীও কি যিহার করতে পারে? যেমন- সে যদি স্বামীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার বাপের মত অথবা আমি তোমার জন্য তোমার মায়ের মত তাহলে কি তা 'যিহার' বলে গণ্য হবে? চার ইমামের মতে এটা যিহার হবে না এবং এ ক্ষেত্রে যিহারের আইনগত বিধি বিধান আদৌ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে যিহার করে কেবল তখনই এই বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে বলে কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ এবং যিহার করার ইখতিয়ার কেবল তারই থাকবে যার তালাক দেয়ার অধিকার আছে। ইসলামী শরীয়াত স্বামীকে তালাক দেয়ার ইখতিয়ার যেমন স্ত্রীকে দেয়নি ঠিক তেমনি নিজেকে স্বামীর জন্য হারাম করে নেয়ার ইখতিয়ারও দেয়নি। সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহবিয়া, আবু সাওর এবং লাইস ইবনে সাদ এমতটিই পোষণ করেছেন। তাদের মতে, স্ত্রীর এরূপ কথা অযথা ও অর্থহীন। ইমাম আবু ইউসূফ বলেন, এতে যিহার হবে না। তবে এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর কসমের কাফ্ফারা দেয়া অত্যাবশ্যকীয় হবে। কারণ স্ত্রীর একথা বলার অর্থ হচ্ছে সে তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করেছে। ইবনে কুদামাহ উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালেরও (র) মত। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, স্ত্রী যদি বিয়ে হওয়ার আগে একথা বলে থাকে যে, তার যদি অমুক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় তাহলে সে তার জন্য তার বাপের মত তা যিহার বলে গণ্য হবে। আর যদি বিয়ের পর বলে থাকে তাহলে কসম বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্বামীকে কাছে আসতে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নারীর থাকবে না। এর সমর্থনে ইবরাহীম নাখয়ী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, তালহার রাদিয়াল্লাহু আনহু কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করার জন্য যুবায়েরের পুত্র মুসআব প্রস্তাব দিলে সে প্রত্যাখান করে বলে; আমি যদি তাকে বিয়ে করি তাহলে هُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ اَبِيْ সে আমার পিতার পিঠের মত। এর কিছুকাল পর সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ব্যাপারে মদীনার উলামাদের নিকট থেকে ফতোয়া চাওয়া হলে বহু সংখ্যক ফকীহ ফতোয়া দিলেন যে, আয়েশাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে। এসব ফকিদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ইবরাহীম নাখয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, আয়েশা যদি বিয়ের পর একথা বলতে তাহলে কাফ্ফারা দিতে হতো না। কিন্তু তিনি এ কথা বলেছিলেন বিয়ের পূর্বে, যখন তাঁর বিয়ে করা বা না করার অধিকার ছিল তাই তার ওপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব।

৩. সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যিহারের শব্দাবলি মুখ থেকে উচ্চারণ করে এবং পরে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে, হাসি তামাসা করে অথবা আদর সোহাগ করে এরূপ বলেছে কিংবা তার যিহারের নিয়ত ছিল না তাহলে এ ওপর গ্রহনযোগ্য হবে না। তবে যেসব শব্দ থেকে স্পষ্টপভাবে যিহার বুঝায় না এবং যেসব শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অবকাশ আছে সেসব শব্দের ধরন ও প্রকৃতির ওপর তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। যিহারের স্পষ্ট শব্দ কোনগুলো এবং অস্পষ্ট শব্দ কোনগুলো সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো।

৪. এটা সর্বসম্মত ব্যাপার যে, বিবাহিত স্ত্রীর সাথেই কেবল যিহার করা যায়। অতএব স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সাথে যিহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত নিম্নরূপ-

❖ হানাফীদের মতে কেউ যদি অপর কোনো নারীকে বলে, "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত।" এ ক্ষেত্রে সে যখনই তাকে বিয়ে করুক না কেন, কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এটি 'উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফতোয়া। তাঁর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি এক মহিলাকে একথা বলেছিল এবং পরে তাকে বিয়ে করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাকে যিহারের কাফ্ফারা দিতে হবে।

❖ মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণও এ কথাই বলেন। এর সাথে তারা অতিরিক্ত এতটুকু সংযোজন করেন যে, যদি নির্দিষ্ট করে কোনো মহিলার কথা না বলে এভাবে বলে যে, সমস্ত নারীই আমার জন্য এরূপ, এমতাবস্থায় সে যে নারীকেই বিয়ে করুক না কেন তাকে স্পর্শ করার আগেই কাফ্ফারা দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং ইসহাক ইবনে রাহবিয়া এমতটিই পোষণ করেছেন।

❖ শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, বিয়ের পূর্বে যিহার অর্থহীন। ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাও এ মতটিই পোষণ করেন।

৫. যিহার কি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হতে পারে? হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, কেউ যদি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে যিহার করে তাহলে সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে সেই সময় অতিক্রম হলে যিহার অকার্যকর হয়ে পড়বে। এর প্রমাণ সালামা ইবনে সাখর বায়াদীর ঘটনা। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে রমযান মাসের জন্য যিহার করেছিলেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেননি, যে সময় নির্দিষ্ট করা অর্থহীন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী লায়লা বলেন, যিহার যখনই করা হোক না কেন তা সব সময়ের জন্য হবে। এ ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করার কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ, যে 'হুরমত, কার্যকর হয়েছে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তা আপনা থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

৬. শর্তযুক্ত যিহার করা হয়ে থাকলে যখনই শর্ত ভঙ্গ হবে কাফ্ফারা দিতে হবে। যেমন, কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, "আমি যদি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" এমতাবস্থায় সে যখনই ঘরে প্রবেশ করবে কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়া সে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৭. একই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কয়েকবার যিহারের শব্দাবলি বলা হয়ে থাকলে তা একই বৈঠকে বলা হয়ে থাক বা ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হয়ে থাক, সর্বাবস্থায়ই তা যথবার বলা হয়েছে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে যিহারের শব্দাবলি ব্যবহারকারী যদি তা একবার ব্যবহার করার শুধু পূর্বের কথার ওপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে তা বারবার বলে তাহলে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, কথাটি বারবার বলার নিয়তে বলা হোক কিংবা জোর দেয়ার জন্য বলা হোক, যতবারই বলা হোক না কেন সেজন্য একবারই কাফ্ফারা দিতে হবে। শা'বী, তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ্, হাসান বাসরী এবং আওযায়ী রাহিমাহুমুল্লাহ এ মতেরই অনুসারী। এ বিষয়ে আলীর ফতোয়া হলো, কথাটি যদি একই বৈঠকে বার বার বলা হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য একবার মাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হলে যত সংখ্যক বৈঠকে বলা হয়েছে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে। এটি কাতাদা এবং আ'মর ইবনে দীনারেরও মত।

৮. দুই বা দুয়ের অধিক সংখ্যক স্ত্রীর সাথে একসাথে যিহার করা হলে, যেমন- স্বামী তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললো যে, তোমরা আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, প্রত্যেককে হালাল করার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে। এটি 'উমর', আলী, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, তাউস, আতা, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবনে শিহাব যুহরীর মত। ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমাদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সবার জন্য একবারই কাফ্ফারা দিতে হবে। রাবীয়া, আওযায়ী, ইসহাক ইবনে রাহবিয়া এবং আবু সাওরও এমতের অনুসারী।

৯. কেউ যদি এক যিহারের কাফ্ফারা দেয়ার পর পুনরায় যিহার করে বসে তাহলে পুনরায় কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

১০. কেউ যদি কাফ্ফারা দেয়ার আগেই স্ত্রীকে স্পর্শ করে বসে তাহলে চার ইমামের মতে যদিও একাজ গোনাহ কিন্তু তাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং পুনরায় এ কাজ না করা উচিত। রাসূলুল্লাহ -এর যুগে যারা এরূপ করেছিল তিনি তাদের বলেছিলেন। "ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং যতক্ষণ কাফ্ফারা না দিবে ততক্ষণ স্ত্রী থেকে আলাদ থাকো।" কিন্তু এজন্য তিনি যিহারের কাফ্ফারা ছাড়া আর কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেননি। আমর ইবনুল আস, কাবিসা ইবনে যুয়াইব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের যুহরী এবং কাতাবা বলেন, তাকে দুইটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এবং হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীর মতে তিনটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এ বিষয়ে যেসব হাদীসে নবীর ফায়সালা বর্ণিত হয়েছে উক্ত মনীষীদের কাছে সম্ভবত সে সব হাদীস পৌঁছেনি।

১১. স্ত্রীকে কাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে? এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন-

❖ আমের শা'বী বলেন, কেবলমাত্র মায়ের সাথে তুলনা করলেই যিহার হবে। জাহেরিয়াগণ বলেন, মায়েরও শুধু পিঠের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে। অন্য কোনো কথার ওপর এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের কোনো গোষ্ঠিই ঐকমত্য পোষণ করেননি। কারণ মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করাকে কুরআন কর্তৃক গোনাহর কাজ বলার কারণ হলো, এটা একটা চরম অর্থহীন ও মিথ্যা কথা। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যেসব নারী মায়ের মতই হারাম, তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করা অর্থহীনতা ও মিথ্যাবাদীতার দিক থেকে এর চেয়ে কোনো অংশ কম নয়। তাই মায়ের সাথে তুলন করার ক্ষেত্রে বিধান প্রযোজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

❖ হানাফীদের মতে, যেসব নারী বংশ, দুগ্ধদান অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে কারো জন্য চিরস্থায়ী হারাম তারা সবাই এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যেসব নারী অস্থায়ীভাবে, হারাম এবং যে কোনো সময় হালাল হতে পারে তারা এর অন্তর্ভুক্ত না। যেমন- স্ত্রীর বোন, খালা, ফুফু, অন্যান্য নারী যারা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়। চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের মধ্যে থেকে কোনো মহিলার যে অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কারো জন্য হালাল নয় তার সাথে তুলনা করাই যিহার বলে গণ্য হবে। তবে স্ত্রীর হাত, পা, মাথা, চুল, দাঁত, ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী হারাম নারীর পিঠের সাথে অথবা স্ত্রীকে তার মাথা, হাত ও পায়ের মত দৈহিক অংগ-প্রত্যাংগের সাথে তূলনা করা যিহার বলে গণ্য হবে না। কারণ, মা ও বোনের এসব অংগ প্রত্যাংগের প্রতি তাকানো হারাম নয়। অনুরূপভাবে তোমার হাত আমার মায়ের হাতের মত অথবা তোমার পা আমার মায়ের পায়ের মত বলায় যিহার হবে না।

❖ শাফেয়ীদের মতে, কেবল সেসব নারীই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা চিরদিন হারাম ছিল এবং চিরদিন হারাম থাকবে। অর্থাৎ মা, বোন, মেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু যেসব নারী কোনো সময় হালাল ছিল যেমন- দুধ মা, দুধ বোন, শাশুড়ী, এবং পুত্রবধু অথবা যে সব নারী কোনো সময় হালাল হতে পারে। যেমন- শ্যালিকা। এসব বিশেষ কারণে হারাম বা সাময়িক ও অস্থায়ী হারাম নারী ছাড়া স্থায়ী হারাম নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর জন্য সাধারণত যে সব অংগের কথা উল্লেখ করা হয় না স্ত্রীকে যদি সেসব অংগের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তার যিহার বলে গণ্য হবে। তবে যেসব অংগ-প্রত্যাংগের উল্লেখ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য করা হয় তার সাথে তুলনা করা কেবল তখনই যিহার হবে যখন তা যিহারের নিয়তে বলা

হবে। যেমন, স্ত্রীকে একথা বলা, তুমি আমার মায়ের চোখ অথবা জানের মত অথবা মার হাত অথবা পা অথবা পেটের মত, অথবা মায়ের পেট অথবা বক্ষস্থলে স্ত্রীর সাথে পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে তুলন করা, অথবা স্ত্রীর মাথা, পিঠ, অথবা হাতকে নিজের জন্য মায়ের হাতের মত মনে করা, অথবা স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মত। এসব কথা যদি যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে যিহার হবে, আর যদি সম্মান দেখানো নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে সম্মান প্রদর্শনই হবে।

❖ মালেকীগণ বলেন, যেসব নারী পুরুষের জন্য হারাম তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করাই যিহার। এমন কি তাদের মতে, স্বামী যদি বলে, তুমি আমার জন্য অমুক পরনারীর পিঠের মত তাহলে তাও যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তারা আরো বলেন, মা এবং চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের কোনো অংগের সাথে স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রীর কোনো অংগকে তুলনা করা যিহার। এ ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত নেই যে, সেসব অংগ এমন হতে হবে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়। কারণ স্ত্রীর প্রতি যেভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় সেভাবে মায়ের কোনো অংগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়।

❖ হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণ হারাম মহিলাদের সবাইকে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। তাই চাই স্থায়ী হারাম হোক অথবা ইতোপূর্বে কখনো হালাল ছিল এখন চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। যেমন- শাশুড়ি ও দুধমা। তবে যেসব মহিলা পরবর্তী কোনো সময় হালাল হতে পারে যেমন- শ্যালিকা। তাদের ব্যাপারে ইমাম আহমাদের একটি মত হলো, তাদের সাথে যিহার হবে না। তাছাড়াও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মতে স্ত্রীর কোনো অংগকে হারাম মেয়েদের কোনো অংগের সাথে তুলনা করা যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তবে চুল, নখ ও দাঁতের মত শরীরের অস্থায়ী অংগসমূহ এ নির্দেশের বহির্ভূত।

১২. এ ব্যাপারে সমস্ত ফিক্‌হবিদগণ একমত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত "তাহলে তা স্পষ্ট যিহার হবে। কারণ, আরবদের মধ্যে এটাই যিহারের নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল। আর এ বিষয়টি সম্পর্কেই কুরআনের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। অন্য সব বাক্যের কোনটি দ্বারা স্পষ্ট যিহার হবে আর কোনটি দ্বারা যিহার হবে না; বরং সে ক্ষেত্রে যিহার হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত বক্তার নিয়ত অনুসারে করা হবে। এ ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

❖ হানাফীদের মতে, যেসব বাক্য দ্বারা হালাল নারীকে (স্ত্রী) স্পষ্টভাবে হারাম নারীর (স্থায়ী হারাম নারীদের কোনো একজন) সাথে তুলনা করা হয়েছে, অথবা যে অংগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল নয় এমন অংগের সাথে তুলনা

করা হয়েছে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তুমি আমার জন্য মা অথবা অমুক হারাম নারীর পেট অথবা উরুর মত। এছাড়া অন্য সব বাক্য সম্পর্কে মতভেদ করার অবকাশ আছে। কেউ যদি বলে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম। ইমাম আবু হানিফার মতে এটা স্পষ্ট যিহার। কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে এ ক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে এবং তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে। যদি বলে, তুমি যেন আমার মা অথবা আমার মায়ের মত তাহলে এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে হানাফীদের ফতোয়া হলো, যিহারের নিয়তে একথা বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে এবং তালাকের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে বায়েন তালাক হবে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে বলা হয়ে থাকলে অর্থহীন বাক্য হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে এটা অকাট্যভাবে যিহার। কেউ যদি স্ত্রীকে মা অথবা বোন অথবা কন্যা বলে সম্বোধন করে তাহলে এটা চরম অর্থহীন ও বাজে কথা। এরূপ কথায় নবী ﷺ ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাকে যিহার বলে গণ্য করেননি। কেউ যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের মতই হারাম" যদি যিহারের নিয়তে বলে তাহলে যিহার হবে তালাকের নিয়তে বললে, তালাক হবে। আর কোনো নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের অনুরূপ অথবা মায়ের মত" তাহলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলে থাকে তাহলে সম্মান মর্যাদা দেখানো বলে গণ্য হবে। যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে। তালাকের নিয়তে বলে থাকলে তালাক হবে। কোনো নিয়ত না থাকলে এবং এমনি বলে থাকলে ইমাম আবু হানিফার মতে অর্থহীন কথা হবে, ইমাম আবু ইউসূফের মতে তাকে যিহারের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না তবে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদের মতে যিহার হবে।

❖ শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে যিহারের স্পষ্ট বাক্য হলো, "তুমি আমার কাছে অথবা আমার সঙ্গে অথবা আমার জন্য মায়ের পিঠের মত, অথবা তুমি আমার মায়ের পিঠের মত। অথবা তোমার দেহ বা শরীর অথবা তোমার সত্তা, আমার জন্য আমার মায়ের দেহ বা শরীর অথবা সত্তার মত। এছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বাক্যের ব্যাপারে বাক্য প্রয়োগকারীর নিয়ম অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে।

❖ হাম্বলী ফিক্‌হবিদদের মতে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার স্বতন্ত্র কোনো অংগকে বিয়ে করা হারাম এমন কোনো মহিলার সাথে অথবা তার দেহের স্বতন্ত্র কোনো অংগের সাথে স্পষ্ট ভাষায় তুলনা করে তাহলে তা যিহারের স্পষ্ট বাক্য বলে গণ্য হবে। মালেকী মাযহাবের অনুসৃত মতও প্রায় অনুরূপ। তবে বিস্তারিত খুটিনাটিতে গিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে। তুমি আমার জন্য আমার মায়ের তুল্য অথবা আমার মায়ের

মত তাহলে মালেকীদের মতে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে। তালাকের নিয়ম থাকলে তালাক হবে এবং কোনো নিয়ত না থাকে যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে শুধু নিয়তের শর্তে যিহার বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি আমার মা। মালেকীদের মতে তা যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে ঝগড়া বিবাদ বা ক্রুদ্ধবস্থায় বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে এবং আদর সোহাগপূর্ণ পরিবেশে বলা হয়ে থাকলে তা খুবই খারাপ কথা। কিন্তু তা যিহার হিসেবে গণ্য হবে না। কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক, তুমি আমার মায়ের মত, তাহলে হাম্বলীদের মতে এতে তালাক হবে যিহার নয়। তবে যদি বলে, তুমি আমার মায়ের মত, তোমাকে তালাক তাহলে যিহার ও তালাক উভয়টিই হয়ে যাবে। আর যদি বলে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম তাহলে মালেকী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে এ বাক্য তালাকের নিয়তে বলা হোক বা আদৌ কোনো নিয়ত না থাক এতে যিহার হবে।

যিহারের বাক্য সম্পর্কিত এ আলোচনায় এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদগণ যত আলোচনা করেছেন তা সবই আরবী ভাষায় বাক্য ও বাক্যরীতি সম্পর্কে। একথা সবারই জানা যে, পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষী লোকেরা যিহার করার সময় আরবী ভাষা ব্যবহার করবে না, কিংবা যিহার করার সময় আরবী বাক্য ও বাক্যাংশের হুবহু অনুবাদে উচ্চারণ করবে না। সুতরাং কোন শব্দ বা বাক্যাংশ যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা সে বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে ফিক্‌হবিদদের বর্ণিত বাক্যসমূহের কোনটির সঠিক অনুবাদ শুধু সেটিই বিচার বিবেচনা করা ঠিক হবে না; বরং শুধু এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, বক্তা বা শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি স্ত্রীকে যৌন সম্পর্কের দিক দিয়ে হারাম নারীদের কারো সাথে সুস্পষ্টভাবে তুলনা করেছে নাকি ঐ সব বাক্যের অন্য কোনো অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে? আরবী ভাষার أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّيْ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত বাক্যটি এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। ফিক্‌হবিদ এবং মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরবে যিহার করার জন্য এ বাক্যটিই ব্যবহার করা হতো এবং এ বাক্যটি সম্পর্কেই কুরআন মাজীদের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। সম্ভবত দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই যিহারকারী কোনো ব্যক্তি এমন বাক্য ব্যবহার করতে পারে না যা এই আরবী বাক্যটির হুবহু শাব্দিক অনুবাদ হতে পারে। তবে তারা নিজের ভাষার এমন সব বাক্য অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে যার অর্থ অবিকল তাই যা একজন আরব এইটি দ্বারা প্রকাশ করতো। একথাটি বলার অর্থ ছিল, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। অথবা কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে বসে যে, "আমি যদি তোমার কাছে যাই তাহলে আমার মায়ের কাছেই গেলাম।"

১৩. কুরআন মজীদের মধ্যে যে জিনিসকে কাফ্ফারা আবশ্যিক হওয়ার কারণ বলা হয়েছে তা শুধু যিহার করা নয়; বরং যিহারের পরবর্তী عَوْدٌ অর্থাৎ ব্যক্তি যদি শুধু যিহার করে এবং عَوْدٌ না করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো عَوْدٌ কি যা কাফ্ফারা দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? এ ব্যাপারে ফিক্হবীদদের মতামত নিম্নরূপ-

❖ হানাফীদের মতে عَوْدٌ অর্থ সহবাস করার ইচ্ছা। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শুধু ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করলেই কাফ্ফারা দেয়া জরুরি হবে। এমন কি ব্যক্তি যদি শুধু ইচ্ছা করেই থেমে থাকে এবং কার্যত কোনো পদক্ষেপ না নেয় তাহলেও তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে ব্যাপার এমন নয়; বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যে, ব্যক্তি যিহার করার দ্বারা স্ত্রীর সাথে একান্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে যে 'হুরতম' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল প্রথমে কাফ্ফারা তা দূর করে। কারণ এই 'হুরতম' বা নিষেধাজ্ঞা কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না।

❖ এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি মত আছে। তবে এ ব্যাপারে ওপরে হানাফীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে সেটিই মালেকীদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধি ও বিশুদ্ধতম মত। তাঁদের মতে যিহার দ্বারা স্বামী নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিল তা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সহবাসের সম্পর্ক। এরপর عَوْدٌ করা অর্থ পুনরায় তার সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফিরে যাওয়া।

❖ এ বিষয়ে উপরে দুই ইমামের যে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) মতও প্রায় অনুরূপ বলে ইবনুল কুদামা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, যিহার করার পর সহবাস হালাল হওয়ার জন্য কাফ্ফারা দেয়া শর্ত। যিহারকারী যে ব্যক্তিই তা হালাল করতে চায় সে যেন হারাম করে নেয়া থেকে ফিরতে চায়। তাই তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হালাল করে নেয়ার পূর্বে সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে নিজের জন্য হালাল করে নিতে চাইলে তাকে হালাল করার পূর্বে যেমন বিয়ে করতে বলা হবে এটা যেন ঠিক তাই।

❖ ইমাম শাফেয়ীর (র) মত এ তিনটি মতামত থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন, কারো নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তাকে পূর্বের মত স্ত্রী হিসেবে রাখা, কিংবা অন্য কথায় তাকে স্ত্রী হিসেবে কাছে রাখাটাই عَوْدٌ। কারণ, সে যে সময় যিহার করেছে সে সময় থেকেই যেন তাকে স্ত্রীকে হিসেবে রাখা হারাম করে নিয়েছে। সুতরাং সে যদি যিহার করার সাথে সাথেই তালাক না দিয়ে থাকে এবং তালাকের শব্দগুলো উচ্চারণ করার মত সময়টুকু পর্যন্ত তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখে তাহলে সে عَوْدٌ করলো এবং তার ওপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। এর অর্থ হচ্ছে, কেউ এক নিশ্বাসে যিহার করার পর পরবর্তী নিশ্বাসেই যদি তালাক না দেয় তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পরে তাকে

স্ত্রী হিসেবে না রাখার এবং দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত না হলেও কিছু এসে যায় না। এমনকি এর পর সে কয়েক মিনিট চিন্তাভাবনা করে যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ইমাম শাফেয়ীর (র) মতানুসারে তবুও তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

১৪. কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রী পরস্পর مَسٌّ স্পর্শ করার পূর্বেই যিহারকারীকে কাফ্ফারা দিতে হবে। এ আয়াতের উল্লেখিত مَسٌّ শব্দের অর্থ স্পর্শ করা এ বিষয়ে চার ইমামই একমত। সুতরাং কাফ্ফারা দেয়ার পূর্বেই শুধু সহবাসই হারাম নয়; বরং স্বামী কোনোভাবেই স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। শাফেয়ী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেন, যৌন ইচ্ছা সহ স্পর্শ করা হারাম। হাম্বলী মাযহাবের ফিক্হবিদগণ সব রকম উপভোগকেই না জায়েয বলেন। তাঁদের মতে এ অবস্থায় কেবল মুখমণ্ডল ও হাতের দিকে তাকানো যেতে পারে।

১৫. যিহার করার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে 'রিজয়ী'তালাকের ক্ষেত্রে 'রুজু' করার পরও কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। বায়েন তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে সে যদি তাকে পুনরায় বিয়ে করে তখনও স্পর্শ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিতে হবে। এমনকি যদি তিন তালাকও দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিতা হওয়ার পর বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা হয় এবং তারপর যিহারকারী স্বামী তাকে নতুন করে বিয়ে করে, তাহলেও কাফ্ফারা ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না। কেননা, মা বা অন্যান্য চিরনিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে স্ত্রীর সাদৃশ্য বর্ণনা করে সে ইতোপূর্বে একবার তাকে নিজের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। কাফ্ফারা ছাড়া সেই হারাম বা নিষিদ্ধাবস্থার অবসান ঘটা সম্ভব নয়। চার ইমামের সকলেই এ ব্যাপারে একমত।

১৬. যে স্বামী স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত তাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেহেতু দাম্পত্য সম্পর্ক চালু থাকা স্ত্রীর একটি অধিকার বিশেষ এবং তা থেকে স্বামী তাকে বঞ্চিত করেছে, তাই সে যদি কাফ্ফারা না দেয় তবে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত তার স্বামীকে সে বাধা অপসারণে বাধ্য করবে। যা সে নিজের ও তার স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড় করিয়েছে। আর যদি সে তা না মানে, তবে আদালত তাকে প্রহার বা কারাদণ্ড বা উভয় প্রকারের দণ্ড দিতে পারে। চার মাযহাবই এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, হানাফী মাযহাবের মতে স্ত্রীর জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আদালত যদি স্ত্রীকে এ সংকট থেকে উদ্ধার না করে তবে সে আজীবন ঝুলন্ত অবস্থায়ই থেকে যাবে। কেননা, হানাফী মাযহাব অনুসারে যিহার দ্বারা বিয়ে বাতিল হয় না; বরং কেবল স্বামীর সংগমের অধিকার রহিত হয়। মালেকী মাযহাবের স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্য যিহার করে ঝুলিয়ে রাখে। তাহলে সে ক্ষেত্রে "ইলার" বিধান বলবত হবে। অর্থাৎ সে চার মাসের বেশি স্ত্রীকে

আটকে রাখতে পারে না। আর শাফেয়ী মাযহাবের মতে যদিও স্বামী কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যিহার করলেই এবং সে মেয়াদ চার মাসের বেশি হলেই ইলার বিধান কার্যকর হবে। কিন্তু যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের স্বামী স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখলেই কাফ্ফারা দিতে হয়। তাই তার পক্ষে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ঝুলন্ত রাখা সম্ভব হয় না।

১৭. কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, যে যিহারের প্রথম কাফ্ফারা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। এটা করতে অসমর্থ হলেই দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা এবং তাতেও অসমর্থ হলে ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে আহার কারানো যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোনোটিই দিতে সমর্থন না হয়, তাহলে শরীয়াতের কাফ্ফারার অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে সে যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোনো একটি দেয়ার সমর্থ লাভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এ ধরনের ব্যক্তি যাতে তৃতীয় কফ্ফারাটি দিতে পারে সে জন্য তাকে সাহায্য করা উচিত। যারা নিজেদের ভুলের কারণে এরূপ সমস্যার জালে আটকা পড়েছিল এবং এ তিন প্রকারের কাফ্ফারার কোনোটিই দিতে সমর্থ ছিল না। তাদেরকে রাসূল ﷺ বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করেছিলেন।

১৮. পবিত্র কুরআনের কাফ্ফারা হিসেবে যে কোনো পরাধীন মানুষকে মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে চাই সে দাস হোক অথবা দাসী হোক। এ ক্ষেত্রে দাস-দাসীর বয়সেরও কোনো কড়াকড়ি নেই। দুধ খাওয়া শিশুও যদি গোলামীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে তবে তার মুক্তির ব্যবস্থা করাও কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট। তবে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের দাস-দাসী মুক্ত করা চলবে, না শুধু মুসলিম দাস-দাসী মুক্ত করতে হবে, সে ব্যপারে মুসলিম ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও যাহেরী মাযাহাবের মতানুসারে দাস-দাসী মুসলিম কিংবা অমুসলিম যাই হোক না কেন, তাকে মুক্ত করা যিহারের কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, কুরআন মজীদে শর্তহীনভাবে কেবল পরাধীন মানুষকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। তাকে মুসলমানই হতে হবে একথা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব এ দাস-দাসীর মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করে। অন্য যেসব কাফ্ফারায় কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র মুসলিম দাস-দাসীকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আলোচ্য কাফ্ফারাকেও এ তিন মাযহাবে সেসব কাফ্ফারার সমপর্যায়ের বলে কিয়াস করা হয়েছে।

১৯. দাস-দাসী মুক্ত করা সম্ভব না হলে কুরআনের বিধান হলো- স্বামী স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই যিহারকারীকে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।

২০. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তৃতীয় কাফ্ফারাটি (৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো) শুধুমাত্র সে ব্যক্তিই দিতে পারে যার দ্বিতীয়টি দেয়ার সামর্থ নেই। (অর্থাৎ দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা)।

২০. সূরা আল মুমতাহিনা (سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ)

আয়াত : ১৩ রুকু : ২ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার ১০ নং আয়াতের 'ফামতাহিনু' শব্দ থেকে নামটি চয়ন করা হয়েছে। ঐ আয়াতের হুকুম করা হয়েছে যে, মক্কা থেকে যে সব মহিলা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে, তারা সত্যিকার ঈমান আনার কারণেই হিজরত করেছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে। 'মুমতাহিনা' অর্থ যেসব মহিলাকে পরিক্ষা করে দেখা উচিত। এর মূল শব্দ হলো ইমতিহান বা পরীক্ষা (যাচাই)।

নাযিলের সময়

এ সূরা এমন দুটো ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যা ইতিহাসে বিখ্যাত। তাই এর নাযিলের সময়কাল সঠিকভাবে জানা সহজ।

প্রথমত : হাতিব বিন আমি বালতায়া (রাঃ) নামক এক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর মক্কা অভিযানের খবর কুরাইশদেরকে জানানোর জন্য গোপনে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের কিছু আগেই ঘটে থাকবে।

দ্বিতীয়ত : এ সূরায় হিজরতকারী মহিলাদের কথা বলা হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয় পর্যন্তই হিজরত চালু ছিল। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের কিছু আগেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ। যেমন-

- প্রথম অংশ সূরার শুরু থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। সূরার সমাপ্তি পর্বের ১৩ নং আয়াতটিও এর সাথে সম্পর্কিত। হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্ট করেছিলেন। এটি যথাসময়ের ব্যর্থ করে দেয়া না গেলে মক্কা বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তপাত হতো। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতো এবং কুরাইশদেরও এমন বহু লোক মারা যেতো, যাদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে ইসলামের ব্যাপক খেদমত পাওয়ার ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজিত হলে যেসব সুফল অর্জিত হতে পারতো তা সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এসব বিরাট ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদেরই এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এ আয়াতে হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মারাত্মক এই ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত

ঈমানদারদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো ঈমানদারের কোনো অবস্থায় কোনো উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং এমন কোনো কাজও না করা উচিত যা কুফর ও ইসলামের সংঘাতে কাফেরদের জন্য সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফের কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও নির্যাতনমূলক কোনো আচরণ করছে না তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করায় কোনো দোষ নেই।

- ১০ ও ১১ আয়াত হলো, সূরাটির দ্বিতীয় অংশ। সেই সময় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করছিল এমন একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে এ অংশে। মক্কায় বহু মুসলমান মহিলা ছিল যাদের স্বামীরা ছিল কাফের। এসব মহিলা কোনো না কোনোভাবে হিজরত করে মদীনায় এসে হাজির হতো। অনুরূপ মদীনায় বহুসংখ্যক মুসলমান পুরুষ ছিল যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের এবং তারা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। এসব লোকের দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিতো। আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ে চিরদিনের জন্য ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও মুশরিক স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে রাখা জায়েজ নয়। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফলের ধারক।
- ১২ নং আয়াত হলো সূরাটি তৃতীয় অংশ। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের আরব সমাজে যেসব বড় বড় দোষ-ত্রুটি ও গোনাহের কাজ নারী সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করবে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে এবং এ বিষয়েও অঙ্গীকার নিতে হবে যে, আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যেসব কল্যাণ ও সুকৃতির পথ, পন্থা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার আদেশ দেয়া হবে তা তারা মেনে চলবে।

রাসূলের নিকট নারীদের আনুগত্যের শপথ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ : হে নবী! মু'মিন নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়'য়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা মুমতাহানা : আয়াত-১২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে মুসলিম নারীদের থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ শপথ ছিল ঈমান ও আকায়িদসহ শরীয়তের বিধান পালনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। পূর্ববর্তী আয়াতে যদিও এ শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষা পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষায় ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং সকল মুসলিম নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ গ্রহণ করেছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে উমায়মা বর্ণনা করেন, আমি এবং আরও কয়েকজন মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এ বাক্য ও উচ্চারণ করেন,

فِيْمَا اسْتَطَعْنَ وَاَطَقْتُنَّ অর্থাৎ আমরা এসব বিষয়ে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। উমায়মা এরপর বলেন, এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশি ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না। (তাফসীরে মাযহারী)

আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজিত হলে কুরাইশরা বাইয়াতের জন্য দলে দলে রাসূলুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে হাজির হতে থাকল। তিনি নিজে সাফা পাহাড়ের ওপর পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহিলাদের 'বাইয়াত' গ্রহণ এবং এ আয়াতে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতে উমরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিলেন। (ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে ইবনে জারীর কাতাদার বর্ণনা সূত্রে ইবনে হাতেম)।

এরপর তিনি মদীনায় ফিরে গিয়ে আনসারী মহিলাদের এক জায়গায় জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য উমরকে রাদিআল্লাহু আনহু পাঠালেন। (ইবনে জারীর, ইবনে মারদইয়া, বাযযার, ইবনে হিব্বান উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার বর্ণনা সূত্রে) তিনি ঈদের দিনেও পুরুষদের সমাবেশে বক্তৃতা করার পর মহিলাদের সমাবেশে গিয়েছিল এবং সেখানেও বক্তৃতার মধ্যে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এর মধ্যে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে সেসব বিষয়ে তিনি মহিলাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। (বুখারী ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে) এসব ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মহিলারা ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও তাঁর কাছে হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করত যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

মক্কায় যে সময় মহিলাদের নিকট থেকে বাইয়াত নেয়া হচ্ছিল সেই সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এই নির্দেশটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান কিছুটা কৃপণ প্রকৃতির লোক। আমি যদি তাকে না জানিয়ে আমার এবং আমার সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সম্পদ থেকে কিছু নেই তাতে কি আমার কোনো গোনাহ্ হবে? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে থেকে। অর্থাৎ ঠিক এতটা অর্থ নাও যা প্রকৃত অর্থে বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট। (আহকামূল কুরআন, ইবনে আরাবী)।

রাসূল ﷺ-এর যুগের মুসলিম নারীগণ তাঁর কাছে যেসব বিষয়ে শপথ করেছিলেন, আয়াতে বর্ণিত সেসব বিষয়াবলি নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর সাতে কাউকে শরীক না করা, নির্ভেজাল তাওহীদী জিন্দেগী যাপন করা।
২. 'চুরি না করা' আবু সুফিয়ানের স্ত্রী এ বিষয়েরই ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে। নারীদের অনেকেই স্বামীর অর্থ-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্থ ছিল বিধায় বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ছিল।
৩. যিনা বা ব্যভিচার না করা– নারীরা এ ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা রাখতে পারলে পুরুষদের জন্য আত্মরক্ষা করাও সহজতর হতে পারে।
৪. নিজেদের সন্তানদের হত্যা না করা। জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অমানবিক কাজের প্রচলন ছিল বিধায় মুসলিম নারীদের তা থেকে কঠোরভাবে বারণ করা হয়।
৫. মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ থেকে বিরত থাকা। এ বুহ্তান বা অপবাদ সম্বলিত আয়াতে দু'ধরনের মিথ্যা দোষারোপ বুঝায়।
   - কোনো নারীর অন্য কোনো নারীর প্রতি পরপুরুষের সাথে প্রেম-প্রণয় করার অপবাদ করা এবং এ ধরনের কল্পকাহিনী মানুষের মধ্যে ছড়ান। কারণ এসব কথা বলে বেড়ানোর একটা রোগ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়।

- কোনো নারীর অন্য পুরুষদের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে স্বামীকে বিশ্বাস করানো যে, সেটা তারই সন্তান- এটাও অপবাদের অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছেন যে, যে নারী কোনো পরিবারে এমন কোনো সন্তান প্রবেশ করায় যে সেই বংশের সন্তান নয় সেই নারীর আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

সংক্ষিপ্ত এই আয়াতাংশে আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

প্রথম বিষয়টি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের ব্যাপারেও "ভাল কাজে আনুগত্য করা" কথাটি যোগ করা হয়েছে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনো মুনকার বা মন্দ কাজের নির্দেশও দিতে পারেন। এভাবে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর আইন ও নির্দেশের বাইরে গিয়ে পৃথিবীতে কোনো মানুষের আনুগত্য করা যেতে পারে না। কারণ আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও যখন মারূফ বা ভাল কাজ হওয়ার শর্তযুক্ত করা হয়েছে তখন শর্তহীন আনুগত্য লাভের মর্যাদা অন্য কারো কীভাবে থাকতে পারে। কিংবা তার এমন কোনো নির্দেশ অথবা আইন অথবা নিয়ম-কানুন এবং আচার অনুষ্ঠানের আনুগত্য কীভাবে করা হবে যা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী? এই মৌলিক নীতিটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না। মারূফ বা সৎ কাজেই কেবল আনুগত্য করা যেতে পারে। (মুসলিম, আবু দাউদ নাসায়ী)।

বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীগণ এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে এই বিষয়টিকেই গ্রহণ করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, তারা যেন আদৌ তোমার নাফরমানী না করে; বরং বলেছেন যে, মারূফ বা ভাল কাজে তারা যেন তোমার নাফরমানী না করে। আল্লাহ তা'আলা যখন নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত এ শর্ত যুক্ত করেছেন তখন মারূফ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে অন্যদের আনুগত্য করা যাবে তা কি করে হতে পারে। "(ইবনে জারীর)।

ইমাম আবু বকর জাসস্‌স লিখেছেন, আল্লাহ্ জানতেন, তাঁর নবী মারূফ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে মারূফ বা ভাল কাজের শর্ত আরোপ করেছেন। যাতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক নির্দেশ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কখনো কোনো রাজশক্তির আনুগত্যের অবকাশ খুঁজে বের করতে না পারে।

কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল।পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, বাইয়াত গ্রহণকারী নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করত। কিন্তু মহিলাদের থেকে বইয়াত গ্রহণের সময় তিনি কখনো তাঁর হাত দিয়ে কোনো মহিলার হাত ধরেননি; বরং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তা নীচে বর্ণনা করছি-

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আল্লাহর শপথ, বাইয়াত গ্রহণের সময় নবীর ﷺ হাত কোনো মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি। মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি মুখে শুধু একথাটুকু বলতেন যে, আমি তোমার থেকে বাইয়াত নিয়েছি। "(বুখারী , ইবনে জারীর)।

"উমাইমা বিনতে রুকাইকা বলেন, আমি আরো কয়েকজন মহিলার সাথে বাইয়াতের জন্য নবীর ﷺ খেদমতে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। যখন আমরা বললাম, মারূফ বা ভাল কাজে আমরা আপনার নাফরমানী করব না। "তখন তিনি বললেন, "যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ও সাধ্যে কুলাবে। "আমরা বললাম, আমাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশি দয়াপরবশ। "তারপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করব। তিনি বললেন, আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। আচ্ছা, আমি তোমাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি। সুতরাং তিনি আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। আর একটি হাদীসে তাঁর বর্ণনা হলো, নবী ﷺ আমাদের মধ্যকার কোনো মহিলার সাথেই মোসাফাহা করলেন না।

(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)।

আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে শা'বী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবীর ﷺ দিকে একখানা কাপড় এগিয়ে দেয়া হলো। তিনি শুধু তা হাতে নিলেন এবং বললেন, আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। ইবনে আবী হামেব, শা'বী থেকে, আবদুর রাযযাক নাখয়ী থেকে এবং সায়ীদ ইবনে মনসূর কায়েস ইবনে আবী হাযেম থেকে প্রায় একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক মাগাযীতে আবান ইবনে সালেহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবী ﷺ পানির একটি পাত্রে নিজের হাত ডুবাতেন এবং মহিলারাও সেই একই পাত্র হাত ডুবাতো।

বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদের খুতবা দেয়ার পর নবী ﷺ পুরুষদের কাতারের মধ্যে দিয়ে মহিলারা যেখানে বসে ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে বক্তৃতা করার সময় তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পড়লেন। তারপর মহিলাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো? সমাবেশের মধ্যে থেকে এক মহিলা জবাব দিল হ্যাঁ , হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর এবং বাযযার প্রমুখের একটি রেওয়ায়াতের উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ ঘরের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরা ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এ বক্তব্য থেকে একথা বুঝা যায় না যে, মহিলারা তাঁর সাথে মোসাফাহাও করেছিল। কেননা, উম্মে আতিয়া মোসাফাহা করার কথা স্পষ্ট করে বলেননি। সম্ভবত সে সময় অবস্থা ছিল এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় নবী ﷺ বাইরে থেকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবেন এবং ভেতর থেকে মহিলারাও প্রত্যেকে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের কারো হাতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত স্পর্শ করেনি।

২১. সূরা আত তাগাবুন (سُوْرَةُ التَّغَابُنِ)

আয়াত : ১৮ রুকু : ২ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার ৯ নং আয়াতে 'তাগাবুন' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

মুকাতিল এবং কালবী বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আতা ইবনে ইয়াসির বলেন, প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যদিও সূরার মধ্যে এমন কোনো ইশারা-ইংগীত পাওয়া যায় না। যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমতি হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানী যুগের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য এবং কিছুটা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। বক্তব্যের ধারাক্রম হচ্ছে, প্রথম চার আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ৫ থেকে ১০ আয়াতে যারা কুরআনের দাওয়াত মানে না তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে চারটি মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

- প্রথমত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহান যেখানে তোমরা বসবাস করছো তা আল্লাহহীন নয়; বরং সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী এমন এক আল্লাহ এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক যিনি যে কোনো বিচারে পূর্ণাঙ্গ এবং দোষত্রুটি ও কলুষ-কালিমাহীন। এ বিশ্ব-জাহানের সবকিছুই তাঁর সে পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটিহীনতা এবং কলূষ-কালিমাহীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।
- দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এর সৃষ্টিকর্তা একে সরাসরি সত্য, ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থেকো না যে, এই বিশ্ব-জাহান অর্থহীন এক তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে এর সূচনা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তা শেষ হয়ে যাবে।

- তৃতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কুফর ও ঈমান গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা কোনো নিষ্ফল ও অর্থহীন ব্যাপার নয় যে, তোমার কুফরী অবলম্বন করো বা ঈমান অবলম্বন করো কোনো অবস্থাতেই এর কোনো ফলাফল প্রকাশ পাবে না। তোমরা তোমাদের এই ইখতিয়াত ও স্বাধীনতাকে কীভাবে কাজে লাগাও আল্লাহ তা দেখেছেন।
- চতুর্থত বলা হয়েছে, তোমরা দায়িত্বহীন নও বা জবাবদিহির দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেই সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্ব-জাহানের সবকিছু সম্পর্কেই অবহিত। তোমাদের কোনো কথাই তাঁর কাছে গোপন নয়, মনের গহীনে লুক্কায়িত ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তাঁর কাছে সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

বিশ্ব-জাহান এবং মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এই চারটি মৌলিক কথা বর্ণনা করার পর বক্তব্যের মোড় সেই সব লোকদের প্রতি ঘুরে গিয়েছে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের সেই দৃশ্যপটের প্রতি তাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব ইতিহাসে একের পর এক দেখা যায়। অর্থাৎ এক জাতির পতনের পর আরেক জাতির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে সে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার বিবেক -বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইতিহাসের এ দৃশ্যপটে হাজারো কারণ উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পেছনে কার্যকর প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মৌলিক কারণ শুধু দুটি-

১. আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব রাসূল পাঠিয়েছিলেন তারা তাদের কাথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করে একটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

২. তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে মনে করে নিয়েছে যে, এই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এ জীবন ছাড়া এমন আর কোনো জীবন নেই যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস তাদের জীবনের সমস্ত আচার-আচরণকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, কর্মের কলুষতা ও নোংরামি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করেছে। মানব ইতিহাসের এ দুটি শিক্ষামূলক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে ন্যায় ও সত্য অস্বীকারকারীদের আহবান জানানো হচ্ছে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর তারা যদি অতীত জাতিসমূহের অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায় তাহলে আল্লাহ তার রাসূল

এবং কুরআন মজীদ আকারে হিদায়াতের যে আলোকবর্তিকা আল্লাহ দিয়েছেন তার প্রতি যেন ঈমান আনে। সাথে সাথে তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে যে, সেদিন অবশ্যই আসবে যখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের হার-জিতের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর কে ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করেছিল আর কে কুফর ও মিথ্যার পথ অনুসরণ করেছিল তার ভিত্তিতেই সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। প্রথম দলটি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং দ্বিতীয় দলটির ভাগে পড়বে স্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর ঈমানের পথ অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্য করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন-

❖ দুনিয়াতে যে বিপদ-মুসিবত আসে তা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমেই আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে যাবে, তার বিপদ-মুসিবত তো মূলত আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া দূরীভূত হবে না; তবে সে আরো একটি বড় মুসিবত ডেকে আনবে। তাহলো, তার মন আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

❖ শুধু ঈমান গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ নয়; বরং ঈমান গ্রহণ করার পর তার উচিত কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। সে যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিজের ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বিধান পৌঁছিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

❖ এক মু'মিন বান্দার ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি অথবা পৃথিবীর অন্য কোনো শক্তির ওপর না হয়ে কেবল আল্লাহর ওপর হতে হবে।

❖ মু'মিনের জন্য তার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতি একটা বড় পরীক্ষা। কারণ ঐগুলোর ভালবাসাই মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে যাতে করে তারা পরোক্ষ কোনোভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পথের ডাকাত ও লুটেরা হয়ে না বসে। তাছাড়া তাদের উচিত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা যাতে তাদের মন-মানসিকতা অর্থ পূজার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

❖ প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্যানুসারে শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে তার শক্তি ও সামর্থের অধিক কিছু করার দাবী করেন না। তবে একজন মু'মিনের যা করা উচিত তাহলো, সে তার সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতে কোনো ত্রুটি করবে না এবং তার কথা, কাজ ও আচার-আচরণ তার নিজের ত্রুটি ও অসাবধানতার জন্য যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম না করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুমিনদের স্ত্রী-সন্তানরাও তাদের শত্রু হয়ে যায়

يَآ اَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ وَاَوۡلَادِكُمۡ عَدُوًّا لَّـكُمۡ فَاحۡذَرُوۡهُمۡ‌ ۚ وَاِنۡ تَعۡفُوۡا وَتَصۡفَحُوۡا وَتَغۡفِرُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ. اِنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَاَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ‌ ؕ وَاللّٰهُ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ.

অর্থ : হে সেই সব লোক যারা ঈমান এসেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ্ অতিব ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু। তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা। আর কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আছে বিরাট প্রতিদান। (সূরা আত তাগাবুন : আয়াত : ১৪-১৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের দুটি অর্থ। একটি অর্থ অনুসারে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে, স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। ঈমান ও সত্য সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের পুরোপুরি বন্ধু ও সহযোগী হতে পারে একজন স্বামীর এরূপ স্ত্রী, একজন স্ত্রীর এরূপ স্বামী লাভ করা এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও চরিত্রের দিক দিয়ে সকল সন্তান-সন্ততিই চোখ জুড়ানোর মত হওয়া, পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে থাকে; বরং সাধারণত দেখা যায় যে, স্বামী যদি নেক্কার ও ঈমানদার হয় তাহলে সে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লাভ করে থাকে যারা তার দীনদারী, আমানতদারী এবং সততাকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। তারা চায় যে, তাদের স্বামী ও পিতা তাদের জন্য জাহান্নাম খরিদ করুক এবং হালাল ও হারামের বাছবিচার না করে যে কোন পন্থায় আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফূর্তি এবং গোনাহ ও পাপের উপকরণ এনে দিক। কোনো কোনো সময় আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটে থাকে। একজন নেক্কার ঈমানদার নারীকে এমন স্বামীর পাল্লায় পড়তে হয় যে স্ত্রীর শরীয়াত অনুসারে জীবন যাপন দুই চোখে দেখতে পারে না। আর সন্তানরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের গোমরাহী ও দুষ্কর্ম দ্বারা মায়ের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় যখন একজন মানুষের ঈমান দাবী করে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর দীনের জন্য সেই ক্ষতি স্বীকার করবে, দেশ ছেড়ে হিজরাত করবে কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করবে তখন তার পথে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনই সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের জন্য যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল এবং কোনো অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী যে কোনো

ব্যক্তির জন্য আজও দেখা দেয় এ আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থটি সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সেই সময় মক্কা মুয়াযযাম ও আরবের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যে, একজন লোক ঈমান এনেছে কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় শুধু তাই না; বরং তারা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট। যেসব মেয়েরা তাদের পরিবারে একাকী ইসলাম গ্রহণ করত, তাদের জন্যও ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

যেসব ঈমানদার নারী ও পুরুষ এ দুটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তাদের উদ্দেশ্য করে তিনটি কথা বলা হয়েছে-

- সর্বপ্রথম তাদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পর্কের দিক দিয়ে যদিও তারা মানুষের অতি প্রিয়জন কিন্তু দীন ও আদর্শের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'দুশমন'। তারা তোমাদের সৎকাজে বাধা দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, কিংবা তোমাদের ঈমানের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কুফরীর পথে সহযোগিতা করে কিংবা তারা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে মুসলমানদের সামরিক গোপণ তথ্য সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট থেকে যাই জানতে পারে তা ইসলামের শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। এর যে কোনো পন্থায়ই তারা দুশমনী করুক না কেন তাদের দুশমনীর ধরন ও প্রকৃতিতে অবশ্যই পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা দুশমনী। ঈমান যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেই বিচারে তাদেরকে দুশমনই মনে করতে হবে। তাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফর বা আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রাচীন আড়াল করে আছে।
- এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। অর্থাৎ তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজেদের পরিণাম তথা আখেরাতকে বরবাদ করো না। তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসাকে এতটা প্রবল হতে দিও না যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও আস্থা রেখো না যাতে তোমাদের অসাবধানতার কারণে মুসলমানদের দলের গোপনীয় বিষয়সমূহ তারা অবগত হয়ে যেতে পারে এবং তা দুশমনদের হাতে পৌঁছে যায়। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার সন্তান-সন্ততিরা তার সব নেকী ধ্বংস করে ফেলেছে"।
- সর্বশেষ বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এর অর্থ হলো, তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, তোমরা সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের আদর্শকে তাদের থেকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করবে। এই

সতর্কীকরণের অর্থ কখনো এ নয় যে, যা করতে বলা হলো তার চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে তোমারা স্ত্রী ও সন্তানদের মারতে শুরু করবে অথবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে অথবা সম্পর্ক এমন তিক্ত করে তুলবে যে, তোমাদের এবং তাদের পারিবারিক জীবন আযাবে পরিণত হবে। কারণ এরূপ করার দুটি স্পষ্ট ক্ষতি আছে। একটি হলো, এভাবে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ত্তির সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, এভাবে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এভাবে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টিতে মুসলামানদের আখলাক ও চরিত্রের এমন একটি চিত্র ভেসে উঠে যাতে তারা মনে করতে শুরু করে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সে নিজের ঘরের ছেলে মেয়েদের জন্য পর্যন্ত কঠোর ও বদমেজাজী হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ যখন সবেমাত্র মুসলমান হতো এবং যদি তাদের পিতামাতা কাফেরই থেকে যেত তাহলে একটি সমস্যা দেখা দিত এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন দীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। তাদের জন্য আরো একটি সমস্যা দেখা দিত তখন যখন তাদের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা (কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং সন্তানরা) কুফরকেই আঁকড়ে ধরে থাকত এবং সত্য দীনের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সূরা আনকাবূতের (১৮ আয়াত) এবং সূরা লোকমান (১৪ ও ১৫ আয়াত) এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে কখনো পিতামাতার কথা অনুসরণ করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এখানে দ্বিতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের দীনকে নিজের সন্তান-সন্ত্তির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করবে কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না; বরং নমনীয় আচরণ করো এবং ক্ষমা ও উদারতা দেখাও।

যে জিনিসটি সাধারণত মানুষের ঈমানী চেতনায় এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকাতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং যে জন্যে মানুষ প্রায়ই মুনাফেকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত লিপ্ত হয় সেটি হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থের প্রতি সীমাতিরিক্ত আগ্রহ। এ কারণে বলা হয়েছে এ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে অন্ধ হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও। অথচ এগুলো তো আসলে দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহে তোমাদের জন্যে পরীক্ষার সমগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে তোমরা পুত্র বা কন্যা বলে জানো প্রকৃতপক্ষে সে তো পরীক্ষার একটি বিষয়। আর যাকে তোমরা সম্পত্তি বা ব্যবসা বলে থাকে সেও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার আর একটি বিষয় মাত্র। এ জিনিসগুলো তোমাদের হাতে সোপর্দ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা অধিকার ও দায়-দায়িত্বের প্রতি কতদূর লক্ষ্য রেখে কাজ করো, দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে আবেগ তাড়িত হয়েও কতদূর সত্য ও সঠিক পথে চলা অব্যাহত রাখো, এবং পার্থিব বস্তুর

প্রেমাসক্ত নফ্সকে কতদূর নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরোপুরি আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং আল্লাহ তাদের যতটুকু অধিকার নির্ধারণ করেছেন ততটুকু আদায়ও করতে থাকো, এগুলোর মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখা হবে।।

এ ক্ষেত্রে তাবারানী আবু মালেক আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিও মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন, "তুমি যে শত্রুকে হত্যা করতে পারার কারণে সফল হলে কিংবা সে তোমাকে হত্যা করলে তুমি জান্নাত লাভ করলে সে তোমার আসল শত্রু নয়; বরং তোমার ঔরষজাত সন্তানই হয়তো তোমার আসল শত্রু। এরপর তোমার শত্রু হচ্ছে তোমার মালিকাধীন অর্থ সম্পদ।"তাই এখানে এবং সূরা আনফালের উভয় জয়গাতেই বলা হয়েছে যে, যদি তোমার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে তাদের প্রতি ভালবাসার ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।

২২. সূরা তালাক (سُوْرَةُ الطَّلَاقِ)

আয়াত : ১২ রুকূ : ২ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার নামই শুধু 'তালাক' নয়; বরং এটি এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে কেবল তালাকের হুকুম আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, সূরা বাকারার যেসব আয়াতে সর্ব প্রথম তালাক সম্পর্কিত হুকুম আহকাম দেয়া হয়েছে সেসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরার বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও তা প্রমাণ করে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়-কাল কোনটি তা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে এতটুকু অন্তত জানা যায় যে, লোকজন সূরা বাকারার বিধিনিষেধগুলো বুঝতে যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতও তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হতে থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এসব নির্দেশ নাযিল করলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইতিপূর্বে যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে এ সূরার নির্দেশাবলি বুঝার জন্য পুনরায় তা স্মৃতিতে তাজা করে নেয়া প্রয়োজন।

"তালাক দুইবার। এরপর স্ত্রীকে হয় উত্তমরূপে রাখবে, নয় ভালভাবে বিদায় করে দেবে"।

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা (তিন তালাকের পর) তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে, যদি তারা সংশোধনের আগ্রহী হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে (স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী"।

"এরপর সে যদি তৃতীয়বারের মত তালাক দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কারো সাথে সেই স্ত্রীর বিয়ে হওয়ার আগে সে আর তার জন্য হালাল হবে না।"

"তোমরা ঈমানদার নারীদের বিয়ে করে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও তাহলে তোমরা তাদের কাছে ইদ্দত পালন করার দাবী করতে পারো না। কারণ তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন জরুরি নয়"। "তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে বা অপেক্ষা করবে"।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যেসব নীতি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে-

❖ স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারে।

❖ এক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার

স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে করতে পারবে। এ জন্য তাহলীলের কোনো শর্ত প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আর স্বামীর থাকে না; বরং তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর ঐ স্ত্রীর অপর কোন পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া এবং ঐ স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্বামীর সাথে পুনরায় তার বিয়ে হতে পারে না।

❖ ঋতুস্রাব চালু আছে এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' হলো তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়া। এক তালাক বা দুই তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইদ্দত পালনের অর্থ হলো, স্ত্রীলোকটি এখনও তার দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে এবং ইদ্দতকালের মধ্যে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর এই ইদ্দত পালন তাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং শুধু এ জন্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

❖ দৈহিক মিলন হয়নি এমন কোনো স্ত্রীকে (স্পর্শ করার পূর্বে) যদি তালাক দেয়া হয়, তাকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে চাইলে তালাক প্রাপ্তির পরপরই বিয়ে করতে পারে।

❖ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়েছে তাকে চার মাস দশ দিন সময় কালের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে।

এখন এ কথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এসব বিধি-বিধানের কোনোটি বাতিল করা বা সংশোধন করার জন্য সূরা তালাক নাযিল হয়নি; বরং দুটি উদ্দশ্য পূরণের জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে।

- প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো, পুরুষকে তালাক দেয়ার যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগের জন্য এমন কিছু বিজ্ঞোচিত পন্থা বলে দেয়া, যার সাহায্য নিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিস্থিতি নাও আসতে পারে। আর বিচ্ছিন্ন হলেও যেন শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় তা হয় যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বুঝাপড়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ আল্লাহর শরীয়াতে তালাকের অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে। অন্যথায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে যে দাম্পত্য বন্ধন একবার কায়েম হয়েছে তা আবার ছিন্ন হয়ে যাক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। নবী ﷺ বলেছেন, "তালাকের চেয়ে অপছন্দনীয় আর কোনো জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেননি"। (আবু দাউদ)

  তিনি আরো বলেছেন, "সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক "। (আবু দাউদ)।

- দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, সূরা বাকারায় নাযিলকৃত বিধি-বিধান ছাড়া আরো যেসব বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ছিল তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে ইসলামের পারিবারিক আইনের এ দিক ও বিভাগটি পূর্ণতা দান করা। এমন স্ত্রীলোক কিংবা যাদের এখনো মাসিক আসেনি তারা তালাক প্রাপ্তা হলে তাদের ইদ্দত কী হবে, তা ছাড়া যেসব নারী গর্ভবতী হয়েছে তারা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত কী হবে তা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কীভাবে হবে এবং যেসব ছেলে মেয়ের পিতামাতা তালাকের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দুধপানের ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে তা এই সূরাতে বলা হয়েছে।

তালাকের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-নিষেধ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا.

অর্থ : হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তবে তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলো আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই যুলুম করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় বের করে দিবেন।

(সূরা তালাক : আয়াত-১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : তালাক দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করো না যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো ঝগড়া বিবাদ হওয়া মাত্রই রাগান্বিত হয়ে তালাক দিয়ে ফেললে এবং এক আঘাতে বিবাহ বন্ধনে এমনভাবে ছিন্ন করে ফেললে যে, ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগও আর অবশিষ্ট থাকলো না এমনভাবে তালাক দিও না; বরং স্ত্রীদের তালাক দিতে হলে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দাও। ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দেয়ার দুটি অর্থ আছে এবং এখানে দুটি অর্থই প্রযোজ্য-

একটি অর্থ হচ্ছে, ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায় এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তাদের ইদ্দত শুরু হয়ে থাকে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যেসব স্ত্রীলোকের স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এবং মাসিকও হয়ে থাকে তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়ার সময়-কালই তাদের ইদ্দত। এই নির্দেশের

প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দেয়ার অপরিহার্য যে অর্থ হতে পারে তা হচ্ছে স্ত্রীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া যাবে না। কারণ যে, ঋতুস্রাবকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে তার ইদ্দত সেই ঋতুস্রাব থেকে গণনা করা যাবে না। তাই এ অবস্থায় তালাক দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নারীর ইদ্দতের সময়-কাল তিন হায়েজের পরিবর্তে চার হায়েয হয়ে যায়। তাছাড়া এ নির্দেশের আরো একটি দাবী হলো যে 'তুহুরে'(স্ত্রী ঋতু থেকে পবিত্র থাকার অবস্থা) স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছে সেই 'তুহুরে' তালাক দেয়া যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়ার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কী না তা তাদের দু'জনের কেউ জানতে পারে না। এ কারণে অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেমন ইদ্দত গণনা শুরু হতে পারে না তেমনি মহিলাকে গর্ভবতী ধরে নিয়েও ইদ্দত গণনা হতে পারে না। সুতরাং এই নির্দেশটি একই সাথে দুটি বিষয় দাবী করে। একটি হলো, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে না। দ্বিতীয়টি হলো, তালাক দিতে হবে এমন, 'তুহুরে' সে 'তুহুরে' দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি কিংবা যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি জানা আছে। তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে এসব বাধ্যবাধকতার মধ্যে যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে তা একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই বুঝা যায়। ঋতু অবস্থায় তালাক না দেয়ার কল্যাণকর দিক হলো, এটি এমন এক অবস্থা যখন স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ থেকেও এটা প্রমাণিত যে, এই অবস্থায় নারীর মেজাজ স্বাভাবিক থাকে না। তাই সেই সময় যদি তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয় তাহলে তা মিটমাট করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে। আর পরিস্থিতিকে ঝগড়া-বিবাদ থেকে তালাক পর্যন্ত না গড়িয়ে যদি স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় তাহলে স্ত্রীর মেজাজ প্রকৃতি স্বাভাবিক হওয়া এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়েছেন তা তৎপর ও কার্যকর হয়ে পুনরায় দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। যে 'তুহুরে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহুরে'ই তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কল্যাণকর দিক হচ্ছে, সেই সময় যদি গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে স্বামী ও স্ত্রী কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব হয় না। তাই তা তালাক দেয়ার উপযুক্ত সময় নয়। আর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জানার পর যে নারীর গর্ভে তার সন্তান বেড়ে উঠেছে তাকে তালাক দেবে কি দেবে না সে সম্পর্কে পুরুষটি অন্তত দশবার ভেবে দেখবে। অপরদিকে নারীও তার নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ দূর করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা না করে অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি একথা জানতে পারে যে, গর্ভসঞ্চার হয়েছিল তাহলে উভয়কেই পরে অনুশোচনা করতে হবে।

এটা হচ্ছে ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার প্রথম তাৎপর্য। দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী এবং গর্ভধারণ সক্ষম নারীদের জন্য এটি প্রযোজ্য। এখন থাকলো এর দ্বিতীয়

তাৎপর্যটি। এ তাৎপর্যটি হলো, তালাক দিতে হলে ইদ্দত পর্যন্ত সময়ের জন্য তালাক দাও। অর্থাৎ একসাথে তিন তালাক দিয়ে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তালাক দিয়ে ফেল না; বরং এক বা বড় জোর দুই তালাক দিয়ে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করো যাতে এই সময়-কালের মধ্যে যে কোন সময় 'রুজু' করার বা ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ তোমার থাকে। এই তাৎপর্য অনুসারে এই নির্দেশটি দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী মহিলাদের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি যাদের ঋতু বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা এখনো যাদের ঋতু আসেনি অথবা তালাক দেয়ার সময় যাদের গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে জানা গেছে তাদের সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। আল্লাহর এই নির্দেশের অনুসরণ করলে তালাক দেয়ার পর কাউকেই পস্তাতে হবে না। কারণ এভাবে তালাক দিলে ইদ্দতের মধ্যে 'রুজু' করা বা ফিরিয়ে নেয়া যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পরেও পূর্বতন স্বামী-স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

বড় বড় মুফাস্সির উপরিউক্ত আয়াতংশের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা এই। এর তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে না এবং যে 'তুহুরে' স্বামী দৈহিক মিলন করেছে সে 'তুহুরে'ও দেবে না; বরং তাকে ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেবে। অতঃপর তাকে এক তালাক দেবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি রুজু নাও করে এবং এমতাবস্থায় ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কেবল এক তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে (ইবনে জারীর)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, "ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার অর্থ হলো, 'তুহুরে' তথা পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করেই তালাক দেবে"। আবদুল্লাহ ইবনে উমর, 'আতা, মুজাহিদ, মায়মুন ইবনে মাহরান মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং দাহহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে (ইবনে কাসীর)। ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন, "নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জেনে তালাক দেবে। দৈহিক মিলন হয়েছে এ অবস্থায় নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে না জেনে তালাক দেবে না"। (ইবনে কাসীর)। হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন, 'তুহুর' অবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে কিংবা গর্ভ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন তালাক দেবে। (ইবনে জারীর)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে মাসিক চলাকালে তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট করে এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রায় সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই এ ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়ে আইনের উৎস মূলত এটিই। ঘটনাটা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দাও। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তাকে স্ত্রী হিসেবেই রাখে। এরপর যখন তার মাসিক

হবে এবং তা থেকেও পবিত্র হবে তখণ যদি সে তাকে তালাক দিতে চায় তাহলে সেই পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে। মহান আল্লাহ যে ইদ্দতের জন্য তালাক দিতে বলেছেন এটিই সেই ইদ্দত"। একটি হাদীসের ভাষ্য হলো, "পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন তার গর্ভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে"।

বড় বড় সাহাবী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীসও এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের ওপর অধিক আলোকপাত করে। নাসায়ী হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺকে জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। একথা শুনে নবী ﷺ ক্রোধে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন,"আমি তোমাদের মধ্য বর্তমান থাকাতেই আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা হচ্ছে?"

এ ধরনের আচরণে নবী ﷺ-এর ক্রোধের মাত্রা দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি কি তাকে হত্যা করবো না? আবদুর রাযযাক উবাদা ইবনে সামেত সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা নিজের স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়ে ফেললে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "সে আল্লাহর নাফরমানি করেছে আর ঐ স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন নয় শত সাতানব্বই তালাক যুলুম ও সীমালংঘন হিসেবে অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ চাইলে এ জন্য তাকে আযাব দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করতে পারেন"।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তারিত যে বিবরণ দারুকুতনী ও ইবনে আবী শায়বা হাদীসগ্রন্থ দ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথাটিও আছে যে, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম তাহলেও কি ফিরিয়ে নিতে পারতাম। নবী ﷺ জবাব দিলেন, "না এ অবস্থায় সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। তবে এটি হতো একটি গোনাহের কাজ"। একটি হাদীসে নবীর ﷺ বক্তব্যের ভাষা বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "এরূপ করলে তুমি তোমার রবের নাফরমানি করতে। কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত"।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসব ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে তাও নবী ﷺ-এর বাণী ও নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল। আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়ে ফেলেছি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বিষয়ে তোমাকে কি ফতোয়া দেয়া হয়েছে। সে বলল, "আমাকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে"। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, "তারা ঠিকই বলেছে। তারা মাসায়ালার যে সমাধান দিয়েছে তাই ঠিক।" আবদুর রাযযাক ইবনে মাসউদকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল, আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯ তালাক দিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, "তিনটি তালাক তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলোই বাড়াবাড়ি"। ওয়াকী ইবনুল জাররাহ

তাঁর সুনান গ্রন্থে এটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উসমানের মত বলে উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি এসে উসমানকে বললযে, সে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়ে ফেলেছে। উসমান বললেন, "সে তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে"। আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সামনে অনুরূপ ঘটনা উপস্থাপিত হলে তিনি বলেছিলেন, "সে তো তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার অন্যসব স্ত্রীদের জন্য বন্টন করে দাও"। আবু দাউদ ও ইবনে জারীর কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ এ মর্মে মুজাহিদের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে বসেছিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস নীরব থাকলেন। এতে আমার ধারণা জন্মালো যে, হয়তো তিনি তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, "তোমরা একেকটি লোক তালাক দেয়ার ব্যাপারে প্রথমে বোকামি করে বসো এবং পরে এসে হে ইবনে আব্বাস! হে ইবনে আব্বাস বলতে থাক। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহর ভয় মনে রেখে কাজ করবে আল্লাহর তার জন্য সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার উপায় করে দেবেন। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করো নি। এখন আমি তোমার জন্য কোনো উপায় দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছো এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে"। মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে এবং তাফসীরে ইবনে জারীরে মুজাহিদ থেকেই আরো একটি হাদীস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দেয়ার পর ইবনে আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "তিন তালাক দ্বারা সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট ৯৭ তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহর আয়াতকে খেলার বস্তু বানিয়েছ"। এটি মুয়াত্তার ভাষা। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের যে ভাষা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে- "তুমি আল্লাহকে ভয় কর নি। আল্লাহকে ভয় করলে এই কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচার কোন উপায় আল্লাহ সৃষ্টি করতেন"। ইমাম তাহাবী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে বলল, আমার চাচা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার চাচা আল্লাহর নাফরমানি করে গোনায় লিপ্ত হয়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করেছে। তাই আল্লাহ তার জন্য এই কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ রাখেননি"।

আবু দাউদ ও মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নির্জনবাসের আগেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর আবার তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলো এবং এ উদ্দেশ্যে সে ফতোয়া জানতে বের হলো। হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকাইর বলেন, আমি তার সাথে ইবনে আব্বাসের ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে গেলাম। তাঁরা উভয়েই যে জবাব দিয়েছিলেন তাহলো "তোমার জন্য যে সুযোগ ছিল তা তুমি হাতছাড়া করে ফেলেছো"। জামাখশারী তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

যে, স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানকারী যে ব্যক্তিই উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে আসত তিনি তাকে প্রহার করতেন এবং তার প্রদত্ত তালাক কার্যকরী বলে গণ্য করতেন। সাঈদ ইবনে মনসূর আনাসের বর্ণনা থেকে সহীহ্ সনদে এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম যে সাধারণ মত পোষণ করতেন তা ইবনে আবী শায়বা ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবরাহীম নাখয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মতটি হলো- "সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু চাইতেন, স্বামী স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিক এবং তারপর তিনটি ঋতুকাল অতিবাহিত হোক"।

এটি ইবনে আবী শায়বার বক্তব্যের ভাষা। ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের ভাষা হলো, "একসাথে এক তালাকের বেশি না দেয়া এবং এভাবে ইদ্দত পূর্ণ হতে দেয়া ছিল সাহাবায়ে কিরামের পছন্দনীয় পন্থা"।

এসব হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও বক্তব্যের আলোকে কুরআন মাজীদের উপরিউক্ত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসলামী ফিক্হবিদগণ বিস্তারিত যে বিধান তৈরি করেছেন তা নীচে বর্ণনা করছি-

১. হানাফী ফিক্হবিদগণের মতে তালাক তিন প্রকার। যেমন- আহসান, হাসান এবং বেদয়ী। আহসান তালাক হলো- যে 'তুহুরে' স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি সেই 'তুহুরে' শুধু এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেবে। হাসান তালাক হলো- প্রত্যেক 'তুহুরে' একটি করে তালাক দেবে। এই নিয়মে তিন 'তুহুরে' তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। যদিও একটি তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেয়াটাই সর্বোত্তম। বিদআত তালাক হলো- ব্যক্তির এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া কিংবা একই 'তুহুরে' ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়া বা হায়েয অবস্থায় তিন তালাক দেয়া অথবা যে 'তুহুরে' সহবাস করেছে সেই 'তুহুরে' তিন তালাক দেয়া। সে এর যেটিই করুক না কেন গোনাহগার হবে। ঋতুবতী ও দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের জন্য এ বিধানটি প্রযোজ্য। এখন বাকি থাকে দৈহিক মিলন হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাকের ব্যাপারটি। এরূপ স্ত্রীকে 'তুহুর' ও 'হায়েয' উভয় অবস্থায় সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি এমন হয় যে, তার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাহলে মিলনের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা, তার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে সহবাসের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কারণ, তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই জানা আছে। কিন্তু এই তিন শ্রেণির স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার সুন্নাত পন্থা হলো এক মাস পর পর তালাক দেয়া। আর আহসান তালাক হলো, এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দেয়া।

(হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন-জাসসাস, উমদাতুল কারী)

➢ ইমাম মালেকের (র) মতেও তালাক তিন প্রকার যথা- সুন্নী , বিদয়ী মাকরূহ এবং বিদয়ী হারাম । সুন্নাত অনুসারে তালাক হলো, নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এমন সহবাসকৃত স্ত্রীকে 'তুহুর' অবস্থায় সহবাস না করে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দেয়া । বিদয়ী মাকরূহ তালাক হলো, যে 'তুহুরে' সহবাস করা হয়েছে সেই তুহুরে তালাক দেয়া, কিংবা সহবাস না করে এক 'তুহুরে' একাধিক তালাক দেয়া বা ইদ্দত পালনকালে ভিন্ন ভিন্ন তুহুরে তিন তালাক দেয়া অথবা একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া। আর বিদয়ী হারাম, তালাক হলো, ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া ।

(হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশশরাহিল কাবীর, আহকামূল কুরআন-ইবনুল আরাবী) ।

➢ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের (র) নির্ভরযোগ্য মত : হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন-তা হলো নিয়মিত মাসিক স্রাব হয় এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোককে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে 'তুহুর' অবস্থায় তার সাথে সহবাস না করে তালাক দিতে হবে এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়ার জন্য এই অবস্থায়ই রেখে দিতে হবে । তবে তাকে যদি তিন 'তুহুরে' আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়া হয় কিংবা একই 'তুহুরে' তিন তালাক দেয়া হয় বা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয় অথবা ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া হয় অথবা যে তুহুরে সহবাস করা হয়েছে সেই তুহুরেই' তালাক দেয়া কিন্তু তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ না পায় তাহলে এসব তালাক বিদআত ও হারাম । তবে নারী যদি এমন হয় যার সাথে সহবাস করা হয়নি অথবা সহবাস করা হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা ঋতুস্রাব এখানো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী, তাহলে তার ক্ষেত্রে না সময়ের বিবেচনায় সুন্নাত ও বিদআত বলে কোনো পার্থক্য আছে, না তালাকের সংখ্যার বিবেচনায় কোনো পার্থক্য আছে ।

(আল ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ আলা মাযাহাবি আহমাদ ইবনে হাম্বল) ।

➢ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে তালাককে সুন্নাত ও বিদআত হিসেবে পৃথক করা যেতে পারে কেবল সময়ের বিচারে, সংখ্যার বিচারে নয় । অর্থাৎ নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এবং দৈহিক মিলন হয়েছে এমন নারীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া অথবা গর্ভধারণে সক্ষম নারীকে যে তুহুরে সহবাস হয়েছে সেই তুহুরে তালাক দেয়া কিন্তু তার গর্ভবস্থায় প্রকাশ পায়নি, বিদআত ও হারাম । এরপর থাকে তালাকের সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়টি । এ ক্ষেত্রে একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা একই 'তুহুরে' বা ভিন্ন ভিন্ন 'তুহুরে' দেয়া হোক কোনো অবস্থায়ই তা সুন্নাতের পরিপন্থী নয় । আর দৈহিক মিলন হয়নি এমন নারী অথবা এমন নারী যার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পেয়েছে তাকে দেয়া তালাকের ক্ষেত্রে সুন্নাত বিদআতের প্রার্থক্য প্রযোজ্য নয় । (মুগনিউল মুহতাজ) ।

২. কোনো তালাক বিদআত, মাকরূহ, হারাম বা গোনাহের কাজ হওয়ার অর্থ চার ইমামের নিকট এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক মাসিক অবস্থায় দেয়া হয়ে থাকুক অথবা একসাথে তিন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, অথবা যে তুহুরে দৈহিক মিলন হয়েছে সেই তুহুরে দেয়া হয়ে থাকুক, কিন্তু গর্ভ প্রকাশ পায়নি অথবা কোনো ইমামের দৃষ্টিতে বিদআত এমন কোনো পন্থায় দেয়া হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় তা কার্যকরী হবে। আর তালাকদাতা ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ এ ব্যাপারে চার ইমামের সাথে মতানৈক্য পোষণ করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব এবং আরো কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর মতে যে ব্যক্তি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করে ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে অথবা একই সাথে তিন তালাক দেবে তার তালাক আদৌ কার্যকর হয় না। ইমামিয়া মাযাহাবের অনুসারীরাও এ মত পোষণ করেন। এ মতের ভিত্তি হলো, এরূপ করা যেহেতু নিষিদ্ধ এবং হারাম বিদআত তাই তা কার্যকর নয়। অথবা আমরা উপরে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি তাতে বলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে নবী ﷺ তাকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয়ে থাকবে তাহলে রুজু করার নির্দেশ দেয়ার কী অর্থ থাকতে পারে? তাছাড়া বহু সংখ্যক হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী ﷺ এবং বড় বড় সাহাবী একের অধিক তালাক দানকারীকে গোনাহগার বললেও তার দেয়া তালাককে অকার্যকর বলেননি।

তাউস ও ইকরিমা বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে সে ক্ষেত্রে শুধু এক তালাক কার্যকর হবে। ঈমাম ইবনে তাইমিয়া (র) ও এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছেন। একটি রেওয়ায়াত তাদের এ মতের উৎস ও ভিত্তি। রেওয়ায়াতটি হলো, আবুস সাহাবা ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন না রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু সময়ে এবং উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো? "তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ (বুখারী ও মুসলিম)।

তাছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছেযে, রসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে এবং উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে প্রথম দুই বছরে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো। পরবর্তী সময়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে, মানুষ এমন এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে, যে বিষয়ে ভেবে চিন্তেও বুঝে সুজে কাজ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এখন আমরা তাদের এ কাজকে কার্যকর করবো না কেন? সুতরাং তিনি তা কার্যকর বলে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু কয়েকটি কারণে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত কয়েকটি রেওয়ায়াত অনুসারে ইবনে আব্বাসের নিজের ফতোয়াই এর পরিপন্থী ছিল। এ কথা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয়ত এ মতটি নবী ﷺ এবং বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণিতযেসব হাদীসে তিন তালাক দানকারী সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, তার

দেয়া তিন তালাকই কার্যকর হবে তার পরিপন্থী। আমরা ওপরে ঐ হাদীসগুলোর উদ্ধৃত করেছি। তৃতীয়ত ইবনে আব্বাসের নিজের রেওয়ায়াতে থেকে জানা যায় , উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কিরামের রাদিয়াল্লাহু আনহুম সমাবেশে তিন তালাক কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সে সময় বা পরবর্তীকালে কোনো সময়ই সাহাবীদের মধ্যে থেকে কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। এখন কথা হলো, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাতের পরিপন্থী কোনো কাজ করেছেন এ কথা কি মেনে নেয়া যেতে পারে। আর সে বিষয়ে সমস্ত সাহাবী নিশ্চুপ থাকবেন এ কথাও কি মেনে নেয়া যেতে পারে? তাছাড়া রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদের ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইমাম শাফেয়ী (র) , দারেমী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, রুকান তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হলফ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্যিই কি তার এক তালাক দেয়ার নিয়ত ছিল? (অর্থাৎ অন্য দুটি তালাক প্রথম তালাকটির ওপর জোর দেয়া এবং গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল এবং তিন তালাক দিয়ে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না) তিনি হলফ করে এ বর্ণনা দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন প্রকারের তালাকসমূহকে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো তার প্রকৃতি এসব ঘটনা থেকে জানা যায়। এ কারণে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, যেহেতু প্রাথমিক যুগে দীনি ব্যাপারে মানুষের মধ্যে খিয়ানত প্রায় ছিল না বললেই চলে তাই তিন তালাক দানকারীর এ বক্তব্য মেনে নেয়া হতো, যে তার প্রকৃত নিয়ত ছিল এক তালাক দেয়ার। অন্য দুটি তালাক প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার জন্যই তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু উমর দেখলেন যে, মানুষ তাড়াহুড়া করে প্রথমে তিন তালাক দিয়ে বসে এবং পরে প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার বা গুরুত্ব আরোপ করার বাহানা করে। তাই তিনি এ বাহানা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইমাম নববী ও ইমাম সুবকী এ ব্যাখ্যাটিকে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের উত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। শেষ কথা হলো, ইবনে আব্বাসের বক্তব্য সম্পর্কে আবুস সাহবা বলে কর্তৃক যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী, আবুস সাহবা থেকে অপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করায় ইবনে আব্বাস বললেন, "নির্জন বাসের পূর্বেই কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে এবং উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগের প্রথম দিকে তাকে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো "। এভাবে একই বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস থেকে দুটি পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। এই পরস্পর বিরোধীতা দুটি রেওয়ায়াতকেই দুর্বল করে দেয়।

৩. স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালে তালাকদাতাকে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ রুজু' করার আদেশ দিয়েছিলেন তাই এ নির্দেশকে কোন অর্থে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আওযায়ী, ইবনে আবী লায়লা, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওর বলেন, "ঐ ব্যক্তিকে 'রুজু' করার নির্দেশ দেয়া হবে তবে 'রুজু' করতে বাধ্য করা হবে না"। (উমদাতুল কারী)। হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুসারে 'রুজু' করা শুধু মুস্তাহাব নয়; বরং ওয়াজিব। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মাসিক চলাকালে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কিন্তু তিন তালাক দেয়নি তার জন্য সুন্নাত পন্থা হলো, সে রুজু করবে এবং এর পরবর্তী তুহ্‌রেই তালাক না দিয়ে তা অতিবাহিত হতে দেবে এবং তা অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী পুনরায় যখন মাসিক থেকে পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দেবে, যাতে ঋতুকালে প্রদত্ত তালাক থেকে 'রুজু' করা খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। আল ইনসাফ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, এ অবস্থায় তালাক দানকারীর জন্য 'রুজু' করা মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালেক ও তাঁর সঙ্গীদের মতে ঋতু চলাকালে তালাক দেয়া পুলিশের হস্তক্ষেপ যোগ্য অপরাধ। স্ত্রী দাবী করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় শাসকের অবশ্য কর্তব্য হলো যখন কোনো ব্যক্তির এ ধরনের কাজ সম্পর্কে তিনি জানতে পারবেন তখনই তাকে 'রুজু' করতে বাধ্য করবেন এবং ইদ্দতের শেষ সময় পর্যন্ত তাকে চাপ দিতে থাকবেন। সে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বন্দী করবেন। এরপরও অস্বীকৃতি জানালে প্রহার করবেন। তারপরও সে যদি না মানে তাহলে শাসক নিজেই সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাসক বা বিচারকের এই সিদ্ধান্ত 'রুজু' বলে গণ্য হবে। এরপর স্বামীর রুজু করার নিয়ত থাক বা না থাক তার জন্য ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস বৈধ হবে। কারণ শাসক বা বিচারকের নিয়ত তার নিয়তের বিকল্প (হাশিয়াতুদ দুসুকী)। মালেকীরা এ কথাও বলেন যে, যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালে প্রদত্ত তালাক থেকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় রুজু করেছে সে যদি তালাক দিতেই চায় তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব পন্থা হলো, সে যে হায়েজে তালাক দিয়েছে তার পরের 'তুহ্‌রেই' তালাক দেবেনা; বরং পুনরায় হায়েজ আসার পর যখন পবিত্র হবে তখন তালাক দেবে। তালাকের পরবর্তী তুহ্‌রেই তালাক না দেয়ার নির্দেশ মূলত এজন্য দেয়া হয়েছে যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দানকারীর 'রুজু' করা যেন কেবল মৌখিক না হয়; বরং স্ত্রীর পবিত্রতার সময় তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলিত হওয়া উচিত। তারপর যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহ্‌রে' তালাক দেয়া যেহেতু নিষিদ্ধ তাই তালাক দেয়ার সঠিক সময় তার পরবর্তী 'তুহ্‌রে'। (হাশিয়াতুদ দুসুকী)।

৪. 'রজয়ী' তালাকদাতার জন্য 'রুজু' করার সুযোগ কতক্ষণ? এ বিষয়েও ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতের ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ অর্থ তিন হায়েজ না তিন 'তুহুর' এ প্রশ্নের ভিত্তিতেই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র) এবং ইমাম মালেকের (র) মতে قُرُوْءٌ শব্দের অর্থ তুহুর'। আয়েশা, ইবনে উমর এবং যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মত হলো, قُرُوْءٌ শব্দের অর্থ হায়েজ। এটিই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নির্ভরযোগ্য মত। খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ, উবাই ইবনে কা'ব, মু'য়ায ইবনে জাবাল' আবুদ দারদা, উবাদা ইবনে সামেত এবং আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে শা'বীর উক্তির উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ১৩ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরাও সবাই এমত পোষণ করেছেন। তাছাড়া বহু সংখ্যক তাবেয়ীও এ মত পোষণ করেছেন।

এ মতভেদের ওপর ভিত্তি করে শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে তৃতীয় হায়েজ শুরু হওয়া মাত্রই স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায় এবং স্বামীর রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ঐ হায়েজ ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে না; বরং চতুর্থ হায়েজ শুরু হওয়া মাত্র ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ, হাশিয়াতুদ দুসুকী)। হানাফীদের মত হলো তৃতীয় হায়েজের দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে নারী গোসল করুক বা না করুক তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। আর যদি দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয় তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের পুরো সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতকাল শেষ হবে না। পানি না থাকার পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে নারী যখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে তখন স্বামীর রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মাদের মতে তায়াম্মুম করা মাত্রই রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে। (হিদায়া)। ইমাম আহমাদের নির্ভরযোগ্য যে মতটি সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী একমত তা হচ্ছে, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় হায়েজ থেকে মুক্ত হয়ে গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে (আল ইনসাফ)।

রুজু কীভাবে হয় আর কীভাবে হয় না? এ মাসায়ালার ক্ষেত্রে ফিকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দিয়েছে স্ত্রী সম্মত হোক বা না হোক ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে যখন ইচ্ছা 'রুজু' করতে পারে।

কেননা কুরআন মাজীদে (সূরা বাকারাহ আয়াত ২২৮) বলা হয়েছে,

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

অর্থ : "এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামী তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে "।

এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পর্ব পর্যন্ত তাদের বিবাহ বন্ধান বহাল থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্য কথায় 'রুজু' করা বিবাহ নবায়ন করা নয় যে, সেজন্য স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন হবে। এতটুকু পর্যন্ত ঐকমত্য পোষণ করার পর ফিকাহবিদগণ ' রুজু' করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের মতে, 'রুজু' করা শুধু কথার দ্বারাই হতে পারে, কাজ দ্বারা নয়। ' আমি তোমাকে রুজু করলাম অর্থাৎ ফিরিয়ে নিলাম' এ কথা যদি তালাকদাতা না বলে তাহলে দৈহিক মিলন বা মেলামেশার মত কোনো কাজ 'রুজু' করার নিয়তে করা হলেও তাকে 'রুজু' বলে গণ্য করা হবে না বরং এক্ষত্রে নারীকে যে কোনো পন্থায় উপভোগ করা এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভ করা হারাম এমনকি তা যৌন উত্তেজনা ছাড়া হয়ে থাকলেও । কিন্তু রজিয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে জন্য কোনো হদ বা শাস্তি হবে না। কারণ, রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামা একমত নন। তবে যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে সহবাস হারাম বলে মনে করে তাকে তাযীর করা হবে। তাছাড়া শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে সর্বাবস্থায় মহরে মিসাল' বা সমতুল্য মহরানা পরিশোধ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সহবাস করার পর স্বামী মৌখিকভাবে 'রুজু' করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না।

(মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতে 'রুজু' কথা ও কাজ উভয়ভাবেই হতে পারে। কথার দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি স্পষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে তাহলে 'রুজু' করার নিয়ত তার থাক বা না থাক 'রুজু' হয়ে যাবে। এমনকি স্পষ্টভাবে রুজু করা বুঝায় এমন শব্দ যদি সে তামাসাচ্ছলেও বলে তবুও তা 'রুজু' বলে গণ্য হবে। তবে কথা যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহলে কেবল 'রুজু'র নিয়তে বলা হয়ে থাকলে তবেই তা রুজু বলে গণ্য হবে। এরপর থাকে কোনো কাজ দ্বারা 'রুজু' করার বিষয়টি। এক্ষেত্রে মেলামেশা হোক বা সহবাস হোক ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজকে 'রুজু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না তা 'রুজু'র নিয়তে করা হবে।

(হাশিয়াতুদ দুসুকী, আহকামুল কুরআন-ইবনুল আরাবী)

কথা দ্বারা মৌখিকভাবে রুজু করার বেলায় হানাফীও হাম্বলী মাজহারে মতামত মালেকী মাযহাবের অনুরুপ। কিন্তু কাজ দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে তাদের মতামত মালেকীদের বিপরীত। এক্ষেত্রে হানাফী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফতোয়া হলো স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যই রিজয়ী 'তালাকপ্রাপ্তা' স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে এক্ষেত্রে সে 'রুজু করার নিয়তে করুক বা না করুক তার এ কাজ আপনা থেকেই রুজু বলে গন্য হবে। তবে উভয় মাযহাবের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, হানাফীদের মতে, মেলামেশার যে কোনো কাজ 'রুজু' বলে গণ্য হবে এমনকি যদি তা সহবাসের চেয়ে নিম্নস্তরের কোনো কাজও হয়। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ শুধু মেলামেশাকে রুজু বলে স্বীকার করেন না।" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীল, উমদাতুল কারী,আল ইনসাফ)

ছয় : ফলাফলের দিক দিয়ে সুন্নাত তালাক ও বিদআত তালাকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক তালাক বা দুই তালাক দেয়ার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং তার পূর্ব স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে যেমন 'রুজু' করা সম্ভব নয় তেমনি ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়ে হওয়াও সম্ভব নয়। তবে উক্ত মহিলার যদি অন্য কোনো পুরুষের সাথে যথাযথভাবে বিয়ে হয়ে থাকে আর সে তার সাথে সহবাস করে এবং পরে তালাক দেয় কিংবা মরে যায় এবং তারপর সেই মহিলা ও তার পূর্ব স্বামী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তা করতে পারবে। অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এরপর সে মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার নির্জনবাসও হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি। এমতাবস্থায় সে তাকে তালাক দিয়েছে। এখন এ মহিলার কি তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে হতে পারে? নবী ﷺ জবাব দিলেন।

لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

"না ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ তার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর মতো দৈহিক মিলন না করবে।"

এরপর থাকে পাতানো বিয়ে সম্পর্কে কথা। এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দেবে। ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, এভাবে তাহলীল হয়ে যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় তাহলীল করায় তাদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন।" (আবু দাউদ : ২০৭৮)

উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ.

" আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! অবশ্যই করবেন। (ইবনে মাজাহ : ১৯৩৬)

তিনি বললেন।

هُوَ الْمُحَلِّلُ. لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

''ভাড়াটে ষাঁড় হচ্ছে তাহলীলকারী । যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় আল্লাহ তাদের উভয়কে লা'নত করেছেন। (ইবনে মাজা : হাদীস-১৯৩৬)

৫. 'ইদ্দতের হিসাব রেখো' এই নির্দেশ পুরুষ, নারী ও তাদের পরিবারের লোকজনের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, তালাককে এমন খেলার বস্তু মনে করো না যে, তালাকের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কবে তালাক দেয়া হয়েছে, কবে ইদ্দত শুরু হয়েছে এবং কবে তা শেষ হবে তাও মনে রাখা হবে না। তালাক একটি অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার। এ থেকে স্বামী, স্ত্রী, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং গোটা পরিবারের জন্য বহু আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তালাক দেয়া হলে তার সময় ও তারিখ মনে রাখতে হবে, কী অবস্থায় নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাও মনে রাখতে হবে। সাথে সাথে হিসেব করে দেখতে হবে ইদ্দত কবে শুরু হয়েছে, কত সময় এখনো অবশিষ্ট আছে এবং কবে তা শেষ হয়েছে। এই হিসেবের ওপরেই এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে যে, কোন সময় পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার আছে, কোন সময় পর্যন্ত নারীকে তার বাড়িতে রাখতে হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে, কতদিন পর্যন্ত সে নারীর উত্তরাধিকারী হবে এবং নারী তার উত্তরাধিকারিণী হবে। কখন নারী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার পাবে। তাছাড়া ব্যাপারটি যদি মামলা-মোকাদ্দামা পর্যন্ত গড়ায় তাহলে সঠিক রায় দানের জন্য আদালতকেও তালাকের যথার্থ তারিখ ও সময় এবং নারীর অবস্থা জানার প্রয়োজন হবে। কারণ এ ছাড়া আদালত সহবাসকৃতা ও সহবাসকৃতা নয় এমন নারী, গর্ভবতী ও অগর্ভবতী, ঋতুবতী ও অঋতুবতী এবং রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও অন্য প্রকার তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে তালাক থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলির যথার্থ ফায়সালা করতে অক্ষম।

'তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়' অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে স্বামী স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে না কিংবা রাগান্বিত হয়ে স্ত্রী নিজেও বাড়ি ছেড়ে যাবে না। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি তার। ঐ বাড়িতেই তাদের উভয়কে থাকতে হবে পারস্পরিক সমঝোতার কোনো সম্ভব্য উপায় সৃষ্টি হলে তা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। রিজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী যে কোনো সময় স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং স্ত্রীও বিরোধের কারণসমূহ দূর করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। উভয়ে যদি একই বাড়িতে থাকে তাহলে তিন মাস পর্যন্ত অথবা তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত অথবা গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত ও সুযোগ বার বার আসতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তাড়াহুড়া করে স্ত্রীকে বের করে দেয় অথবা স্ত্রী যদি চিন্তা-ভাবনা না করে পিতৃগৃহে চলে যায় তাহলে সে

ক্ষেত্রে 'রুজু' করার সম্ভবনা খুবই কমই থাকে এবং সাধারণত শেষ পর্যন্ত তালাকের পরিণাম স্থায়ী বিচ্ছেদের রূপান্তরিত হয়। এ জন্য ফিকাহবিদগণ এ কথাও বলেছেন যে, যে স্ত্রী রিজয়ী তালাকের ইদ্দত পালন করেছে তার সাজসজ্জা ও রূপচর্চা করা উচিত, যাতে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (হিদায়া, আল ইনসাফ)।

সমস্ত ফিক্‌হবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইদ্দতকালে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বাসগৃহ এবং খোরপোষ পাওয়ার অধিকার আছে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া এই সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েজ নয় এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়াও জায়েজ নয়। স্বামী তাকে বের করে দিলে গোনাহগার হবে। আর স্ত্রী নিজেই যদি বের হয়ে যায় তাহলে সেও গোনাহগার হবে এবং খোরপোষ ও বাসগৃহ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

যারা বলেন, হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে বা একই সঙ্গে তিন তালাক দিলে আদৌ তালাক হয়না এ দুটি আয়াতাংশ তাদের ধারণা খণ্ডন করে। সাথে সাথে তাদের ধারণাও মিথ্যা প্রমাণ করে, যারা মনে করে এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক বলে গণ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো, বিদআতী অর্থাৎ সুন্নাত বিরোধী পন্থায় দেয়া তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয় অথবা তিন তালাক যদি এক তালাক রিজয়ী বলে গণ্য হয় তাহলে এ কথা বলার প্রয়োজন কী যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমাসমূহ অর্থাৎ সুন্নাত নির্দেশিত পন্থা ও নিয়ম লংঘন করবে সে নিজের ওপর যুলুম করবে এবং তোমরা জাননা এর পরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতার কোনো উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এ দুটি কথা কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে, যখন সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দেয়ার কারণে সত্যি কোনো ক্ষতি হয় এবং যে কারণে, ব্যক্তিকে অনুশোচনা করতে হয় এবং এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়ার কারণে 'রুজু' করার কোনো সুযোগ আর না থাকে। অন্যথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যে তালাক আদৌ কার্যকরী হয় না তা দ্বারা আল্লাহর সীমাসমূহেও লংঘণ হয় না। তাইতো নিজের প্রতি যুলুম বলেও গণ্য হতে পারে না। আর রিজয়ী তালাক হয়ে যাওয়ার পর সমঝোতার পথ অবশ্যই থেকে যায়। সুতরাং এ কথার বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহ তাআলা এরপর সমঝোতার কোনো উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।

এখানে পুনরায় সূরা বাকারার ২২৮ থেকে ২৩০ আয়াত এবং সূরা তালাকের আলোচ্য আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সূরা বাকারায় তালাকের হিসাব বা নির্দিষ্ট সীমা বলা হয়েছে তিন। এর মধ্যে দুই তালাকের পর রুজু করা অধিকার এবং 'ইদ্দত' পূরণ হওয়ার পর 'তাহলীল' ছাড়াই পুনরায় বিয়ে করার অধিকার থাকে। কিন্তু তৃতীয় তালাক দেয়ার পর এই দুটি অধিকারই নষ্ট হয়ে যায়। এই নির্দেশটিকে বাতিল বা এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের জন্য সূরা তালাকের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়নি, বরং নাযিল হয়েছে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, স্ত্রীদের তালাক দেয়ার যে অধিকার ও ইখতিয়ার স্বামীদের দেয়া হয়ছে তা প্রয়োগ

করার বিজ্ঞোজিত পন্থা কি, যা অনুসরণ করলে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তালাক দিয়ে অনু অনুসোচনা করার মত পরিস্থিতি আসতে পারে না। সমঝোতা ও আপোষরফা হওয়ার সর্বাধিক সুযোগ থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যদি বিচ্ছেদ হয়েও যায় তাহলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আবার মিলিত হওয়ার শেষ পথটি খোলা থাকে। কিন্তু অজ্ঞতা বশত কেউ যদি তার ইখতিয়ারসমূহ ভুল পন্থায় প্রয়োগ করে বসে তাহলে সে নিজের ওপর যুলুম করবে এবং ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের সমস্ত সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। এর উপমা দেয়া যায় এভাবে যে, কোনো এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেন, তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোনো টাকা পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোনো অর্থই হয় না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খচর করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে রেব হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোনো প্রয়োজন থাকে কি?

তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের বিধান

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.

অর্থ : তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুবতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনো ঋতুকাল শুরু হয়নি তারাও (তিন মাস ইদ্দত) পালন করবে এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব প্রর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দিবেন।

(সূরা তালাক : আয়াত-৪)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : যেসব মহিলার ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অধিক বয়সের কারণে যারা ঋতুস্রাব হওয়ার আশা করে না তাদেরকে যেদিন তালাক দেয়া হয়েছে সেদিন থেকে তাদের 'ইদ্দত' গণনা শুরু হবে। আর তিন মাস বলতে তিনটি চান্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। তালাক যদি চান্দ্র মাসের শুরুতে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে চাঁদ দেখা যাওয়া অনুসারে ইদ্দত গণনা হবে। আর যদি মাসের মাঝে কোনো সময় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানিফার (র) মতে ৩০ দিনে মাস ধরে তিন মাস পূরণ করতে হবে। ('বাদায়েউস সানয়ে')

যেসব মহিলার ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অনিয়ম আছে তাদের ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন-

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন যে, 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে দুই একবার ঋতুস্রাব হওয়ার পর যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এ সময়ে যদি তার গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে ভাল। অন্যথায় ৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে আরো তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। এরপর সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উপযুক্ত ও বৈধ হবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরিমার মতে, যে মহিলার এক বছর পর্যন্ত ঋতুস্রাব হয়নি তার ইদ্দতের সময়-কাল তিন মাস।

তাউসের মতে, যে মহিলার বছরে একবার ঋতুস্রাব হয় তার ইদ্দতাকাল তিনবার ঋতুস্রাব হওয়া। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাবেত এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন যে, হাব্বান নামক এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয় যখন সে তার সন্তানকে দুধ দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় এক বছর চলে যায় কিন্তু তার ঋতুস্রাব হয় না। এরপর ঐ ব্যক্তি মারা যায়। তালাকপ্রাপ্তা তার

উত্তরাধিকারিণী হওয়ার দাবী পেশ করে। বিষয়টি উসমানের সামনে পেশ করা হলে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাবেতের কাছে পরামর্শ চান। তাঁদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করে উসমান ফায়সালা দিলেন যে, নারী উক্ত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হবে। তাঁর দলীল ছিল এই যে, যে সব মহিলা ঋতুস্রাব হবে না বলে নিরাশ হয়ে গিয়েছে সে তাদের মত নয় আবার যেসব মহিলাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদের মতও নয়। সুতরাং যে ঋতুস্রাব চলাকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সে উক্ত ঋতুস্রাবেই ছিল। তার ইদ্দত কাল এখনো শেষ হয়নি; বরং অবশিষ্ট আছে।

হানাফিদের মতে, স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তা অধিক বয়স জনিত কারণে বন্ধ হয়নি যা পরে আবার শুরু হওয়ার আশাই থাকে না এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত গণনা করতে হবে ঋতুস্রাব দ্বারা যদি তা পরে শুরু কিংবা যে বয়সে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় সেই বয়সের বিচারে। এ রকম বয়সে উপনীত হয়ে থাকলে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করার পর বিবাহ বন্ধনে থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এটাই ইমাম শাফেয়ীর (র), ইমাম সাওরী এবং ইমাম লাইসের মত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাবেতের মাযহাবও এটাই।

ইমাম মালেক উমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত গ্রহণ করেছেন। তাদের মত হচ্ছে, স্ত্রী প্রথমে ৯ মাস অতিবাহিত করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু না হয় তাহলে সে বার্ধক্য জনিত করণে স্থায়ীভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকের মত তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। ইবনুল কাসেম ইমাম মালেকের অনুসৃত মতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যখন শেষবারের মত স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছিল তখন থেকে ৯ মাসের গণনা শুরু হবে, তালাক দেয়ার সময় থেকে নয়। (জাস্সাসের আহকামুল কুরআন এবং কাসানীর বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থদ্বয় থেকে এসব বিবরণ গৃহীত হয়েছে।)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের মাযহাব হচ্ছে, যে নারীর ইদ্দতের হিসেব হায়েজ থেকে শুরু হয়েছিল ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব যদি বার্ধক্যজনিত কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে ঋতুবতী নারীদের মত ইদ্দত পালন না করে বৃদ্ধাদের মত ইদ্দত পালন করবে। যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কী কারণে বন্ধ হয়েছে তা জানা না যায় তাহলে প্রথমে গর্ভসঞ্চারের সন্দেহে ৯ মাস সময়-কাল অতিবাহিত করবে এবং পরে তিন মাস ইদ্দত পূরণ করতে হবে। তবে ঋতুস্রাব কেন বন্ধ হয়েছে তা যদি জানা যায়, যেমন- কোনো রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সন্তানকে স্তন্যদান করে অথবা অন্য কোনো কারণ থাকে তাহলে যতদিন ঋতুস্রাব পুনরায় শুরু না হবে এবং ঋতুস্রাবের হিসেবে ইদ্দত গণনা শুরু না হতে পারবে অথবা সে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার মত বৃদ্ধাবয়সে উপনীত হবে এবং ঋতুস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত ইদ্দত পালন করতে পারবে ততো দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (আল ইনসাফ)।

ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয়ে থাকে অথবা কিছু সংখ্যক মহিলাদের অনেক দেরীতে হয়ে থাকে বলে না হয়ে থাকে এবং বিরল কিছু ঘটনা এমনও হয়ে থাকে যে সারা জীবন কোনো স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় না এরূপ সর্ব ক্ষেত্রে এ রকম স্ত্রীলোকদের ইদ্দত রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত তালাকের সময় থেকে তিন মাস।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মাজীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী নির্জনবাস করেছে কেবল তার ক্ষেত্রেই ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসে। কারণ, নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না।

সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্টত, এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েজই নয়; রবং তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস এবং মেলামেশাও জায়েয। এখন একথা স্পষ্ট যে, কুরআন যে জিনিসকে জায়েজ বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই।

এখনো ঋতুস্রাব হয়নি এমন কোনো মেয়েকে যদি তালাক দেয়া হয় এবং ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে সে উক্ত ঋতুস্রাব থেকে পুনরায় ইদ্দত শুরু করবে। তার ইদ্দত হবে ঋতুবতী মহিলাদের মত।

সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কিন্তু যে মহিলার স্বামী গর্ভকালে মারা গিয়েছে তার ব্যাপারেও এ নির্দেশ প্রযোজ্য কি না সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এ মতভেদের কারণ হলো, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় সূরা বাকারার ২৩৪ আয়াতে তার ইদ্দতকাল ৪ মাস দশ দিন বলা হয়েছে। এ নির্দেশ সমস্ত বিধবা মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য না কেবল গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য সে ব্যাপারে সেখানে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

আলী (আঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দুটি আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তো বটেই। কিন্তু গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত হচ্ছে দুটি সময়কালের মধ্যে বিলম্বিত দীর্ঘতর সময়টি। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের মধ্যে যেটি বেশি দীর্ঘতর সেটিই তার ইদ্দত। উদাহরণ স্বরূপ, তার গর্ভস্থ সন্তান যদি ৪ মাস দশ দিন অতিবহিত হওয়ার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু তার সন্তান যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলে যে সময় তার সন্তান প্রসব হবে তখন তার ইদ্দত পূরণ হবে। ইমামিয়াগণ এ মতটি অনুসরণ করে থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে, সূরা তালাকের এই আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। অতএব পরে নাযিল হওয়া নির্দেশ পূর্বে নাযিল হওয়া আয়াতের

নির্দেশকে গর্ভহীনা বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা যাই হোক না কেন গর্ভবতী সমস্ত নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই মত অনুসারে গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব স্বামী মৃত্যুর পরপরই হোক কিংবা ৪ মাস দশ দিন দীর্ঘায়িত হোক সর্বাবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে ইদ্দত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। উবাই ইবনে কা'বের একটি রেওয়ায়াত এ মতের সমর্থন করে। তিনি বর্ণনা করেন সূরা তালাকের এ আয়াত নাযিল হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞেস করলাম তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা উভয় শ্রেণির নারীর জন্যই কি এ নির্দেশ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। অন্য একটি হাদীস অনুসারে নবী ﷺ আরো স্পষ্ট করে বললেন, "সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল "। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ থাকলেও হাদীসটি যেহেতু বেশ কিছু সংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাই স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর কোনো ভিত্তি অবশ্যই আছে।) এর স্বপক্ষে এর চেয়েও মজবুত সমর্থন পাওয়া যায় সুবইআ আসলামিয়ার ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র যুগে। সুবাইআ আসলামিয়া গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর (কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে ২০ দিন। কোনোটিতে ২৩ দিন কোনোটিতে ২৫ দিন, কোনোটিতে ৪০ দিন এবং কোনোটিতে ৩৫ দিন)। তার সন্তান প্রসব হয়েছিল। তার ব্যাপারে নবীর ﷺ কাছে ফতোয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিম উম্মে সালামা থেকে কয়েকটি সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবার এ ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা বিভিন্ন সনদে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকেও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম সুবাইআ আসলামিয়ার নিজের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, আমি সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলাম। বিদায় হজ্জের সময় আমার স্বামী মারা গিয়েছিলেন, আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একজন আমাকে বললো, তুমি ৪ মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। আমি ﷺ কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ফতোয়া দিলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তুমি হালাল হয়ে গিয়েছ, এখন ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার। বুখারীও এ হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় তার ইদ্দত। এ কথা শুনে আনসারদের একজন লোক বললো, উমর তো এ কথাও বলেছিলেন যে, স্বামীর দাফন কাফন পর্যন্ত হয়ে সারেনি; বরং তার লাশ তখনো মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে এমতাবস্থায়ও যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তখনই সে পুনরায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হালাল হবে।

আবু হুরাইরা, আবু মাসউদ বদরী এবং আয়েশা ও এ মত পোষণ করেছেন। চার ইমাম এবং অন্য সব বড় বড় ফিক্হবিদও এমতটি গ্রহণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে যদি একাধিক বাচ্চা থাকে তাহলে সর্বশেষ বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। এমন কি মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলেও তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ধাত্রী যদি তার ধাত্রী বিদ্যার আলোকে একথা বলে যে, তা শুধু রক্তপিণ্ড ছিল না; বরং তা মানুষের আকৃতি লাভ করেছিল, অথবা গর্ভস্থ বস্তুর গিট ছিল না; বরং মানবদেহে সৃষ্টির উপাদান ছিল, তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা হবে এবং ইদ্দকাল শেষ হয়ে যাবে। (মুগনিউল মুহতাজ)। হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতও প্রায় অনুরূপ। তবে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তাদের মত হলো, মানুষের দেহকাঠামো স্পষ্ট হয়ে না উঠলে শুধুমাত্র "তা মানবদেহ সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল "। ধাত্রীদের এই বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে এবং এভাবে ইদ্দতও শেষ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে-আল ইনসাফ)। কিন্তু বর্তমান সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ কথা জানা আর কঠিন নয় যে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা বস্তু আদতেই মানব আকৃতির মত কোনো কিছু ছিল, না গর্ভস্থ পদার্থের কোনো গিট বা জটপাকানো কিছু ছিল অথবা জমাট বাঁধা রক্তের মত কোনো কিছু ছিল। তাই বর্তমানের যেসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের মতামত জানা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, যাকে গর্ভপাত বলা হচ্ছে তা প্রকৃতই গর্ভপাত কি না এবং তা দ্বারা ইদ্দতকাল শেষ হয়েছে না হয়নি। তবে যেসব ক্ষেত্রে এ রকম ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতই অধিক সতর্কতামূলক। এ ক্ষেত্রে ও অনভিজ্ঞ ধাত্রীদের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের কষ্ট না দেয়া এবং ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণের বিধান

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে স্থানে বাস করো, তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দিয়ো; তাদেরকে কষ্ট দিওনা সংকটে ফেলার জন্যে,তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। (সূরা তালাক : আয়াত-৬)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : স্ত্রীকে 'রিজয়ী' তালাক দেয়া হয়ে থাকলে স্বামীর ওপর তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব বর্তায়। এ বিষয়ে সমস্ত ফিক্হবিদ একমত। স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে 'রজয়ী' তালাক দেয়া হয়ে থাকুক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী বায়েন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর, এ বিষয়েও তারা একমত। তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তা হলো, অগর্ভবতী চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা (অর্থাৎ যাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাক দেয়া হয়েছে) সে কি বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই পাওয়ার অধিকারিণী না কেবল বাসস্থান লাভের অধিকারিণী অথবা দু'টির কোনোটির অধিকারিণী নয়?

একদল ফিক্হবিদের মতে, সে বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই লাভের অধিকারিনী। এ মত পোষণ করেছেন উমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবেদীন), কাজী শুরাইহ্ এবং ইবরাহীম নাখয়ী। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং হাসান ইবনে সালেহ্-এর মাযহাবও এটিই। দারু কুতনীর একটি হাদীসে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

হাদীসটিতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক ইদ্দতকালে বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকারিণী "। এ মতের পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া যায় সেসব হাদীস থেকে যাতে বলা হয়েছে, ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে উমর এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, একজন মাত্র নারীর কথার ওপর নির্ভর করে আমি আমার রবের কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। এ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নাতটি উমরের অবশ্যই জানা ছিল যে, এরূপ স্ত্রীলোকের বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকার আছে; বরং ইবরাহীম নাখয়ীর একটি বর্ণনায় এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উমর ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি যে, এরূপ স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভ করার অধিকারিণী "।

ইমাম আবু বকর জাস্সাস তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ মতের পক্ষে প্রথম প্রমাণ পেশ করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কেবল এতটুকু বলেছেন, "তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও"। আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ সেই ব্যক্তির জন্যেও তো প্রযোজ্য যে প্রথমে দুই তালাক দিয়ে তারপর 'রুজু' করেছে এবং এখন তার কেবল এক তালাক দেয়ার অধিকার আছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তালাক দেয়ার এ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, যে তুহ্রে সহবাস করা হয়নি হয় সেই তুহ্রে তালাক দেবে, অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন নারীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ হয়ে

গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ তালাকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তোমরা যেখানে থাক তাদেরকেও সেখানেই রাখ সর্ব প্রকার তালাকের সাথেই সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হবে। তিনি তৃতীয় যে দলীলটি পেশ করেন তা হচ্ছে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা সে 'রজয়ী' তালাকপ্রাপ্তা হোক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাকাপ্রাপ্তা হোক, তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। 'রজয়ী' তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীকেও এ দুটি দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাসস্থানও খোরপোষ দেয়া গর্ভবতী হওয়ার কারণে ওয়াজিব নয়; বরং তা এ কারণে ওয়াজিব যে, এ দুই শ্রেণির তালাকপ্রাপ্তা শরয়ী বিধান অনুসারেই স্বামীর বাড়ি থাকতে বাধ্য। এখন অগর্ভবতী তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রেও যদি এ নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে তার বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

অপর একদল ফিক্‌হবিদের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতকাল বাসস্থান পাওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু খোরপোষ পাওয়ার অধিকার নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা, শা'বী আওযায়ী, লাইস এবং আবু উবাইদ রহিমাহুমুল্লাহ এ মত পোষণ করেছেন। আর ইমাম মালেকও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী যে এ মত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় আরেকটি দলের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত চলাকালে বাসস্থান ও খোরপোষ কোনোটা লাভের অধিকার নেই। এ মত হাসান বাসরী, হাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা, আমর ইবনে দীনার, তাউস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আবু সাওরের। ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাসও এ মত পোষণ করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমামিয়াগণও এমত গ্রহণ করেছেন। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের এমত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, "যে নারী তালাকের কারণে ইদ্দত পালন করেছে সে গর্ভবতী হোক বা না হোক তার বাসস্থান লাভের অধিকার আছে এবং তা দেয়া ওয়াজিব, তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীর বাসস্থান ও কাপড় চোপড় কোনো কিছুই পাওয়ার অধিকার নেই "।

এ মতের স্বপক্ষে একদিকে কুরআনের আয়াত "তুমি জান না, এরপরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতা ও বুঝাপড়ার কোনো উপায় সৃষ্টি করে দেবেন "। এ থেকে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌছেন তা হচ্ছে, এ কথা রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে নয়। তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বাড়িতে রাখার আদেশও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, হাদীস গ্রন্থসমূহে বিপুল সংখ্যক সহীহ সনদে বর্ণিত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীস।

এই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে কায়েস আল ফিহরিয়া ছিলেন প্রথম পর্যায়ে হিজরাতকারী মহিলাদের একজন। তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা বলে মনে করা হতো। হযতর

উমরের রাঃ শাহাদাতের পর তাঁর বাড়িতেই মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়েছিল। প্রথমে তিনি আবু আমর ইবনে হাফস ইবনুল মুগীরাতুল মাখযূমীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁকে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। তার ঘটনা হলো, তাঁর স্বামী আবু আমর তাঁকে প্রথমে দুই তালাক দিয়েছিলেন। পরে আলীর সাথে যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানো হলো, তখন তিনি সেখান থেকে অবশিষ্ট তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে দেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, আবু আমর নিজেই তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পত্র মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইদ্দত পালনকালে তারা যেন তাঁকে বাড়িতেই রাখে এবং তার ব্যয়ভার বহন করে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, তিনি নিজেই খোরপোষ ও বাসস্থানের দাবী করেছিলেন। তবে ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন, স্বামীর আত্মীয়-স্বজন তাঁর অধিকার স্বীকার করলেন না। এরপর তিনি দাবী নিয়ে নবীর ﷺ কাছে গেলেন। নবী ﷺ এই বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, তুমি খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাওয়ার অধিকারী নও। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী ﷺ বলেছিলেন, "স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকার থাকে তখন যখন স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকে। কিন্তু যখন রুজু করার অধিকার থাকে না তখন খোরপোষ ও বাসস্থানলাভের অধিকারও থাকে না।

(মুসনাদে আহমাদ)

তাবারানী এবং নাসায়ীও প্রায় অনুরূপ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াতের শেষ দিকের ভাষা হলো- "কিন্তু যে ক্ষেত্রে সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে আর পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তার খোরপোষ ও বাসস্থানের কোনো অধিকার নেই "।

এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর নবী ﷺ প্রথমে তাকে উম্মে শারীকের গৃহে থাকার নির্দেশ দেন; কিন্তু পরে তাঁকে বলেন, তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে অবস্থা করো।

কিন্তু যারা এ হাদীস গ্রহণ করেননি তাদের যুক্তি হলো-

- প্রথমত, তাঁকে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ জন্য যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্কশ ভাষী। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন তাঁর বদ মেজাজের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন, ঐ মহিলা তাঁর হাদীস বর্ণনা করে মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি ছিলেন খুব মুখড়া। তাই তাঁকে ইবনে মাকতূমের গৃহে রাখা হয়েছিল (আবু দাউদ)।
- আরেকটি রেওয়ায়াতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের কটু কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (জাসসাস)। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, "প্রকৃতপক্ষে বদ মেজাজীর কারণে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন "। (আবু দাউদ)

- দ্বিতীয়ত উমর এমন এক যুগে তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যখন বহু সংখ্যক সাহাবী বেঁচেছিলেন এবং এ বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া এবং যাঁচাই বাছাই করা পুরোপুরি সম্ভবপর ছিল। ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, উমর যখন ফাতেমার এই হাদীস শুনলে তখন বললেন, "এমন একজন নারীর কথা অনুসারে আমরা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ -এর বাণী পরিত্যাগ করতে পারি না, যার হয়তো ভুল ধারণা হয়েছে- আমি নিজে রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, তিনি তালাকপ্রাপ্তা নারীর বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভের অধিকার আছে"(জাসসাস)। আবু ইসহাক বলেন, আমি কূফার মসজিদে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের পাশে বসে ছিলাম। সেখানে শা'বী ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীস উল্লেখ করলে আসওয়াদ পাথরের টুকরো তুলে শা'বীর প্রতি ছুঁড়ে মেরে বললেন, উমরের সময়ে যখন ফাতেমার বর্ণিত এ হাদীস পেশ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, একজন নারীর কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে না ভুলে গিয়েছে। সে খোরপোষ ও বাসগৃহ লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছিলেন, لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ

মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীতে শাব্দিক তারতম্যসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

- তৃতীয়ত, মারওয়ানের শাসন আমলে তিনি তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে এক বিতর্কের সূত্রপাত হলে আয়েশা ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেনঃ আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ফাতেমার কাহিনী জানেন না। তিনি জবাব দিলেন, ফাতেমার বর্ণিত হাদীসের কথা না বলাই ভাল (বুখারী)। বুখারী অপর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তাতে আয়েশার বক্তব্যের ভাষা হলো, ফাতেমার কী হয়েছে সে কি আল্লাহকে ভয় করে না? তৃতীয় একটি হাদীসে উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন যে, আয়েশা বলেছেন, এ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে ফাতেমার কোনো কল্যাণ নেই। অপর এক বর্ণনায় হযতর উরওয়া বলেন, আয়েশা ফাতেমার প্রতি তাঁর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, "প্রকৃতপক্ষে সে একটি নির্জন গৃহে অবস্থান করেছিল সেখানে তার কোনো প্রিয়জন বা বান্ধবী ছিল না। সুতরাং তার নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জন্য নবী তাকে গৃহ পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন "।

- চতুর্থত, পরে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে ঐ মহিলার বিয়ে হয়েছিল। উসামার ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, ফাতেমা যখনই এ হাদীস বলতেন তখনই আমার পিতা হাতের কাছে যা পেতেন তাই তার প্রতি নিক্ষেপ করতেন। (জাসসাস)। এ কথা স্পষ্ট যে, উসামার জানা মতে, তা রাসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী না হলে এ হাদীসটি বর্ণনা করার জন্য তিনি এতটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারতেন না।

'তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় করবে' এ বিষয়টি

সর্বসম্মত যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হোক সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার বাসস্থান ও খোরপোষের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে যে ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাবে সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে সে তালাক দেয়ার পরে মারা গিয়ে থাকুক, অথবা কোনো তালাক না দিয়ে মারা গিয়ে থাকুক এবং স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়ে থাকুক তাকে কিছু এসে যায় না। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত হলো-

❖ হযতর আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মতে, স্বামীর পরিত্যাক্ত মোট সম্পদের ওপর থেকে তাকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু), কাজী শুরাইহ, আবুল আলীয়া, শা'বী এবং ইবরাহীম নাখায়ী থেকেও মতটি বর্ণিত হয়েছে এবং হযতর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি মত এ মতের সমর্থন করে (আলুসী, জাসসাস)।

ইবনে জারীর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় যে মতটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কোনো সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পদে তার গর্ভস্থ সন্তানের অংশ থেকে তার জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোনো সম্পদ না রেখে গিয়ে থাকলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেকে তার জন্য খরচ করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ "আর উত্তরাধিকারীগণের প্রতিও অনুরূপ বিধান।"(সূরা বাকারা আয়াত ২৩৩)

❖ জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু), হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং আতা ইবনে আবী রাবিয়াহর মতে, মৃত স্বামীর সম্পদে তার খোরপোষ লাভের কোনো অধিকার নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তৃতীয় মতটিও এ মতটিরই অনুরূপ। (জাসসাস)। এর অর্থ, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকারী হিসেবে সে যে অংশ লাভ করেছে তা থেকে সে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু স্বামীর রেখে যাওয়া মোট সম্পদের ওপর তার খোরপোষের দায়িত্ব বর্তায় না। কারণ, তাতে সমস্ত উত্তরাধিকারীকেই সে বোঝা বহন করতে হয়।

❖ ইবনে আবী লায়লার মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার খোরপোষ দেয়া ঠিক তেমনি ওয়াজিব যেমন কোনো ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব (জাসসাস)। অর্থাৎ পরিত্যাক্ত মোট সম্পদ থেকে যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা হয় সেভাবে তাকে খোরপোষও দিতে হবে।

❖ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসূফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম যুফারের মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার বাসস্থান বা খোরপোষ কোনোটাই পাওয়ার অধিকার নেই। কারণ, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কোনো মালিকানা স্বত্ব থাকে না। মৃত্যুর পর তা ওয়ারিশদের সম্পদ। তাই তাদের সম্পদে মৃত ব্যক্তির

গর্ভবতী বিধবার খোরপোষ কী করে ওয়াজিব হতে পারে? (হিদায়া), জাসসাস)। ইমাম আহমাদ রা. ইবনে হাম্বলও এ মত পোষণ করেন (আল-ইনসাফ)।

❖ ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, সে খোরপোষ পেতে পারে না, তবে বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী (মুগনিউল মুহতাজ)। তার দলীল হচ্ছে, আবু সাঈদ খুদরীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বোন ফুরাইবার স্বামীকে হত্যা করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দতকাল কাটানো নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)। তাছাড়া দারু কুতনীর একটি হাদীস থেকেও তিনি প্রমাণ দিয়েছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গর্ভবতী বিধবার জন্য কোনো খোরপোষ নেই। ইমাম মালেকও (র) এ মত পোষণ করেছেন (হাশিয়াতুদ দুসুকী)।

'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে' এই নির্দেশ থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়।

❖ নারী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, সে তার দুধের বিনিময় গ্রহণ করতে পারতো না এবং সে জন্য তাকে অনুমতিও দেয়া হতো না।

❖ গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সে তার পূর্বতন স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সন্তানকে দুধ পান করাতে আইনগত বাধ্য নয়; বরং শিশুর পিতা যদি তার দুধ পান করাতে চায় এবং সেও সম্মত হয় তাহলে সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং সে জন্য বিনিময় লাভের অধিকারী হবে।

❖ পিতাও সন্তানকে আইনগত মায়ের দুধ পান করাতে বাধ্য নয়।

❖ সন্তানের ব্যয়ভার পিতার ওপর বর্তায়।

❖ সন্তানকে দুধ পান করানোর সর্বাগ্রে অধিকার মায়ের। কিন্তু মা যদি এতে রাজী না হয় কিংবা সে জন্য এতটা মূল্য দাবী করে যা পূরণ করার সামর্থ পিতার নেই তাহলে কেবল সেই ক্ষেত্রে অন্য কোনো নারী দ্বারা তাকে দুধ পান করানোর কাজে নেয়া যেতে পারে। এ নির্দেশ থেকে ষষ্ঠ যে মূলনীতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, মা যে অর্থ দাবী করছে অপর কোনো মহিলাকেও যদি সেই অর্থই দিতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য হবে।

এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের মতামত নীচে বর্ণনা করা হলো-

দাহহাকের মতে, শিশুকে দুধদানের সর্বাধিক অধিকার মায়ের। কিন্তু দুধ পান করানো এবং না কারানোর ব্যাপারে তার ইখতিয়ার আছে। তবে শিশু যদি অন্য কোন মহিলার স্তন গ্রহণ না করে তাহলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। কাতাদা, ইবরাহীম নাখয়ী এবং সুফিয়ান সাওরীর মত প্রায় অনুরূপ। ইবরাহীম নাখয়ী এ কথাও বলেন যে, দুধ পান করানো জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। (ইবনে জারীর)।

হিদায়াগ্রন্থে বলা হয়েছে, পিতা মাতার বিচ্ছেদের সময় যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান থাকে

তাহলে তাকে দুধ পান করানো মায়ের জন্য ফরয নয়। তবে যদি দুগ্ধদাত্রী অন্য কোনো মহিলাকে পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে দুগ্ধদানে বাধ্য করা হবে। আর বাপ যদি বলে, শিশুর মাকে বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর পরিবর্তে অন্য কোন মহিলাকে বিনিময় দিয়ে এ কাজ করবো, অথব শিশুর মা উক্ত মহিলার দাবীকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থই দাবী করেছে কিংবা বিনামূল্যে এ কাজ করতে সম্মত হচ্ছে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার অধিকারই অগ্রগণ্য হবে। আর শিশুর মা যদি অধিক বিনিময় দাবী করে তাহলে পিতাকে সে জন্য বাধ্য করা হবে না।

এর মধ্যে পিতামাতা উভয়ের জন্য এক ধরনের তিরস্কার বিদ্যমান। বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতীতে যে তিক্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তালাক পর্যন্ত গড়িয়েছে তার কারণে তারা যদি উত্তম পন্থায় শিশুর দুধ পানের বিষয়টি মীমাংসা করতে না পারে তাহলে তা আল্লাহর কাছে পছন্দীয় ব্যাপার নয়। নারীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি অধিক বিনিময় দাবী করে পুরুষকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন জেনে রাখে, শিশুর প্রতিপালন শুধু তার ওপরেই নির্ভর করে না। সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো নারী তাকে দুধ পান করাবে। সাথে সাথে পুরুষকেও সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, সে যদি মায়ের মাতৃত্বের দুর্বলতাকে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে বিপাকে ফেলতে চায় তাহলে তা ভদ্র জনোচিত কাজ হবে না। সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতে প্রায় অনুরূপ বিষয়ই আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

২৩. সূরা আত তাহরীম (سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ)

আয়াত : ১২ রুকু : ২ মাদানী

ভূমিকা

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'লিমা তুহাররিমু' থেকেই এ নাম গৃহীত। 'তাহরিম' মানে হারাম করা। এটি এমন সূরা, যেখানে একটি জিনিসকে হারাম করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাসমূহে দু'জন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা দু'জনই নবী ﷺ-এর স্ত্রী। তাঁদের একজন হলেন সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্যজন মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা খায়বার বিজয়ের পরে নবী ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সর্বসম্মত মতে খায়বার বিজিত হয় ৭ম হিজরীতে। দ্বিতীয় মহিলা মারিয়াকে রাদিয়াল্লাহু আনহা মিসরের শাসক মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে নবী ﷺ-এর খেদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ৮ম হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁরই গর্ভে নবী ﷺ-এর পুত্র সন্তান ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্ম লাভ করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ বিষয়টি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরীর কোনো এক সময় নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১. হালাল হারাম এবং জায়েজ নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ তা'আলার নবীর ﷺ কাছেও তার কোনো অংশ হস্তান্তর করা হয়নি। নবী নবী হিসেবে কোনো জিনিসকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করতে পারেন কেবল তখনই যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো ইংগিত থাকে। সে ইংগিত কুরআন মাজীদে নাযিল হয়ে থাক কিংবা তা অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়ে থাক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খোদ আল্লাহ কর্তৃক মোবাহকৃত কোনো জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নেয়ার অনুমতি কোনো নবীকেও দেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না।

২. মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোনো মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোনো গুরুত্বই বহন করে না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী-রাসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোনো পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থি না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোনো ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয়; বরং নবীর 'উসওয়ায়ে হাসানা' বা উত্তম জীবন আদর্শরূপে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোনো জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোনো মিল নেই।

৩. উপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন নবী ﷺকে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি; বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর ﷺ পবিত্র জীবনকালে যেসব কাজকর্ম ও হুকুম-আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো তিরস্কার ব সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরোপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐ সব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

৪. কুরআন মাজীদের এই বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রাসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রাসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। আর নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদারদের মা বলে ঘোষণা করেন এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্য তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু ভুল-ত্রুটির জন্য তাদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া নবীকে তিরস্কার এবং তার স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি; বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মাতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল এবং উম্মুল মু'মিনীনদেরকে ঈমানদারদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে তাঁর কিতাবে এসব উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোনো অভিপ্রায় ছিল না, কিংবা তা থাকতেও পারে না। একথা স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোনো মুসলমানের অন্তর থেকে তাদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে

কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা আল্লাহ নন যে, তাদের কোনো ভুল-ত্রুটি হতে পারে না; বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম হোন বা নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার ঊর্ধে ছিলেন না। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার ওপর তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই নবী ﷺ-এর কল্যাণময় যুগে সাহাবা কিরাম কিংবা নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোনো ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী ﷺ নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও কুরআন মাজিদে তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন যাতে মুসলামনগণ কখনোই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদার বসিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআম মাজীদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানে উহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবা কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিল। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা তোমরা করছিলে আল্লাহ্ তা'আলা যেই মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গণিমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ্ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।"

অনুরূপভাবে সূরা নূরে আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ সাহাবীগণকে বলেন,"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মু'মিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ। দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখ যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে, বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করেছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্য এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।"

সূরা আহযাবে নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে-

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেল এবং (হে নবী) তোমাকে (খুতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হাতেব ইবনে আবী বালতায়া নবীর ﷺ মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের মধ্যেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম এবং নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে 'রাদিয়াল্লাহ আনহুম ওয়া রাদু আনহু' অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানো এই শিক্ষা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদীস, তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ে এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ত্রুটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নি। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবীদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশি মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশি জানতেন।

৫. পঞ্চম যে কথাটি এ সূরায় খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ নিরপক্ষ ও নিখুঁত। এ দীন অনুসারে ঈমান ও আমলের বিচারে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তাই সে পাবে। অতি বড় কোন বুজুর্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাও তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় এবং অত্যন্ত খারাপ কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্কও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশেষ করে নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে তিন শ্রেণির স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে নূহ عليه السلام ও লূতের عليه السلام স্ত্রীদের। তারা যদি ঈমান আনয়ন করত এবং তাদের মহাসম্মানিত স্বামীর সাথে সহযোগিতা করত তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে নবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের যে মর্যাদা তাদের মর্যাদাও তাই হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এর বিপরীত আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছে তাই নবীদের স্ত্রী হওয়াটাও তাদের কোনো কাজে আসেনি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউনের স্ত্রীর। যদিও তিনি আল্লাহর জঘন্য এক দুশমনের স্ত্রী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফেরাউনের কওমের কাজ কর্ম থেকে নিজের কাজ কর্মের সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন তাই ফেরাউনের মত চরম পর্যায়ের কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর কোনো ক্ষতির কারণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে মারইয়াম আলাইহিস সালামের। তাঁর এই বিরাট মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করার ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কুমারী অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জিযা হিসেবে গর্ভবতী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাঁর রব তাঁর দ্বারা কী কাজ নিতে চান তাও তাকে বলে দেয়া হয়েছে। মারইয়াম ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো অভিজাত ও নেককার মহিলাকে এরূপ কোনো কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কখনো ফেলা হয়নি। মারইয়াম এ ব্যাপারে যখন কোনো আফসোস ও আর্তনাদ করেননি; বরং একজন খাঁটি ঈমানদার নারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যা বরদাশত করা অপরিহার্য ছিল তা সবই বরদাশত করা স্বীকার করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে سَيِّدَةُ النِّسَاءِ فِي الْجَنَّةِ 'জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী' হওয়ার মত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ)

এসব বিষয় ছাড়াও আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এ সূরা থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে, কুরআন মাজীদে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ﷺ-এর কাছে কেবল সেই জ্ঞানই আসতো না; বরং তাঁকে অহীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সূরার ৩ নং আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনীয় একটি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা অন্য কাউকে বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী ﷺকে জানিয়ে দিলেন। অতঃপর নবী ﷺ এই ত্রুটির জন্য তাঁর সেই স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর এই ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে কে অবহিত করেছেন? নবী ﷺ জবাব দিলেন, যে সত্তা আলীম ও খাবীর তিনিই আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোটা কুরআন মাজীদের মধ্যে সেই আয়াতটি কোথায় যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীকে গোপনীয় যে কথা বলেছিলে তা সে অন্যের কাছে বা অমুকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে? কুরআনে যদি এমন কোনো আয়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তা নেই তাহলে এটাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন ছাড়াও নবী ﷺ-এর কাছে অন্য অহী আসতো। কুরআন ছাড়া নবী ﷺ-এর কাছে আর কোনো অহী আসতো না, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবী এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

স্ত্রী বা কারো কথায় আল্লাহর হালালকৃত জিনিস নিজের জন্য হারাম করা বৈধ নয়

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছো কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাহরীম : আয়াত-১)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এটা মূলত প্রশ্ন নয়; বরং অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য নবী ﷺকে এ কথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, আপনি এ কাজ কেন করেছেন; বরং তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে, তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম করার অধিকার কারো নেই, এমন কি স্বয়ং নবী ﷺ-এর নিজেরও এ ইখতিয়ার নেই। নবী ﷺ ঐ জিনিসটিকে যদিও আকীদাগতভাবে হারাম মনে করেননি কিংবা শরীয়াতসম্মতভাবে হারাম বলে সাব্যস্ত করেননি; বরং নিজের জন্য তা ব্যবহার করা হরাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা যেহেতু সাধারণ একজন মানুষের মত ছিল না; বরং তিনি আল্লাহর রাসূলের মর্যাদায় অভিসিক্ত ছিলেন। তাই তাঁর নিজের পক্ষ

থেকে নিজের ওপর কোনো জিনিস হারাম করে নেয়াতে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর উম্মতও ঐ জিনিসকে হারাম অথবা অন্তত মাকরূহ বলে মনে করতে আরম্ভ করবে অথবা উম্মতের লোকেরা মনে করতে শুরু করবে যে, আল্লাহর হালালকৃত কোনো জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয়ায় কোনো দোষ নেই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজে হারাম করে নেয়ার এই কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন।

এ থেকে জানা যায় যে, হারাম করে নেয়ার এই কাজটি নবী ﷺ নিজের ইচ্ছায় করেননি; বরং তাঁর স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন তিনি যেন এরূপ করেন। আর তাই তিনি শুধু তাঁদের খুশি করার জন্য একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারাম করে নেয়ার এ কাজটি সম্পর্কে তিরস্কার করার সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তার এই কারণটি কেন উল্লেখ করলেন? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যদি শুধু হালালকে হারাম করে নেয়া থেকে নবীকে ﷺ বিরত রাখা হতো তাহলে আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারাই এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো। যে কারণে তিনি এ কাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তা বিশেষভাবে বর্ণনা করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হালালকে হারাম করে নেয়ার কারণে শুধু নবীকেই ﷺ তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সাথে সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকেও এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ছিল তা তাঁরা উপলব্ধি করেননি এবং তাঁকে দিয়ে এমন একটি কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা একটি হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে পারতো।

নবী ﷺ নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিলেন সেটি কী ছিল কুরআন মাজীদে যদিও তা বলা হয়নি কিন্তু মুহাদ্দিসও মুফাস্সিরগণ এ আয়াত নাযিলের কারণ হিসেবে দুটি ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ঘটনা মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কিত এবং অপর ঘটনাটি হলো নবী ﷺ মধু পান না করার শপথ করেছিলেন।

মারিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘটনা হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আশপাশের বাদশাহদের কাছে যেসব পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে আলোকজন্দ্রিয়ার রোমান খ্রিস্টান ধর্মযাজকের (Patriarch) কাছেও একটি পত্র দিয়েছিলেন। আরবরা তাকে মুকাওকিস বলে অভিহিত করত। হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ এই মহামূল্যবান পত্রখানা নিয়ে তার কাছে পৌছলে তিনি ইসলাম কবুল করেননি কিন্তু তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং পত্রের উত্তরে লিখলেন, "আমি জানি আরো একজন নবী আসতে এখনো বাকি। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়ায় আসবেন। তা সত্ত্বেও আমি আপনার দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং কিবতীদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী দুটি মেয়ে পাঠাচ্ছি।" (ইবনে সা'দ) মেয়ে দুটির মধ্যে একজনের নাম সিরীন এবং অপর জনের নাম মারিয়া। মিসর থেকে ফেরার পথে হাতিব তাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির

হলে তিনি সিরীনকে হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে সাবেতের মালিকানায় দিয়ে দেন এবং মারিয়াকে তাঁর হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। ৮ম হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুত্র ইবরাহীম জন্মলাভ করেন (আল ইসতিয়াব আল ইসাবা)। এই মহিলা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর আল ইসাবা গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। মারিয়ার আগমন আমার কাছে যতটা অপছন্দয়ী হয়েছে অন্য কোনো মহিলার আগমন ততটা অপছন্দনীয় হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন অতিব সুন্দরী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব পছন্দ করেছিলেন। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহে তাঁর সম্পর্কে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হাফসার ঘরে গেলে তিনি সেখানে ছিলেন না। সেই সময় মারিয়া সেখানে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে নির্জনে কাটান। হাফসা তা অপছন্দ করলেন এবং তিনি এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে ওয়াদা করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মারিয়ার সাথে কোনো প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক রাখবেন না। কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে তিনি শপথও করেছিলেন। এসব হাদীস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের থেকে 'মুরসাল' হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদীস উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের সনদের আধিক্য দেখে এর কোনো না কোনো ভিত্তি আছে বলে হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোনো গ্রন্থেই এ কাহিনী উদ্ধৃত হয়নি। নাসায়ীতে আনাস থেকে শুধু এতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাসী ছিল যার সাথে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতেন। এই ঘটনার পর হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিছে লাগলেন। যার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এ কারণে এ আয়াত নাযিল হয়- হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন, তা তুমি হারাম করে নিচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং অপর কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত প্রতিদিন আসরের পর পবিত্র স্ত্রীগণের সবার কাছে যেতেন। একবার তিনি যয়নাব বিতনে জাহাশের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসলেন। কারণ, কোথাও থেকে তাঁর কাছে মধু পাঠানো হয়েছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি খুব ভালবাসতেন। তাই তিনি তাঁর কাছে মধুর শরবত পান করতেন।

আয়েশা বর্ণনা করেন, এ কারণে খুব হিংসা হলো এবং আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা, সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও সাফিয়ার সাথে মিলিত হয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যার কাছেই আসবেন সেই তাঁকে বলবে, আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। মাগাফির এক প্রকার ফুল যার মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ থাকে। মৌমাছি উক্ত ফুল থেকে মধু

আহরণ করলে তার মধ্যেও ঐ দুর্গন্ধের কিছুটা লেশ বর্তমান থাকে। এ কথা সবাই জানতেন যে, নবী ﷺ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে কোনো প্রকার দুর্গন্ধ আসুক তিনি তা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাই যয়নাবের কাছে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকে বন্ধ করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হলো এবং তা ফলবতী হলো। যখন কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে বললেন যে, তাঁর মুখ থেকে মাগফিরের গন্ধ আসে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনো তিনি মধু পান করবেন না। একটি হাদীসে তাঁর বক্তব্যের ভাষা উদ্ধৃত হয়েছে এরূপ- فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ "আমি আর কখনো এ জিনিস পান করবো না, আমি শপথ করেছি"। অপর একটি হাদীসে শুধু فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ কথাটি আছে وَقَدْ حَلَفْتُ কথাটির উল্লেখ নেই। ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীসটি ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন তাতে বক্তব্যের ভাষা হলো- واللهِ لَا اَشْرَبُهُ, আল্লাহর কসম, আমি আর তা পান করবো না।

বড় বড় মনীষী এই দুটি কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় কাহিনীটিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং প্রথম কাহিনীটিকে অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, "মধুর ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারে আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ এবং মারিয়াকে রাদিয়াল্লাহু আনহা হারাম করে নেয়ার ঘটনা কোনো উত্তম সনদে বর্ণিত হয়নি"। কাজী আয়াজ বলেন, "নির্ভুল কথা এই যে, এ আয়াতটি মারিয়াকে রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যাপারে নয়; বরং মধু সম্পর্কিত ব্যাপারে নাযিল হয়েছে"। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীও মধু সম্পর্কিত কাহিনীকেই বিশুদ্ধ বলে মনে করেন এবং ইমাম নববী এ হাফেজ বদরুদ্দীন আইনীও এই মতটিই পোষণ করেন। ফাতহুল কাদির নামক ফিকহ্ গ্রন্থে ইমাম ইবনে হুমাম বলেন, মধু হারাম করে নেয়ার কাহিনী বুখারী ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে বর্ণনা করেছেন যাঁকে নিয়ে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, সঠিক কথা হলো, নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেয়া সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য একটি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদমর্যাদার দিক দিয়ে তা যদিও যথোচিত হয়নি, কিন্তু তা গোনাহর কাজও নয় যে, সে জন্য পাকড়াও করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা শুধু সে ভুল দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন।

স্ত্রীদের পরস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাসূলের মনো কষ্টের কারণ এবং সংশোধনে আল্লাহর হুশিয়ারী

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا.

নবী যদি তোমাদের মত সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দান করবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারিণী, ইবাদাত গোজার এবং রোযাদার। তারা পূর্বে বিবাহিত বা কুমারী যাই হোক না কেন।

(সূরা তাহরীম : আয়াত-৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : এ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা শুধু ভুল করেছিলেন না; বরং নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য স্ত্রীগণও কিছু না কিছু ভুল করেছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁদের দু'জনকে ছাড়াও নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যসব স্ত্রীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এসব ভুল আচরণের ধরন সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কোনো প্রকার আলোকপাত করা হয়নি। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এখানে আমরা তা উদ্ধৃত করলাম-

বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হাদীসের মূল ভাষা হচ্ছে-

اِجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ

তাই আমি তাঁদের বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করা অসম্ভব নয়। আনাসের রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন, আমার কাছে এ মর্মে খবর পৌছল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা শুনে আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বললাম, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অতিষ্ঠ করা থেকে বিরত থাক। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। এমনকি আমি যখন উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শেষ জনের কাছে গেলাম [বুখারীর একটি হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা।] তখন তিনি আমাকে বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ কি স্ত্রীদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য যথেষ্ট নন যে, তুমি তাঁদেরকে উপদেশ দিতে চলেছ? এতে আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন।

মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী যখন সাময়িকভাবে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করলেন তখন আমি মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলাম লোকজন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বসে নুড়ি পাথর তুলছে এবং নিক্ষেপ করেছে এবং পরস্পর বলাবলি করছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা ও হাফসার কাছে তাঁর যাওয়ার এবং তাঁদের উপদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনি যদি তাঁদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে আছেন, সমস্ত ফেরেশতা, জিবরাঈল ও মিকাঈল আপনার সাথে আছেন, আর আমি, আবু বকর এবং সমস্ত ঈমানাদার আপনার সাথে আছেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ খুব কমই এ রকম হয়েছে যে, আমি কোনো কথা বলেছি এবং আল্লাহ তা'আলা তা সত্যায়ন ও সমর্থন করবেন বলে আশা করি নি। বস্তুত এরপর সূরা তাহরীমের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। এরপর আমি নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলাম, আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। এ কথা শুনে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেন নি।

বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং মুসনাদে আহমাদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আবু হুরাইরা থেকে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং নিজের কুঠরিতে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন। ২৯ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনার কসম পূরণ হয়েছে, মাস পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একটিতে ছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা, সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। আর অপরটিতে ছিলেন যয়নাব, উম্মে সালামা এবং অবশিষ্ট উম্মুল মু'মিনীনগণ।

ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবনে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এসব বর্ণনা থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ সংশোধন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণ যদিও সমাজের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন, তথাপি তাঁরা ছিলেন মানুষ। তাই তাঁরা মানসিক চাহিদা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। নিরবিচ্ছিন্নভাবে কষ্টকর জীবন যাপন কোনো কোনো সময় তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাই তাঁরা অধৈর্য হয়ে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে খোরপোষের দাবী করতে শুরু করতেন। এ অবস্থায় সূরা আহযাবের ২৮-২৯ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন যে, পার্থিব স্বাচ্ছন্দই যদি তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে

আমার রাসূল তোমাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দিয়ে দেবেন। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের জীবন কামনা করো তাহ্লে রাসূলের সাহচর্যে থাকার কারণে যেসব দুঃখ কষ্ট, আসবে তা বরদাশত করো তাছাড়া কোনো কোনো সময় নারী প্রকৃতির কারণে তাদের থেকে স্বভাবতই এমনসব বিষয় প্রকাশ পেত যা সাধারণ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে যে ঘরের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা দান করেছিলেন তার মর্যাদা ও গৌরব এবং মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

এসব কারণে যখন এ আশঙ্কা দেখা দিল যে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীর ﷺ দ্বারা যে মহৎ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন তার ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে, তাই কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল করে তাঁদের সংশোধন করলেন। যাতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে সেই মর্যাদা ও দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয় যা তাঁরা আল্লাহর সর্বশেষ রাসূলের জীবন সঙ্গীনি হওয়ার কারণে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আর তাঁরা যেন নিজেদেরকে সাধারণ নারীদের মত এবং নিজেদের পারিবারিক সাধারণ পরিবারসমূহের মত মনে করে না বসেন। এ আয়াতের প্রথম অংশটিই এমন যা শুনে হয়তো নবীর ﷺ পবিত্র স্ত্রীদের হৃদয়-মন কেঁপে উঠে থাকবে। তাঁদের জন্য এ কথাটির চেয়ে বড় হুঁশিয়ারী আর কী হবে যে, নবী যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহর তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করাটা অসম্ভব নয়। প্রথমত নবীর ﷺ কাছে থেকে তালাক পাওয়ার চিন্তা বা কল্পনাই তাদের কাছে অসহনীয় ব্যাপার। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যেসব উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার মর্যাদা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং অন্য যেসব নারীকে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর স্ত্রী হিসেবে আনবেন তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবেন। এরপরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিরস্কার যোগ্য হতে পারে এমন কোনো কাজ নবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবই ছিল না। এ কারণে আমরা কুরআন মাজীদে শুধু দুটি যায়গায় এমন দেখতে পাই যেখানে মহা সম্মানিত এই নারীদেরকে হুঁশিয়ার দেয়া হয়েছে। উক্ত জায়গা দুটির একটি সূরা আহ্যাবে এবং অপরটি সূরা তাহরীমে।

দু'জন নবীর স্ত্রী ছিল বিশ্বাসঘাতক নারী

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ এবং লূতের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তারা আমার দুই নেক্কার বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীর সাথে খেয়ানত করেছিল। তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনো কাজেই আসতে পারেনি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে- যাও, আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তুমিও প্রবেশ কর। (সূরা তাহরীম : আয়াত-১০)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের ব্যাপারে দু'জন নবীর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সেই দুই নারী হলো নূহ ও লূত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী। এরা দু'জনই ছিল নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতককারিণী। নূহ আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী 'ওয়াগেলা' আর লূত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীর নাম 'ওয়ালেহা'। এ দু'জন মহিলা তাদের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এখানে খেয়ানতের অর্থ এ নয় যে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এখানে খেয়ানতের অর্থ হচ্ছে তারা নূহ আলাইহিস সালাম ও লূতের আলাইহিস সালাম সাথে ঈমানের পথে চলেনি; বরং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা দীন ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করে এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোনো নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'জন মহিলার খেয়ানত ছিল দীনের ব্যাপারে। তারা নূহ আলাইহিস সালাম ও লূতের আলাইহিস সালাম দীন গ্রহণ করেনি। নূহের আলাইহিস সালাম স্ত্রী তার কওমের জালেমদের কাছে ঈমান গ্রহণকারী সম্পর্কে খবর পৌছাত এবং লূতের আলাইহিস সালাম স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আগত লোকদের খবর তার কওমের দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে পৌছে দিত। (ইবনে জারীর)

আল্লাহ ভক্ত দু'নারী আসিয়া ও মারইয়াম

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.

অর্থ : আর ঈমানদারদের ব্যাপারে ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করছেন। যখন সে দোয়া করলো, হে আমার রব! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আমাকে ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে রক্ষা করো এবং জালেম কওমের হাত থেকে বাঁচাও। ইমরানের কন্যা মারয়ামের উদাহরণও পেশ করেছেন, যে তার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেছিল। অতঃপর আমি আমার পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করেছিলাম। সে তার বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা তাহরীম : আয়াত : ১১-১২)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন পত্নী আছিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন, ফলে যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। এতে ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইলো। কতক রেওয়াতে আছে ফিরাউন আছিয়ার দু'হাত ও দু'পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে এ আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোনো কোনো রেওয়াতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এ দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিস্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তাঁর দোয়ার বাংলা অর্থ– "হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন।" আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দেন। (তাফসীরে মাযহারী)

আয়াতে বর্ণিত আছিয়ার দোয়ার মধ্যে ছিল "আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করো।" অর্থাৎ আমাকে তোমার শত্রু ও মুসলমানদের শত্রু ফিরাউন থেকে হিফাযাত করো, আর তার আমল অর্থাৎ তার অন্যায়-অনাচার, যুলুম ও স্বেরাচারী কার্যকলাপ থেকেও আমাকে রক্ষা করো। তার এসব যুলুমের অশুভ পরিণতিতে আমাকে পরীক্ষা করো না।"

আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন পত্নী আছিয়ার এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। অর্থাৎ তাদের জন্য এ দৃষ্টান্ত দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা, দীনের কাজে তাদের প্রেরণা দেয়া, ইসলামের পথে তাদের দৃঢ়পদ রাখা, দীনের

ব্যাপারে কঠিন বিপদে সবর করার জন্যে। তাছাড়া এজন্যও যে, কুফরির প্রতিবন্ধকতা ও কঠোরতা ঈমানের এতটুকুনও ক্ষতি করতে পারে না, যেমন পারেনি ফিরাউন পত্নী আছিয়ার ব্যাপারে। যেই আছিয়া ছিল তৎকালীন সর্ববৃহৎ কাফিরের স্ত্রী। সেই কাফিরও তার স্ত্রীকে ঈমান থেকে ফিরাতে পারেনি। মূলত আল্লাহ্ তায়ালা এখানে এ মযবুত ঈমানের অধিকারী নারী বিবি আছিয়ার ঈমানের দৃঢ়তার কথাটা তুলে ধরেছেন। এ থেকে বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত নারীর জন্য শিক্ষা গ্রহণের উদাহরণ-উপকরণ পাওয়া যায়, ঈমানের পথে দৃঢ় থাকার প্রেরণা মিলে।- (আল কুরআনুল করীম : সালাহুদ্দীন ইউসুফ।)

আছিয়া যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামের শত্রু ফিরাউনের স্ত্রী হয়েও হতে পেরেছেন একজন খাঁটি ঈমানদার, আল্লাহর ওলী। আলোচ্য আয়াতে তিনি আল্লাহর কাছে চারটি বিষয়ে দোয়া করেছেন বলে দেখা যায়।

- আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং জান্নাতে তার জন্য স্থান নির্ধারণ।
- ফিরাউনের অধীনতা থেকে নাজাত দেয়া।
- ফিরাউনের বেঈমানী ও যুলুম অত্যাচারী ইত্যাদির পরিণতি থেকে বিবি আছিয়াকে মুক্ত রাখা।
- সকল বিধর্মী যালিম কওম থেকে তাকে নাজাত দেয়া। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা বুঝা যায়।

এখানে ফিরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়াকে ইমরানের কন্যা মারইয়ামের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ফিরাউনের স্ত্রী আল্লাহ কাছে কত উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যার বদৌলতে তিনি মারইয়ামের সাথে উল্লেখের যোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর এ মহত্ব ও উচ্চমর্যাদার একমাত্র কারণ তাঁর জীবনের স্বতন্ত্র ঈমানী বৈশিষ্ট্য। এারা দুজন সতী, ঈমানদার, চরিত্রবান ও অনুগত মহিলার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এ দুজন নারীর দৃষ্টান্তকে আল্লাহ্ আল কুরআনে রাসূল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের সামনে এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিন নারীদের সামনে তুলে ধরেছেন।-(ফী যিলালিল কুরআন)

২৪. সূরা আবাসা (سُوْرَةُ عَبَسَ)

আয়াত : ৪২ রুকু : ১ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

এই সূরার প্রথম শব্দ 'আবাসা' কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ একযোগে এ সূরা নাযিলের নিম্নরূপ কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী ﷺ-এর মজলিসে মক্কা মুয়ায্‌যমার কয়েক জন বড় বড় সরদার বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু আনহা নামক একজন অন্ধ তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এই প্রশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী ﷺ বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ই সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময় কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু আনহা একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।

দ্বিতীয়, যেসব হাদীসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তার কোনো কোনোটি থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোনো কোনো হাদীস থেকে প্রকাশ হয়, এ সময় তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানেই নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা মতে, তিনি এসে বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সত্য সরল পথ দেখিয়ে দিন।"

(তিরমিয, হাকেম ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর, আবু লাইলা)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি এসেই কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং নবী ﷺকে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন আমাকে সেই জ্ঞান শেখান।"

(ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নবী ﷺকে আল্লাহর নবী এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে যায়েদ তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত "হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করবে"। (ইবনে জারীর)

আবার আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "তুমি কী জানো হয়তো, সে সংশোধিত হয়ে যাবে অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হবে এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হবে?"

এ ছাড়া আল্লাহ এও বলেছেন, "যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত হয় তার কথায় তুমি কান দিচ্ছো না।" একথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, তখন তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের গভীরতর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নবী ﷺকেই হেদায়েতের উৎস মনে করে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই নিজের চাহিদা পূরণ হবে বলে মনে করছিলেন। তাঁর অবস্থা একথা প্রকাশ করছিল যে, তাঁকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেয়া হলে তিনি সে পথে চলবেন।

তৃতীয়ত, নবী ﷺ-এর মজলিসে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা ছিল উতবা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ ইসলামের ঘোর শত্রুরা। এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এই লোকগুলোর মেলামেশা বন্ধ হয়নি। তাদের সাথে বিরোধ ও সংঘাত তখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তাঁর কাছে তাদের আসা যাওয়া এবং তাঁর সাথে তাদের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। এসব বিষয় প্রমাণ করে, এ সূরাটি একেবারেই প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আপাতদৃষ্টিতে ভাষণের সূচনায় যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অন্ধের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তার কথায় কান না দিয়ে বড় বড় সরদারদের প্রতি মনোযোগ দেবার কারণে এই সূরায় নবী ﷺকে তিরস্কার ও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো সূরাটির সমস্ত বিষয়বস্তুকে একসাথে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কুরাইশদের কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে। কারণ এই সরদাররা তাদের অহংকার, হঠধর্মিতা ও সত্য বিমুখতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই সঙ্গে এখানে নবীকে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দেবার সঠিক পদ্ধতি শেখবার সাথে সাথে নবুওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায় নিজের কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতিগত ভুল করে যাচ্ছিলেন তা তাকে বুঝানো হয়েছে। একজন অন্ধের প্রতি তাঁর অমনোযোগিতা ও তার কথায় কান না দিয়ে কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তিনি বড়লোকদের বেশি সম্মানিত মনে করতেন এবং একজন অন্ধকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, নাউযুবিল্লাহ তাঁর চরিত্রে এই ধরনের কোনো বক্রতা ছিল না যার ফলে আল্লাহ তাঁকে পকড়াও করতে পারেন; বরং আসল ব্যাপার এই ছিল, একজন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারী যখন তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টি চলে যায় জাতির প্রভাবশালী লোকদের দিকে। তিনি চান, এই প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক। এভাবে তাঁর কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দুর্বল, অক্ষম ও সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন লোকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লেও তাতে সমাজ ব্যবস্থায় কোনো বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেয় না। প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺও প্রায় এই একই ধরনের

কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পেছনে একান্তভাবে কাজ করেছিল তাঁর আন্তরিকতা ও সত্য দীনের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। বড়লোকদের প্রতি সম্মাবোধ এবং গরীব, দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধারণা এর পেছনে মোটেই সক্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বুঝালেন, এটা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়; বরং এই দাওয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, যে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, সে যতই দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন আবার এর দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বহীন, যে নিজেই সত্যবিমুখ, সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। তাই ইসলামের দাওয়াত আপনি জোরে সোরে সবাইকে দিয়ে যান কিন্তু যাদের মধ্যে সত্যের গ্রহণ করার আগ্রহ পাওয়া যায় তারাই হবে আপনার আগ্রহের আসল কেন্দ্রবিন্দু। আর যেসব আত্মম্ভরী লোক নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আপনি ছাড়া তাদের চলবে কিন্তু তারা ছাড়া আপনার চলবে না, তাদের সামনে আপনার এই দাওয়াত পেশ করা এই দাওয়াতের উন্নত মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

সূরার প্রথম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। তারপর ১৭ আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা নিজেদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা আল্লাহর মোকাবিলায় যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল প্রথমে সে জন্য তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এই কর্মনীতির অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

যেদিন মানুষ একান্ত আপনজন এমনকি স্ত্রী থেকে পালাতে চাইবে

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.

অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে নিজের ভাই, বোন, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না। (সূরা আবাসা : আয়াত : ৩৩-৩৭)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতসমূহে হাশরের ময়দানের ভয়াবহতার তীব্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে প্রথম আয়াতে (৩৩) ইসরাফিলের শিংগা ফুঁকের ফলে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথাটা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে-

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ "যখন আসবে মহানাদ।" এখানে الصَّاخَّةُ মানে 'কান বধিরকারী আওয়ায' অর্থাৎ ইসরাফিলের শিঙ্গার এমন কঠোর আওয়ায যাতে মানুষের কান বধির হয়ে যাবে। তরজমায় শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'কিয়ামত' শব্দ দিয়ে। দ্বিতীয় আয়াত

(৩৪) থেকে হাশরের দিন সকল মানুষের মহাসমাবেশের দিন মানুষের ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও প্রত্যেকের নিজ নিজ মুক্তির অস্থিরতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়ার জীবনে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরের ময়দানে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারো খবরই নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেকেই তার ভাই থেকে পালাবে, আপন মা-বাপ থেকেও লুকাবে। এক কথায়, প্রত্যেক মানুষ নিজের নিস্তার ও নিষ্কৃতির চিন্তায় এমন অস্থির ও হয়রান থাকবে যে, নিজের প্রাণপ্রিয় সকল প্রকার আত্মীয়দের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

দুনিয়ার জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ভাইদের মধ্যে হয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশি পিতা-মাতাকে সাহায্য করায় চিন্তা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশি স্ত্রী ও সন্তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতগুলোতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

পালাবার মানে এও হতে পারে যে, সেদিন মানুষ নিজের ঐসব প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনকে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খেতে দেখে তাদের সাহায্যার্থে দৌড়ে যাবার পরিবর্তে উল্টে তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তারা সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতে না থাকে। আবার এর এ মানেও হতে পারে যে, দুনিয়ার আল্লাহর ভয় না পরস্পরকে গোমরাহ করতে থেকেছে, তার কুফল সামনে স্বমূর্তিতে প্রকাশিত দেখে তাদের প্রত্যেক যাতে অন্যের গোমরাহী ও গোনাহের দায়িত্ব কেউ তার ঘাড়ে না চাপিয়ে দেয় এই ভয়ে অন্যের থেকে পালাতে থাকবে। ভাই ভাইকে, সন্তান মা বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং মা বাপ সন্তানকে এই মর্মে ভয় করতে থাকবে যে, নিশ্চয়ই এবার আমার বিরুদ্ধে মামলায় এরা সাক্ষী দেবে।

হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংঙ্গ হয়ে উঠবে। "একথা শুনে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোনো একজন (কোনো বর্ণনা মতে আয়েশা, কোনো বর্ণনা মতে সওদা আবার কোনো বর্ণনা অনুযায়ী অন্য একজন মহিলা) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা করো থাকবে না। (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া)

২৫. সূরা আল লাহাব (سُوْرَةُ لَهَبٍ)

আয়াত : ৫ রুকূ : ১ মাক্কী

ভূমিকা

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'লাহাব' শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরা মক্কী হবার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু মক্কী যুগের কোন সময় এটি নাযিল হয়েছিল তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়ে থাকবে যখন রাসূলের ﷺ সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে সে সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শে'বে আবু তালেবে (আবু তালেব গিরিপথ) অন্তরীণ করেছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা। আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারতো না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলুম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল করা হতো তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতো। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা করা শোভা পায় না।

পটভূমি

কুরআনে মাত্র এ একটি জায়গাতেই ইসলামের শত্রুদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মক্কায় এবং হিজরতের পরে মদীনায়ও এমন অনেক লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তিটির এমনকি বিশেষত্ব ছিল যে কারণে তার নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে? একথা বুঝার জন্য সমকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন এবং সেখানে আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে যেহেতু সারা আরব দেশের সব জায়গায় অশান্তি, বিশৃংখলা, লুটতরাজ ও রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং শত শত বছর থেকে এমন অবস্থা চলছিল যার ফলে কোনো ব্যক্তির জন্য তার নিজের বংশ ও রক্তসম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের সহায়তা ছাড়া নিজের ধন প্রাণ ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর

ছিল না। এ জন্য আরবীয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মহাপাপ মনে করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন আরবের ঐ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সরদাররা তাঁর কঠোর বিরোধিতা করলেও বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানরা) কেবল তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি; বরং প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। অথচ তাদের অধিকাংশই তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেনি। কুরাইশের অন্যান্য পরিবারের লোকেরাও রাসূলুল্লাহর ﷺ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের এ সমর্থন-সহযোগিতাকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের যথার্থ অনুসারী মনে করতো। তাই তারা কখনো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে এই বলে ধিক্কার দেয়নি যে, তোমরা একটি ভিন্ন ধর্মের আহবায়কের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছো। তারা একথা জানতো এবং স্বীকারও করতো যে, নিজেদের পরিবারের একজন সদ্যস্যকে তারা কোনোক্রমেই শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। কুরাইশ তথা সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই নিজেদের আত্মীয়ের সাথে সহযোগিতা করাকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করতো।

জাহেলী যুগেও আরবের লোকেরা এ নৈতিক আদর্শকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতো। অথচ শুধু মাত্র একজন লোক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এ আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে। সে ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা। রাসূলের ﷺ পিতা এবং এ আবু লাহাব ছিল একই পিতার সন্তান। আরবে চাচাকে বাপের মতই মনে করা হতো। বিশেষ করে যখন ভাতিজার বাপের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল তখন আরবীয় সমাজের রীতি অনুযায়ী চাচার কাছে আশা করা হয়েছিল, সে ভাতিজাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলাম বৈরিতা ও কুফরী প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে এ সমস্ত আরবীয় ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছিল।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺকে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াত পেশ করার হুকুম দেয়া হলো এবং কুরআন মাজীদে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো, "সবার আগে আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান।" এ নির্দেশ পাওয়ার পর সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে উঠে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন "হায়, সকাল বেলার বিপদ!" আরবে এ ধরনের আওয়াজ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে থাকে যে ভোর বেলার আলো আঁধারীর মধ্যে কোনো শত্রুদলকে নিজেদের গোত্রের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আওয়াজ শুনে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে আওয়াজ দিচ্ছে? বলা হলো মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আওয়াজ দিচ্ছেন। একথা শুনে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের লোকেরা দৌড়ে গেলো তাঁর দিকে। যে নিজে আসতে পারতো সে নিজে এসে গেলো এবং সে নিজে আসতে পারতো না সে

তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সবাই পৌঁছে গেলে তিনি কুরাইশের প্রত্যেকটি পরিবারের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন, হে বনী হাশেম! হে বনী আবদুল মুত্তালিব! হে বনী ফেহর! হে বনী উমুক! হে বনী উমুক! যদি আমি তোমাদের এ কথা বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে আমার কথা কি তোমরা সত্য বলে মেনে নেবে ? লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা কখনো আপনার মুখে মিথ্যা কথা শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললে, তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আযাব আসছে। একথায় অন্য কেউ বলার আগে তাঁর নিজের চাচা আবু লাহাব বললো, "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদের ডেকেছিলে? " অন্য একটি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটি পাথর উঠিয়েছিল।

(মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর ইত্যাদি)।

ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আবু লাহাব একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি তাহলে এর বদলে আমি কী পাবো ? তিনি জবাব দিলেন, অন্যান্য ঈমানদাররা যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বললো, আমার জন্য কিছু বাড়তি মর্যাদা নেই ? জবাব দিলেন, আপনি আর কী চান ? একথায় সে বললো, "সর্বনাশ হোক এ দীনের যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ভুক্ত হবে।" (ইবনে জারীর)

মক্কায় আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকটতম প্রতিবেশি। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। এ ছাড়াও হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের বাপ), উকবা উবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদায়েল হুযালীও তাঁর প্রতিবেশি ছিল। এরা বাড়িতেও রাসূলুল্লাহকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিত না। তিনি যখন নামায পড়তেন, এরা তখন ওপর থেকে ছাগলের নাড়িভূড়ি তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করতো। কখনো তাঁর বাড়ির আঙিনায় রান্নাবান্না হতো এরা হাড়ির মধ্যে ময়লা ছুঁড়ে দিতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে তাদেরকে বলতেন, "হে বনী আবদে মান্নাফ ! এ কেমন প্রতিবেশিসূলভ আচরণ? "আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) প্রতি রাতে নবী ﷺ-এর ঘরের দরজার সামনে কাঁটাগাছের ডাল পালা ছড়িয়ে রেখে দিতো। এটা ছিল তার প্রতিদিনের স্থায়ী আচরণ। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর শিশু সন্তানরা বাইরে বের হলে তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়।

(বায়হাকী, ইবন আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে আসাকির ও ইবনে হিশাম)

নবুওয়াত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে যখন তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে বলে, তোমরা মুহাম্মাদের (রাসুলূল্লাহ ﷺ) মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষে তোমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হারাম হয়ে যাবে। কাজেই দু'জনেই তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। উতাইবা জাহেলিয়াতের মধ্যে খুব বেশি অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রাসূলুল্লাহর

ﷺ সামনে এসে বলে : আমি وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى এবং ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى অস্বীকার করছি। একথা বলে তাঁর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর এর ওপর চাপিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার বাপের সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হয়। সফরকালে রাতে তাদের কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, সেখানে রাতে হিংস্র জানোয়ারদের আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশী সাথীদের বলে ,আমার ছেলের হেফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মাদের ﷺ বদ দোয়ার ভয় করছি। একথায় কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারদিকে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাঘ আসে। উটদের বেষ্টনী ভেদ করে উতাইবাকে ধরে এবং সেখানেই তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলে (আল ইসতিআব লি ইবনে আবদিল বার, আল ইসাবা লি ইবনে হাজার, দালায়েলুন নুবুওয়া লি আবী নাঈম আল ইসফাহানী ও রওদুল উনুফ লিস সুহাইলী)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী তালাকের ব্যাপারটি নবুওয়াতের ঘোষণার পরের ঘটনা বলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনাকারীর মতে ‘তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহব" এর নাযিলের পরই তালাকের ঘটনাটি ঘটে। আবার আবু লাহাবের এ তালাক দানকারী ছেলেটি উতবা ছিল না উতাইবা- এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর উতবা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক হাতে বাই' আত গ্রহণ করেন, একথা প্রমাণিত সত্য। তাই আবু লাহাবের তালাকদানকারী ছেলেটি যে উতাইবা ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

সে যে কেমন জঘন্য মানসিকতার অধিকারী ছিল তার পরিচয় একটি ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলে আবুল কাসেমের ইন্তিকালের পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহরও ইন্তিকাল হয়। এ অবস্থায় আবু লাহাব তার ভাতিজার শোকে শরীক না হয়ে বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে পৌঁছে যায়। সে তাদেরকে জানায়, শোনো! আজ মুহাম্মাদের (রাসূলুল্লাহ ﷺ) নাম নিশানা মুছে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে যেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন আবু লাহাব ও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছতো এবং লোকদের তাঁর কথা শুনার কাজে বাধা দিতো। রাবী'আহ ইবনে আব্বাদ আদদীলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার আব্বার সাথে যুল-মাজাযের বাজারে যাই। তখন আমার বয়স ছিল কম। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি বলছিলেন, "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। একথা বললেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" এ সময় তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি বলে চলছিল, "এ ব্যক্তি মিথ্যুক, নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞেস করি, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো তাঁর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী)

এ একই বর্ণনাকারী রাবীআহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের শিবিরে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "হে বনী অমুক! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো। এভাবে আল্লাহ আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমি পূর্ণ করতে পারবো।" তাঁর পিছে পিছে আর একটি লোক আসছিল এবং সে বলছিল "হে বনী অমুক! এ ব্যক্তি নিজে যে নতুন ধর্ম ও ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে লাত ও উযযার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে চায়। এর কথা একদম মেনো না এবং এর পেছনেও চলো না।" আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম : এ লোকটি কে? তিনি বললেন, এ লোকটি তাঁরই চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)

তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহারেবীর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াতও প্রায় এ একই ধরনের। তিনি বর্ণনা করেছেন, যুল মাজাযের বাজারে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বলে যাচ্ছেন, "হে লোকেরা! তোমরা লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে।" ওদিকে তাঁর পিছে পিছে একজন লোক তাঁকে পাথর মেরে চলছে। এভাবে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বলে চলেছে, "এ মিথ্যুক, এর কথা শুনো না।" আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো, তাঁরই চাচা আবু লাহাব। (তিরমিযী)

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে যখন বনি হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট করলো এবং এ পরিবার দু'টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমর্থনে অবিচল থেকে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণ হয়ে গেলো তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বংশের সহগামী না হয়ে কুরাইশ কাফেরদের সহযোগী হলো। এ বয়কট তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল মারমুখী। বাইর থেকে মক্কায় কোন বাণিজ্য কাফেলা এলে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতো। আবু লাহাব তখন চিৎকার করে বনিকদেরকে বলতো, ওদের কাছে এতো বেশি দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। এ জন্য তোমাদের যত টাকা ক্ষতি হয় তা আমি দেবো। কাজেই তারা বিরাট দাম হাঁকতো। ক্রেতা মহাসংকটে পড়তো। শেষে নিজের অনাহারের কষ্ট বুকে পুষে রেখে খালি হাতে পাহাড়ে ফিরে যেতে হতো ক্ষুধা কাতর সন্তানদের কাছে। তারপর আবু লাহাব সেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই পণ্যগুলোই বাজার দরে কিনে নিতো। (ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশাম)

এ সূরায় যে ব্যক্তিটির নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে এগুলো ছিল তারই কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এ জন্য দেখা গিয়েছিল যে, মক্কার বাইরের আরবের যেসব লোকেরা

হজ্জের জন্য আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যেসব বাজার বসতো সেখানে যারা জমায়েত হতো, তাদের সামনে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের চাচা তাঁর পিছনে ঘুরে ঘুরে তাঁর বিরোধিতা করতো তখন বাইরের লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। কারণ আরবের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কোনো চাচা বিনা কারণে অন্যদের সামনে তার নিজের ভাতিজাকে গালিগালাজ করবে, তার গায়ে পাথর মারবে এবং তার প্রতি দোষারোপ করবে এটা কল্পনাতীত ছিল। তাই তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতো। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার পর যখন আবু লাহাব রাগে অন্ধ হয়ে আবোলতাবোল বকতে লাগলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে নিজের ভাতিজার শত্রুতায় অন্ধ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নাম নিয়ে নিজের চাচার নিন্দা করার পর মুহাম্মাদ ﷺ যে দীনের ব্যাপারে কারো মুখ চেয়ে কোনো প্রকার সমঝোতা বা নরম নীতি অবলম্বন করবেন, এ আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলের চাচার নিন্দা করা হলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখানে কোনো কিছু রেখে ঢেকে করার অবকাশ নেই। এখানে ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতাও কুফরী করলে আপনও হয়ে যায় পর। এ ব্যাপারে অমুকের ছেলে, অমুকের ভাই বা অমুকের বাপের কোনো গুরুত্ব নেই।

যে নারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে খেজুরের পাকানো রশি গলায় দিয়ে

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ.

অর্থ : ভেঙে গেছে আবু লাহাবের দুই হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে। তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে লাগেনি। অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও, লাগানো ভাঙানো চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ, তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।

(সূরা লাহাব : আয়াত : ১-৫)

সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা : আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উযযা। তাকে আবু লাহাব বলে ডাকার কারণ, তার গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল সাদা লালে মেশানো। লাহাব বলা হয় আগুনের শিখাকে। কাজেই আবু লাহাবের মানে হচ্ছে আগুন বরণ মুখ। এখানে তার আসল নামের পরিবর্তে ডাক নামে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন-

- মূল নামের পরিবর্তে ডাকনামেই সে বেশি পরিচিত ছিল।
- দ্বিতীয় কারণ, তার আবদুল উযযা (অর্থাৎ উযযার দাস) নামটি ছিল একটি মুশরিকী নাম। কুরআনে তাকে এ নামে উল্লেখ করা পছন্দ করা হয়নি।
- তৃতীয় কারণ, এ সূরায় তার যে পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে তার এ ডাকনামই বেশি সম্পর্কিত।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এর অর্থ কোন কোন তাফসীরকার করেছেন, "ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত " এবং وَّتَبَّ শব্দের মানে করেছেন, "সে ধ্বংস হয়ে যাক " অথবা "সে ধবংস হয়ে গেছে।" কিন্তু আসলে এটা তার প্রতি কোনো ধিক্কার নয়; বরং এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীতে কালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশি নিশ্চিত যেমন তা হয়ে গেছে। আর আসলে শেষ পর্যন্ত তাই হলো যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছিল। হাত ভেঙে যাওয়ার মানে শরীরের একটি অংগ যে হাত সেটি ভেঙে যাওয়া নয়; বরং কোনো ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। আর আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করা জন্য যথার্থই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছার পর সে এত বেশি মর্মাহত হয় যে,

এরপর সে সাত দিনের বেশি জীবিত থাকতে পারেনি। তার মৃত্যুর ছিল বড়ই ভয়াবহ ও শিক্ষাপ্রদ। তার শরীরে সাংঘাতিক ধরনের ফুসকুড়ি (Malignant pustule) দেখা দেয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মরার পরও তিন দিন পর্যন্ত তার ধারে কাছে কেউ ঘেঁসেনি। ফলে তার লাশে পচন ধরে। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। শেষে লোকেরা তার ছেলেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে। একটি বর্ণনা অনুসারে তখন তারা মজুরীর বিনিময়ে তার লাশ দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করে এবং তারা তার লাশ দাফন করে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, তারা গর্ত খুঁড়ে লম্বা লাঠি দিয়ে তার লাশ তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং ওপর থেকে তার ওপর মাটি চাপা দেয়। যে দীনের অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশি ও পূর্ণ পরাজয় সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরাত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উতবা ও মু'আত্তাব আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু আনহু মধ্যস্থাতায় রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বাইআত করেন।

আবু লাহাব ছিল হাড়কৃপণ ও অর্থলোলুপ। ইবনে আসীরর বর্ণনা মতে, জাহেলী যুগে একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে কা'বা ঘরের কোষাগার থেকে দু'টি সোনার হরিণ চুরি করে নিয়েছে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই হরিণ দু'টি অন্য একজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তবুও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনার ফলে তার সম্পর্কে মক্কার লোকদের মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। তার ধনাঢ্যতা সম্পর্কে কাজী রশীদ ইবনে যুবাইর তাঁর " আযযাখায়ের ওয়াত'তুহাফ" (الذَّخَائِرُ وَالتُّحَفُ) গ্রন্থে লিখেছেন, কুরাইশদের মধ্যে যে চারজন লোক এক কিনতার (এক কিনতার = দু'শো আওকিয়া আর এক আওকিয়া = সোয়া তিন তোলা কাজেই এক কিনতার সমান ৮০ তোলার সেরের ওজনে ৮ সের ১০ তোলা) সোনার মালিক ছিল আবু লাহাব তাদের একজন। তার অর্থ লোলুপতা কী পরিমাণ ছিল বদর যুদ্ধের সময়ের ঘটনা থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ যুদ্ধে তার ধর্মের ভাগ্যের ফায়সালা হতে যাচ্ছিল। কুরাইশদের সব সরদার এ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু আবু লাহাব নিজে না গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আস ইবনে হিশামকে পাঠায়। তাকে বলে দেয়, তার কাছে সে যে চার হাজার দিরহাম পায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এর বদলে তার সেই ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। এভাবে সে নিজের ঋণ আদায় করার একটা কৌশল বের করে নেয়। কারণ আস দেওলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঋণ পরিশোধের কোনো ক্ষমতাই তার ছিল না।

কোনো কোনো তাফসীরকার مَا كَسَبَ শব্দটিকে উপার্জন অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের অর্থ থেকে সে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা তার উপার্জন। আবার অন্য কয়েকজন

তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন সন্তান-সন্ততি। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্তানরা মানুষের উপার্জন (আবু দাউদ ও ইবনে আবী হাতেম)। এ দু'টি অর্থই আবু লাহাবের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। কারণ সে মারাত্মক ফুসকুড়ি রোগে আক্রান্ত হলে তার সম্পদ তার কোনো কাজে লাগেনি এবং তার সন্তানরা ও তাকে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেরা তার লাশটি মর্যাদা সহকারে কাঁধে উঠাতেও চাইল না। এভাবে এ সূরায় আবু লাহাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা সত্য হতে দেখলো।

আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল 'আরদা'। 'উম্মে জামীল' ছিল তার ডাক নাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতার ব্যাপারে সে তার স্বামী আবু লাহাবের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু মেয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর উম্মে জামীল যখন এটি শুনলো, সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হলো। তার হাতের মুঠোয় পাথর ভরা ছিল রাসূলুল্লাহকে ﷺ গালাগালি করতে করতে নিজের রচিত কিছু কবিতা পড়ে চলছিল। এ অবস্থায় সে কা'বা ঘরে পৌঁছে গেলো। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে বসেছিলেন। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন সে আসছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে আপনাকে দেখে কিছু অভদ্র আচরণ করবে। তিনি বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। বাস্তবে হলোও তাই। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পেলো না। সে আবু বকরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলো, শুনলাম তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, এ ঘরের রবের কসম, তিনি তো তোমার কোনো নিন্দা করেননি। একথা শুনে সে ফিরে গেলো (ইবনে আবু হাতেম, সীরাতে ইবন হিশাম। বাযযারও প্রায় একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন)। আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু এ জবাবের অর্থ ছিল, নিন্দা তো আল্লাহ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি।

মূল শব্দ হচ্ছে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে , "কাঠ বহনকারিণী।" মুফাসসিরগণ এর বহু বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে যায়েদ, যাহহাক ও রাবী ইবনে আনাস বলেন, সে রাতের বেলা কাঁটা গাছের ডালপালা এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় ফেলে রাখতো। তাই তাকে কাঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে। কাতাদাহ, ইকরামা, হাসান বরসী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন, সে লোকদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চোগলখুরী করে বেড়াতো। তাই আরবী প্রবাদ অনুযায়ী তাকে কাঠ বহনকারিণী বলা হয়েছে। কারণ যারা এর কথা ওর কাছে বলে এবং লাগানো ভাঙানোর কাজ করে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে আরবরা তাদেরকে কাঠ বহনকারিণী বলে থাকে। এ প্রবাদ অনুযায়ী "হাম্মালাতাল হাতাব" শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "যে লাগানো ভাঙানোর কাজ করে।" সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, যে ব্যক্তি নিজের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করে আরবী প্রবাদ অনুসারে তার সম্পর্কে

বলা হয় , فُلَانٌ يَّحْطِبُ عَلٰى ظَهْرِهٖ (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাঠ বহন করছে) । কাজেই হাম্মালাতাল হাতাব (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) মানে হচ্ছে, "গোনাহের বোঝা বহনকারিণী ।" মুফাসসিরগণ এর আরো একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, আখেরাতে তার এ অবস্থা হবে। অর্থাৎ সেখানে যে আগুনে আবু লাহাব পুড়তে থাকবে তাতে সে (উম্মে জামীল) কাঠ বহন করে এনে ফেলতে থাকবে।

তার গলার জন্য জীদ جِيْدٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তাকে জীদ বলা হয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সমস্ত অর্থ মুহাম্মাদের ﷺ বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। এ কারণে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যঙ্গার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বাঁধা হবে। এটা ঠিক সমপর্যায়েরই ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য যেমন কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে : بَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"

তার গলায় বাঁধা রশিটির জন্য حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সে রশিটি হবে 'মাসাদ' ধরনের। অভিধানবিদ ও মুফাসসিরগণ এ শব্দটির বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি বক্তব্য হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে মাসাদ বলা হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল থেকে তৈরি রশি মাসাদ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে, এর মানে খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। আর একটি বক্তব্য হচ্ছে, এর অর্থ লোহার তারের পাকানো রশি।

◆ ◆ ◆

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
৩.	মা -মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন) -আব্দুল করীম পারেখ	২২৫
৫.	আর-রাহেকুল মাখতূম -আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭০০
৬.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬০০
৭.	মুত্তাফাকুকুন আলাইহি -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৮.	রিয়াদুস সালেহীন -মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১২০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	১২৫
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	বুলুগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৫০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১৫.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল করনী	৪০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	আয়েশা (রা) বর্ণিত ৫০০হাদীস -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৩০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান -আব্দুল হামীদ ফাইজী	১৩০
২৯.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব	৩৫০
৩০.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মো: রফিকুল ইসলাম	১৩০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী	১০০
৩৪.	জাদু টোনা, জীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	২০০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা –শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
৩৭.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল করনী	২০০
৩৮	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -আ: ছালাম মিয়া	২৫০
৩৯.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৪০.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪১.	Enjoy your life	৫০০
৪২.	পবিত্র রমজান (গুনাহ মাফের মাস) -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১২০
৪৩.	রমযানের ৬০ শিক্ষা ৩০ ফতোয়া	২০০